শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

বিভিন্ন সময়ে রচিত ও নানা পত্র-পত্রিকায় কিংবা পুস্তকের ভূমিকা-রূপে প্রকাশিত, অনেকগুলি প্রকীর্ণ প্রবন্ধের মধ্য হইতে কতকগুলি লইয়া, 'সাংস্কৃতিকী' নামে বর্তমান সংকলন প্রস্তুত হইয়াছে। সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বারোটি প্রবন্ধ আছে। পুনর্মুদ্রণের কালে কয়েকটি প্রবন্ধের স্থানে স্থানে প্রয়োজন-বোধে কিছু সংশোধন বা সংযোজন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সংকলনে ও ইহার মুদ্রণে আমি স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অনিলকুমার কাঞ্জিলালের নিকট হইতে প্রচুর সহায়তা পাইয়াছি, এই কার্য্যে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সুরুচি উভয়েরই সাহায্য আমি সানন্দ চিত্তে স্বীকার করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, শ্রীমান্ রাণা বসু বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত বইয়ের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ইতি—২২ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৬৮, ৬ মার্চ ১৯৬২ ॥

'সুধর্মা'
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯ ॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী-পত্র

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

(২ অক্টোবর ১৮৮৯—২৯।৩০ জুন ১৯৫৯)

অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ ও সোদরোপম সতীর্থ

স্মরণে

সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটি আজকাল বাঙলায় খুবই চ'ল্‌ছে। চারিদিকেই, বিশেষতঃ তরুণদের মধ্যে, নানা সংস্কৃতি-সভার আর সংস্কৃতি-সম্মেলনের কথা শোনা যাচ্ছে। এই সভা আর সম্মেলন করা আজকাল শিক্ষিত আর শিক্ষিতুকাম জনসমূহের মধ্যে একটি বাতিক বা ব্যসনের মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'সংস্কৃতি' ব'ল্‌লে কী বোঝা উচিত, সে সম্বন্ধে হয়তো সকলের একটা স্পষ্ট ধারণা নেই; কিন্তু একটা আব্‌ছা-আব্‌ছা বোধ বা অনুমান সকলেরই আছে যে. 'সংস্কৃতি' দ্বারা সাহিত্য সংগীত রূপ-কলা নাটক নৃত্য এই-সব ধ'র্‌তে হয়। বাঙলাদেশে বা বাঙালীদের মধ্যে—এবং বাঙলার বাইরে বহু অবাঙালীর মধ্যেও—একটা এই ধরণের বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীতেই আধুনিক ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তার সবচেয়ে লক্ষণীয় রূপ নিয়েছে। 'সংস্কৃতি' শব্দটি আর তার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি কিন্তু বিশ পঁচিশ বা ত্রিশ বছর আগে এতটা লোক-প্রিয় হ'য়ে ওঠেনি। কোনও জাতির মধ্যে তার ভাষার কোনও বিশেষ শব্দের লোকপ্রিয়তা কোনও বিশেষ যুগে বেশ দেখা যায়। ভাবটি বা বস্তুটি অপরিবর্তিত রইল, কিন্তু তার প্রকাশক শব্দটি ব'দ্‌লে গেল—এটি অনেক সময়েই হ'য়ে থাকে; শব্দের fashionableness অর্থাৎ শব্দ-সম্বন্ধে লোক-রুচি, পরিধেয়-গত রুচির মতনই অনেক সময়ে নিতান্ত অকারণে বা খামখেয়ালি-ভাবে ঘ'টে থাকে।

একটা খুব সরল ভাব নিয়ে এই রকম শব্দ-পরিবর্তনের উদাহরণ দেওয়া যায়। ইংরিজি love-এর প্রতিশব্দ এখন যা বাঙলায় জোরের সঙ্গে চ'ল্‌ছে, সেটা হ'চ্ছে 'ভালোবাসা'। ইংরিজিতে খুবই বাচংযমতা আছে, ওদের ভাষায় 'লাভ্‌' এই একটি syllable বা অক্ষরের দ্বারা প্রকাশিত ভাবটিকে বাঙলায় জানাতে হ'লে কিন্তু চারিটি অক্ষর 'ভা-লো-বা-সা'-র দরকার হয়। কিন্তু 'ভালোবাসা' শব্দটি (বা মিলিত শব্দ দুইটি), দু-শ বছর আগে বাঙলা ভাষায়, love, এই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হ'ত না। তখন 'ভালো-বাসা'-র অর্থ, শুদ্ধ বা কেবল প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, প্রীতি, প্রভৃতি ছিল না;—'ভালোবাসা'

এই মিলিত শব্দটি কতকটা যেন বর্ণ- বা রাগ-হীন নিষ্প্রাণ শব্দ ছিল; এর অর্থ ছিল তখন, 'ভালো ব'লে অনুভব করা, ভালো মনে করা।' 'ভালো-বাসা' শব্দের 'বাসা' বা 'বাস্' ধাতু, 'বোধ করা' অর্থে প্রযুক্ত হ'ত—এখন এই অর্থে ধাতুটি অপ্রচলিত হ'য়ে যাচ্ছে। 'ভালোবাসা'-র পাশাপাশি 'মন্দ-বাসা' শব্দটিও মাঝে মাঝে শোনা যায়; কিন্তু প্রাচীন বাঙলাতে 'বাস্' ধাতু বেশ জীবিত ধাতু। এই ধাতুর সহযোগে 'ভালো-বাসা', 'মন্দ-বাসা'-র মতন পুরাতন বাঙলায় 'ভয়-বাসা', 'ঘৃণা-বাসা', 'লজ্জা-বাসা', 'দুঃখ-বাসা' প্রভৃতির প্রয়োগ খুবই মেলে; এমন কি, 'বাসি ভাত ব্যঞ্জনে জিহ্বায় জল বাসে', এ-ও পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যের মধ্যে দেখি, রাহী বা রাই আর কান বা কানু পরস্পরের প্রতি 'নেহ' বা 'নেহা' (অর্থাৎ কিনা 'স্নেহ') করে। 'ভালোবাসা' অর্থে অন্য খাঁটি বাঙলা শব্দ চৈতন্য-পূর্ব যুগের ভাষায়, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১৫-র শতকে, অজ্ঞাত। এই 'নেহ, নেহা' শব্দ পরবর্তী কালে, ১৬-র আর ১৭-র শতকে 'লেহ, লেহা' রূপ ধরে, আর আজকালকার বাঙলায় এর একটি রূপ হ'চ্ছে 'নেই'—যেমন, 'কুকুরকে নেই দিলে মাথায় চ'ড়ে বসে'। ১৬-র শতকের শেষ থেকে সম্ভবতঃ, আর ১৭র শতকে, 'লেহ, লেহা' বোধ হয় সেকেলে শব্দ ব'লে পরিগণিত হয়। তখন সংস্কৃত 'প্রীতি' শব্দটি এসে বাঙালীর কাছে বড়োই প্রিয় হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রায় সকলেই (বিশেষ ক'রে কবিরা) এই শব্দের মোহে প'ড়ে যায়; শব্দটিকে ভেঙে 'পিরীতি' আর পরে 'পিরীত' ক'রে নেওয়া হয়। আজকাল যেমন 'অবদান', 'রূপদক্ষ', 'সত্যিকার', 'আকাশ-বাতাস', 'আপ্রাণ', 'প্রচেষ্টা', 'প্রগতি', 'পরিস্থিতি' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের লোকপ্রিয়তা দেখা যায়, 'পিরীতি, পিরীত' শব্দটিকে নিয়ে 'ভালোবাসা' অর্থে লোকে তখন তেমনি মাতামাতি আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে জড়িত সহজিয়া ভাবের কবিতা কতগুলি আছে; সেগুলিতে 'পিরীতি, পিরীত' শব্দ নিয়ে অনেক 'আদিখ্যেতা' অর্থাৎ বাক্যবিন্যাস করা হ'য়েছে—যেমন, 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে?' ইত্যাদি শীর্ষক পদ। কিংবা 'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর এ তিন ভুবন' ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ করা পদ। 'পিরীতি'র রাজত্বের অবসান হ'ল, বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় ১৭০০-র পূর্বেই। এখন 'প্রেম বা প্রণয় বা ভালোবাসা' অর্থে ভদ্র-সমাজে 'পিরীত' শব্দের ব্যবহার

অশিষ্ট ব'লে পরিগণিত হবে ; শব্দটি এখন জাতিচ্যুত হ'য়েছে। খ্রীষ্টীয় ১৮-র শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার ভাওয়ালে ব'সে পোর্তুগীস পাদ্রি বা সাধু-বাবা মানোএল দা-আস্‌সুম্পসাউঁ তাঁর যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' বই লেখেন, আর যে বই রোমান অক্ষরে লিস্‌বনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান, তাতে কিন্তু 'ভালোবাসা' অর্থে 'দয়া করা' প্রযুক্ত হ'য়েছে, অন্য শব্দ নয় : যীশু মানুষের প্রতি দয়া করেন, ঈশ্বরও দয়া করেন, আর 'মাউগ' আর 'ভাতার'ও পরস্পরের প্রতি দয়া করে। 'দয়া করা' এখন কেউ বোধ হয় আর বলে না। সুতরাং, 'প্রীতি, স্নেহ, প্রেম, পিয়ার-করা', এই ভাবের জন্য, বিভিন্ন যুগের 'নেহ, নেহা করা', 'পিরীতি, পিরীত করা', 'দয়া করা' এবং শেষটায় 'ভালোবাসা', এই শব্দগুলির প্রয়োগ পর-পর এক বাঙলাতেই দেখা দিয়েছে।

ভালোবাসার মতন পুরাতন বা সনাতন ভাবের প্রকাশক শব্দের সম্বন্ধে এই রকম ফ্যাশন বদলায়। নোতুন বা হালের আমদানী-করা ভাব বা চিন্তাধারার সম্বন্ধে তো শব্দ বদলাবেই। একেবারে নোতুন শব্দ তো আসবেই, আবার অর্থ বিকৃত ক'রে বা বদলিয়ে' পুরাতন শব্দেরও ব্যবহার হ'বে। মধ্যযুগের ভারতের ধর্ম-সাধনায় খুব বেশী ক'রে ঈরানের সূফী মতবাদের, সূফী সংঘবদ্ধ সাধনার প্রভাব এসে প'ড়েছিল—এমন কি বাঙলার চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় মতের বৈষ্ণব সাধনার উপরেও। ঈরানী সূফী আধ্যাত্মিক সংগীতের ছায়া বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়, বৈষ্ণব উদ্দাম কীর্তনের সঙ্গে সূফীদের নামের জিকির বা সমবেতভাবে উচ্চৈঃস্বরে নাম-জপের মিল আছে ; এইরূপ কীর্তনে যদি কোনও ভক্তের ভাবাবেশ হয়, বাঙলাতে তাকে বলা হয় 'দশা'। এই 'দশা' শব্দ এই বিশেষ অর্থে প্রাচীন সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, কারণ এই ধরণের সমবেত-ভাবে গান গেয়ে ধর্ম-সাধনার রেওয়াজ বা রীতি প্রাচীন যুগে ছিল না ব'লেই মনে হয়। এখন, ফারসীতে সূফীদের পারিভাষিক শব্দে এইরূপ ভাবাবেশকে 'হাল' বলা হয়—'হাল' মূলে আরবী শব্দ, এর মুখ্য অর্থ হ'চ্ছে 'অবস্থা', পরে 'ভাবাবেশ'-অর্থে ফারসীতে এর অর্থ-বিস্তার ঘটে ; বাঙলায় 'দশা' শব্দটিরও এই বিশেষ অর্থে প্রয়োগ, ফারসী 'হাল'-এরই দেখাদেখি হ'য়েছিল ব'লে মনে হয়। যাঁদের হাতে, যাঁদের দার্শনিক বিচার আর পাণ্ডিত্যের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁদের মধ্যে শ্রীরূপ আর শ্রীসনাতন যে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যেও

প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, সেকথা মনে রাখ্‌তে হবে ; আর স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবেরও যে মুসলমান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল, একথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জান্‌তে পারা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নোতুন ধরণের একটি ধার্মিক বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের জন্য প্রাচীন শব্দ পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হ'ল।

আবার বহু স্থানে নোতুন ভাব বা দৃষ্টি অথবা বস্তু বা ব্যাপারের জন্য পুরাতন শব্দ ব্যবহারে অসুবিধা হ'লে, বা সে বিষয়ে জ্ঞান না থাক্‌লে, নোতুন শব্দ, বিদেশী শব্দ, বিনা প্রশ্নে গৃহীত হ'য়ে যায়। এই ব্যাপাব মধ্য-যুগের বাঙলায় যথেষ্ট পরিমাণে হ'য়েছে—বাঙলায় আগত প্রায় আড়াই হাজার ফারসী ও আরবী-ফারসী শব্দ আর এক শ'র উপর পোর্তুগীস শব্দ তার প্রমাণ ; আর এখন তো আমাদের দ্বারা শত শত ইংরিজি শব্দ অহরহঃ গৃহীত হ'চ্ছে—প্রায় হাজার বারো-শ' ইংরিজি শব্দ তো এবই মধ্যে বাঙলা শব্দ হ'য়ে বাঙলা ভাষায় এক রকম স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছে। নোতুন নোতুন ভাবের, দৃষ্টিভঙ্গীর আর ব্যাপারেব জন্য বাঙলায় আগত কতকগুলি বিদেশী (আরবী-ফারসী আর ইংরিজি আর অন্য ভাষার) শব্দের নমুনা—'মারফতী (গান), শহীদ, কোরবানি, খেতাব, বীমা, নজর (=ভেট), মুলতবী, বহস, সরাই, কাফের, তাল্লাক, হারাম, তপসীলী ; লাট (=লার্ড, লর্ড), গবর্নমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, ভোট, কণ্ট্রোল, হোটেল, কমিশন, কমরেড, মিশন, কংগ্রেস, পাদ্রি, বলশেভিক, নিহিলিস্ট' ইত্যাদি। সাধারণতঃ নোতুন আমদানী-করা বস্তুর নাম সহজেই গৃহীত হয। বিদেশ থেকে আগত নোতুন জিনিসের সঙ্গে তার বিদেশী নামটাকে বর্জন করার চেষ্টা করা হয না ; যেমন—'বরফী, সান্তারা (= কমলালেবু), তামাকু, কিংখাব, মীনা, চা, গ্যাস, সেলুলয়েড, বেকলাইট,কুইনাইন, ম্যাজেণ্টা, পেনসিলিন' প্রভৃতি। কিন্তু ভাব- আর দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পর্কিত শব্দ, আধিমানসিক আর আধ্যাত্মিক বিষয়ের শব্দ—এগুলির সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই নিজেদের শব্দ-ই ব্যবহার ক'র্‌তে চাই। আর যদি আমাদের প্রাচীন চিন্তাধারা আর সাহিত্যের গতি অব্যাহত থাকে, তা হ'লে আমরা এ বিষয়ে খুবই রক্ষণশীল হ'য়ে থাকি, নিজেদের শব্দই যতদূর সম্ভব ব্যবহার ক'র্‌তে চাই—তা প্রচলিত শব্দ-ই হোক্ বা নোতুন ক'রে গ'ড়ে নেওয়াই হোক্, অথবা প্রাচীন সাহিত্য বা শব্দ-ভাণ্ডার থেকে পুনরুদ্ধার ক'রে আনাই হোক্।

মানুষ বিশেষ-ভাবে নিজেকে জানবার প্রথম চেষ্টা করে প্রাচীন গ্রীস দেশে। সেখানে মানুষের জীবনের কেন্দ্র, চিন্তার কেন্দ্র ছিল নগরে—যেমনটা প্রায় সব দেশেই হ'য়ে থাকে। প্রাচীন কালের সুসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রাচীন গ্রীসেও ছিল—তারা মনে ক'রত যে, যেহেতু তারা ছিল Hellenes হেল্লেনেস বা গ্রীক, সেই হেতু তারাই জগতে মানুষের মধ্যে ছিল উন্নত, তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ আর সভ্য ; আর বাকী সব জাতির মানুষ, যাদের ভাষা ছিল গ্রীকদের কাছে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য, তারা সকলে ছিল Barbaroi বার্বারোই বা বর্বর—অসভ্য। গত দুই তিন হাজার বৎসরের বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আর নৃতত্ত্ববিদ্যা নামে নব-জাত মানব-বিষয়ক বিজ্ঞানের বলে, তা ছাড়া পশ্চাৎপদ জাতির মানুষকে দলনে সভ্য জাতির মানুষের ক্ষমতা বা অধিকার কার্য্যতঃ মেনে নিয়ে—আজকাল আমরা যে-রকম ব্যাপকভাবে মানুষকে 'সভ্য' অথবা 'অসভ্য' পর্য্যায়ে ফেলি, সেটা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষেও, যারা আর্য্য-ভাষা-নিবদ্ধ ধর্ম আর রীতি-নীতি গ্রহণ ক'রেছিল, তারা ছিল 'আর্য্য', আর বাকী ছিল 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ 'মিশ্র' জাতির মানুষ। এতদ্ভিন্ন, চতুর্বর্ণের theory বা ধারণা আসাতে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে একটু অন্য ভাবে, ধর্মনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা ভারতবর্ষে হ'য়েছিল। সভ্য আর অসভ্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীসে আর ভারতে এই ধরণের মনোভাব ছিল—নাগরিক-ই সভ্য, গ্রাম্য-ইঅ সভ্য। সংস্কৃতের 'সভ্য' শব্দের মুখ্য অর্থ—যা সভার উপযুক্ত, যেখানে পাঁচজনে ভদ্রভাবে বা বন্ধুভাবে মিলিত হয়, সেখানকার উপযুক্ত; আদি-আর্য্য-ভাষায় 'সভ্য' মানে কোনও গোত্র বা গোষ্ঠী দলের মানুষ, এই শব্দের ইন্দো-ইউরোপীয় প্রতিরূপ হ'চ্ছে *sebhyos, যা-থেকে অধুনা প্রায় অপ্রচলিত ইংরিজি শব্দ sib, sibling (অর্থাৎ 'আত্মীয়') উদ্ভূত হ'য়েছে, আর জরমান শব্দ Sippe অর্থাৎ 'জ্ঞাতিগোষ্ঠী'। তা হ'লে 'সভ্য' শব্দ মূলতঃ হ'চ্ছে 'গোষ্ঠী-সম্পৃক্ত' ; তারপরে হ'ল 'জনসমাগম-সম্পৃক্ত' ; পরে 'ভদ্র, সংযত, সংস্কারযুক্ত, refined, civilized', এই-সব অর্থ সহজেই উদ্ভূত হয়।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আমরা হালে civilized আর uncivilized শব্দ দুটি শিখলুম। নৃতত্ত্ববিদ্যা তখন শিশু-অবস্থায় ; অনেকটা ইউরোপীয় শ্বেতকায় শ্রেষ্ঠতা-বোধের দ্বারা চালিত সেই শিশু-বিদ্যার নির্দেশে আমরা তখন মানুষকে

civilized বা uncivilized পর্য্যায়ে ফেল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম। তখন আমাদেব ভাষায় এই দুই ইংরিজি শব্দের প্রতিশব্দেব দরকার হ'ল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আমরা 'সভ্য' আর তার বিপরীত 'অসভ্য' এই দুইটি শব্দ সংস্কৃত থেকে গ্রহণ ক'র্‌লুম। এইবারে, একটি নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখবার রীতি এল ; সংস্কৃত 'সভ্য' আর 'অসভ্য' শব্দদ্বয় বাঙলা আব আধুনিক ভারতীয় ভাষায় তাদের আধুনিক অর্থ গ্রহণ ক'র্‌লে।

মানুষের সভ্যতা বা সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভের কথা আলোচনা ক'বে আমাদের জ্ঞান আর বোধ-শক্তি যতই বাড়্‌তে লাগ্‌ল, ততই এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম-ভাবে দেখার আবশ্যকতা দেখা দিল, সেই সঙ্গে দেখা দিল নোতুন শব্দেব আবশ্যকতাও। পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতিব বা জনগণেব মধ্যে আছেই ; কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি ক'র্‌তে পারলুম—ঘরবাড়ি, যন্ত্র-পাঁতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতিব জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতবেব ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হয। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতাব আভ্যন্তব প্রাণ বা অনুপ্রেবণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তব অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিবিক্ত বস্তুটির নাম-কবণ হ'যেছে ইংরিজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয ভাষায Culture (জর্‌মানে Kultur 'কুল্‌তুর') শব্দ রূপে। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল আর ফল, আবার ফল থেকে বীজ, তা থেকে পুনরায় গাছ ; বিভিন্ন গাছের ভিতর দিয়ে এই কার্য্য বা গতিক্রম চ'লেছে। যদি এক-ই বিশাল আর ক্রমবর্ধিষ্ণু বনস্পতির ভিতরেই এই গতিক্রম কার্য্যকর হ'য়ে দেখা দিত, তাহ'লে কোনও সমাজের গতিশীল সভ্যতা আর সংস্কৃতির সঙ্গে উপমার বস্তু পাওয়া যেত। আমরা মোটামুটি ভাবে ব'ল্‌তে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হ'চ্ছে culture। অবশ্য একেবারে সর্বজন-স্বীকৃত পারিভাবিক শব্দ রূপে civilization বা সভ্যতা আর culture শব্দ দুটিকে সকলেই এইভাবে সব সময়ে ব্যবহার করে না ; কিন্তু যখন কোনও জাতের বাইরেকার সভ্যতা দেখে তাকে পূরাপূরি চেনা যায়, তখন ব'ল্‌তে হয়—'এহো বাহ্য', ভিতরের কথা কী? তখন তার মানসিক আর আনুভবিক দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার বাহ্য সাধন আর

প্রকাশ, তার দর্শন সাহিত্য শিল্প সংগীত প্রভৃতি, তার মানসিক প্রবৃত্তি আর তার অবচেতনা, তার নৈতিক আদর্শ আর তৎপ্রকাশক সহ-জ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিপাটি, এ-সমস্তের কথা এসে যায় : এ-সমস্তকে বাহ্য 'সভ্যতা' ছাড়া আর একটা সর্বন্ধর সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা হয়। সেই সংজ্ঞাটি ইউরোপে culture শব্দের রূপে দেখা দিয়েছে।

এই culture শব্দের মূলে আছে লাতীনের cultura 'কুলতুরা' শব্দ ; এই শব্দ লাতীনের col 'কোল্' ধাতু থেকে হ'য়েছে, col অর্থে 'কৃষ্, চাষ করা', আবার 'যত্ন করা, পূজা করা'-ও হয়। culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষ-সাধন' বেশ হ'তে পারে, খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চ'লতে পারে। 'টানা' ও পরে 'লাঙ্গল টানা' বা 'চাষ করা' অর্থে, 'কৃষ্' ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অর্থের দিক থেকে culture-এর প্রতিরূপ শব্দ মনে ক'রে, বাঙলায় ব্যবহার করা হ'তে থাকে বোধ হয় গত তিরিশ বছরের ভিতরে। বঙ্কিমচন্দ্র culture-অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'কৃষ্টি' শব্দটি গতানুগতিক-ভাবে গ্রহণ ক'রে থাকবেন—যদি তিনি স্বয়ং এই শব্দটি বাঙলায় চালিয়ে না থাকেন। 'কৃষ্টি'র অর্থগত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাঙলায় গৃহীত এর culture-অর্থ সমর্থিত হয় না। 'কৃষ্টি'র মূলগত অর্থ 'কর্ষণ-কার্য্য', তা থেকে 'চাষ-করা ক্ষেত', তা থেকে 'ক্ষেত্র, ভূমি, দেশ', এবং তারপরে 'দেশের মানুষ, জাতি'। বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে 'জাতি' ; যেমন, 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' মানে 'পাঁচ জাতি'—প্রথম-প্রথম আর্য্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা, অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বশ, যদু আর পুরু বংশের লোকেদের সম্বন্ধে এই 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' শব্দ প্রযুক্ত হ'ত, পরে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের অর্থ-প্রসার ঘটে। 'চাষ'-অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে। culture-অর্থে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটি সম্বন্ধে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

'সংস্কৃতি' শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশী হন। এই শব্দটি বাঙলায় এখন থেকে ২৪।২৫ বছর আগে কেউ ব্যবহার ক'রেছেন কিনা জানি না। 'সংস্কার' শব্দটি অবশ্য পাওয়া যায়, তা কিন্তু culture-অর্থে নয় ; কতকগুলি সামাজিক ধার্মিক অনুষ্ঠান (যেমন, বিবাহ-সংস্কার), আর চিরপোষিত বা বংশধারানুসারে লব্ধ বোধ বা বিচার অর্থে

শব্দটি রূঢ়ি হ'যে গিযেছে। 'সংস্কৃত' শব্দটি, মূলতঃ, শুদ্ধ বা উন্নত অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, উপবন্ত সংস্কৃত-ভাষা অর্থেও সুপ্রচলিত। 'সংস্কৃতি' শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয বন্ধুর কাছে। culture-এব বেশ ভালো প্রতিশব্দ ব'লে শব্দটি আমাব মনে লাগে। আমাব বন্ধু শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন—তিনি ব'ল্লেন যে তাঁরা তো বহুকাল ধ'রে মারাঠী ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার ক'বে আসছেন।

১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষযে আলাপ করি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি তাঁব দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কিনা, জানি না—সম্ভবতঃ শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে, culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন কবেন, 'কৃষ্টি' শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয না, একথাও বলেন। 'সংস্কৃতি' শব্দ ঋগ্বেদে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে আছে ; আর এবিষযে ঐতরেয ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃত একটি অতি সুন্দর উক্তির প্রতি শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধেয শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব থেকেই এটি দেখে থাকবেন। শিল্পস্তুতি সম্বন্ধে উক্তিটি—

> "ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে—হস্তী, কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।...আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"

'(পার্থিব) শিল্প-সমূহ দেব-শিল্প বা স্বর্গীয় শিল্প-সমূহকেই প্রশংসা করে ; এই সমস্তের (অর্থাৎ দেব-শিল্পের) অনুকৃতি রূপেই এই পৃথিবীতে শিল্পকে ধরা হয়। শিল্প-দ্রব্য কী রকম? হস্তী অর্থাৎ হাতীর দাঁতের কাজ, কাংস বা ধাতব পাত্র, বিবিধ প্রকারের বস্ত্র, স্বর্ণ-নির্মিত অলংকারাদি, অশ্বতরী-যুক্ত রথ—এই প্রকার। এই শিল্প-সমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি ; এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।'

এখানে চমৎকার-ভাবে আত্মোন্নতি-বিধানে, আত্মিক সংস্কৃতিতে, নিজের জীবনকে ছন্দোময় ক'র্‌তে শিল্পের কাজ কী, তা বলা হ'য়েছে। রূপ-শিল্প, রূপ-কর্মও যে সংস্কৃতির সাধন, তার বিচারও এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

Civilization বা সভ্যতা হ'চ্ছে (বিশেষ ক'রে তার বহিরঙ্গ বা পার্থিব দিকে) মুখ্যতঃ জন-সমাজের ব্যাপার—নগরের ব্যাপার। মানুষে মানুষে মেলামেশা না হ'লে, বুদ্ধির বিচারের আর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয় না। অবশ্য গভীর অনুভূতি বা উপলব্ধির জন্য মানুষকে কৃত্রিম নাগরিক আবেষ্টনী ছেড়ে কোথাও বা প্রাকৃতিক গ্রাম্য বা আরণ্য বা পার্বত্য আবেষ্টনীর আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে হয়। ভারতবর্ষের গভীরতম উপলব্ধি ঘ'টেছিল তপোবনে, নগর থেকে দূরে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের অবস্থিত আশ্রমে। কিন্তু ভারতের সভ্যতার, পার্থিব উৎকর্ষের ক্ষেত্র নগর-ই ছিল : শহরের বস্তু ব'লেই উদ্ভাবনী সভ্যতাকে যে নামে ইউরোপে অভিহিত করা হয়, তার মূলে আছে লাতীন ভাষার civis শব্দ, যার অর্থ 'নগর'। লাতীন urbs শব্দের মানেও 'নগর' ; তা থেকে urban শব্দ, অর্থ 'নাগরিক, উন্নত, ভদ্র, সংস্কৃতিযুক্ত'। আরবদের মধ্যেও শহরের সঙ্গে সভ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বীকার করা হয়, তাই, যা 'মদীনা' অর্থাৎ নগরের সঙ্গে সংযুক্ত, তা-ই হচ্ছে 'তমদ্দুন' বা সভ্যতা। 'নাগরিকতা' শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় ; শব্দটি বেশ উপযোগী ছিল, কিন্তু 'নাগর' শব্দ থাকাতে বাঙলায় 'নাগরিকতা'র একটু অর্থাবনতি ঘ'টেছে। 'সভা'র সঙ্গেই যা জড়িত, 'সভা' থেকেই অর্থাৎ মানবগণের সংগমন বা 'অন্‌জুমন' থেকে, একত্রীভবন থেকে, যা উঠেছে, তাকেই আমরা 'সভ্যতা' বলি।

যুগে যুগে elemental অর্থাৎ ঔপাদানিক বা মৌলিক ভাবকে প্রকাশ ক'র্‌তে যে বিভিন্ন শব্দ লোকপ্রিয় হ'য়ে থাকে, নোতুন আর সূক্ষ্ম নানা-ভাবের জন্য যে-ভাবে শব্দ ভাষায় প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে, সে-সম্বন্ধে, আর civilization ও culture-এর বাঙলা প্রতিশব্দ সম্বন্ধে, এতক্ষণ আমি কতকটা অসংলগ্নভাবে একটু প্রসঙ্গ ক'র্‌লুম। আজকাল হাটে বাটে সর্বত্র যে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, সেই 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে, তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধেও দুটো কথা ব'ল্‌লুম। এইবারে বিশেষ ক'রে ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অল্প কিছু নিবেদন ক'রে আমার আলোচনার উপসংহার ক'র্‌বো।

ভারতের বাহ্য বা পার্থিব সভ্যতা একটা বিরাট্ ব্যাপার। ভারতের এই civilization যে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন ও মধ্যযুগের civilization-এর চেয়ে কম নয়, সে কথা সর্ববাদিসম্মত। প্রকৃতিতে এই পার্থিব সভ্যতা অন্য পাঁচটি দেশের পার্থিব সভ্যতার সমপর্য্যায়েরই বস্তু। ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান, ভারতের বাস্তু, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা ও নানা হস্তশিল্প, ভারতের দর্শন আর ধর্ম, ভারতের সাহিত্য—এ-সব তো আছে; কিন্তু এর প্রাণ কোথায়? ভারত-সভ্যতা-তরুর সংস্কৃতি-পুষ্প কিভাবে ফুটে উঠেছে? সেটা একটু প্রণিধান ক'রে দেখ্‌বার বিষয়।

ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতকগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণা-রূপে আর তার প্রকাশ-রূপেও বিদ্যমান। এই ভাবপুঞ্জ ভারতের জনগণের ইতিহাসের আধারেই দানা বেঁধেছে। নানা জাতির সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি গ'ড়ে উঠেছে—এই-সব জাতির ভাষা আর সভ্যতা, এদের সংস্কৃতি, এদের ঐতিহ্য, মূলতঃ পৃথক্ ছিল। কিন্তু অস্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড-ভাষী আর ভোটচীন-ভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতির জনগণ আর্য্যভাষা গ্রহণ ক'রে আর্য্যভাষীদের সঙ্গে মিলে উত্তর-ভারতে প্রাচীন হিন্দু-জাতিতে পরিণত হ'ল। আর্য্য-ভাষীরা প্রথমটায় বিজেতা হ'য়ে আসে; বিজেতার দর্প আর দম্ভ জাত্ আর্য্য-ভাষীদের মধ্যে বহুদিন ধ'রে ছিল, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু শেষটায় যখন এই-সব জাতির মিশ্রণ ঘ'ট্‌লো, তখন, এদের নিজ-নিজ পৃথক্ জাতিত্ব আর সত্তা সম্বন্ধে যে বোধ ছিল, আর এই বোধ নিয়ে যে স্বাভাবিক গর্ব ছিল, সেটা লোপ পেলে—সকলেই এক নব-সৃষ্ট জাতিতে নিলীন হ'য়ে গেল, এক বিরাট্ সমন্বয়ে সকলেই যেন নিজ সার্থকতা লাভ ক'র্‌লে। পৃথক্ স্বজাতি-গর্ব আঁকড়ে' ধ'রে থাক্‌লে, মিলিত-ভাবে একটি নোতুন মিশ্র জাতির সৃজন হ'তে পার্‌ত না। বিভিন্ন জাতির দৃষ্টি-ভঙ্গী ধর্ম-বিচার বা সিদ্ধান্ত, আচার-অনুষ্ঠান—এ-সব এককে অপরের সামনে তুচ্ছ ক'রে দেখ্‌বার ও দেখাবার প্রবৃত্তি আর থাকা সম্ভবপর হ'ল না, কারণ এ-সব জিনিস, এই মিশ্র জাতির জনগণের পিতৃকুলাগত বা মাতৃ-কুলাগত রিকৃথ হ'য়ে দাঁড়ালো। এই জন্য হিন্দু সভ্যতার প্রথম থেকেই একটি বড়ো সাংস্কৃতিক সূত্র প্রকট হ'ল—সমন্বয়। বিভিন্ন ধর্ম-মত বা বিচার এক-ই

সত্যে পৌঁছুবার বিভিন্ন পথ মাত্র—এই বোধ ভারতীয় জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হ'ল। এই পরমতসহিষ্ণুতা ভারতের সংস্কৃতির সব চেয়ে বড়ো কথা। ভারতীয় ঔদার্য্য দেখিয়ে কেবল ব'লবে না, সব ধর্মেই বা সব সমাজেই সত্য আছে—তবে আমার ধর্মে আর আমার সমাজে-ই সত্যটা পুরাপুরি বিদ্যমান ; ভারতীয় ব'লবে—বিভিন্ন ধার্মিক অবলোকন বা দৃষ্টি-ভঙ্গী বা দর্শন, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অবশ্যম্ভাবী রূপেই দেখা দিয়েছে, আর এই-সব দর্শন, যতক্ষণ না অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ নিজ সার্থক মহিমায় সকলের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। বিভিন্ন আপাত-বিরোধী মতবাদের মধ্যকার ঐক্য বা'র ক'রে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা, চিরকাল ধ'রে ভারতীয় ক'রে এসেছে ; পিতৃলোক আর পুনর্জন্ম, হোম আর পূজা, এক আর বহু দুই-ই একসঙ্গে দেখা, পিণ্ডদানে মুক্তি আর অনপনেয় কর্মফল, জ্ঞান আর ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম আর সকাম অনুষ্ঠান, সামাজিক বিভেদ আর সামাজিক সমীকরণ—এ-সমস্তকেই ধ'রে নিয়ে। এদের বিবাদের মধ্যে সংবাদ আবিষ্কার ক'রে, এক মহান্ মিলন-সংগীত গাইবার চেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম কথা।

তারপরে, ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় বড় কথা হ'চ্ছে এর তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। বিচারের পথে বা অনুভূতির পথে, দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান ও জীবনে তার উপলব্ধি—এই-ই হ'চ্ছে মানুষের প্রধান কার্য্য। যদি বিচারের পথে গিয়ে কেউ নাস্তিক ভাবে পৌঁছয়, তাতে দুঃখ নেই—নাস্তিকের সিদ্ধান্তকেও উড়িয়ে দেবার অধিকার নেই আমাদের, তাকেও জোর ক'রে আস্তিক্যে আনবার চেষ্টা অবৈধ। প্রাচীন ভারতের আর্য্য আর বিভিন্ন প্রকারের অনার্য্য, বিশেষতঃ দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক-ভাষী অনার্য্য—এদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-সমূহের সমবায়ের ফল হ'চ্ছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ্য-দ্বারা যে প্রার্থনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনারূপে গৃহীত হ'য়েছে, সেটি হ'চ্ছে গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রার্থনা ; আর এই প্রার্থনায় আমরা দুটি অংশ পাই—একটিতে হ'চ্ছে জগৎ-প্রপঞ্চের স্রষ্টার অনুধ্যান ('তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি'—সৃষ্টিকর্তার সেই বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি), আর অন্যটিতে এই প্রার্থনা যে, আমাদের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি যেন ভগবানের দ্বারায় পরিচালিত হয়, আমরা যেন বিধি-দত্ত বুদ্ধি ধ'রেই সব কাজ ক'রে যেতে পারি ('ধিয়ো যো নঃ

প্রচোদয়াৎ'—তিনি আমাদের ধীসমূহকে পরিচালিত করুন)। এই জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বা আকর্ষণ থাকাতে, বহু মূর্খতা বহু গোঁড়ামি বহু অন্ধ-বিশ্বাস নানাভাবে ভারতীয় জাতিকে নানা সময়ে বিপন্ন ক'রে তুল্‌লেও, মোটের উপর সে-সব কাটিয়ে' উঠবার শক্তি এই জাতি তার সংস্কৃতির দ্বিতীয় মূলকথা এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসা থেকে পেয়েছে।

'অহিংসা' হ'চ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় কথা। এ অহিংসা কেবল প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি আর ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ানো নয়—এর পিছনে আছে 'করুণা' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে দার্শনিকের চোখে দেখা দরদ, আর আছে 'মৈত্রী' অর্থাৎ সকলকে মিত্রভাবে দেখে তাদের মঙ্গল করার চেষ্টা। এই অহিংসা কেবল vegetable world বা উদ্ভিদ্-জগতের উপযোগী নিষ্ক্রিয় অথবা পর-পরিচালিত ব্যাপার নয়। এর পিছনে আছে ন্যায়-দৃষ্টি ও সহানুভূতি: আর ন্যায়-দৃষ্টি আছে ব'লেই [illegible]হিংসার পথে মূর্তি গ্রহণ ক'র্‌তেও ক্ষেত্র-বিশেষে বাধা নেই।

ভারতীয় সংস্কৃতির আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে। 'দম' বা আত্ম-দমন; 'ত্যাগ' বা শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর বস্তু-জগতের প্রতি উপেক্ষা; 'অপ্রমাদ' অর্থাৎ নিজের বুদ্ধিকে প্রমত্ত বা ঘোলাটে' না করা; জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্য শিব আর সুন্দরের আবাহন—ইত্যাদি অনেক বিষয়ে এই সংস্কৃতির প্রকাশ হ'য়েছে।

সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও একসময়ে চিরকালের জন্য ব'লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতি-ও গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নোতুন নোতুন ভাবপরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা ক'রেছে, সমর্থও হ'য়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এদেশে ইস্‌লামী সংস্কৃতির আবির্ভাব হ'ল। এই সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন আর বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য, সেটা হ'চ্ছে এর অন্তর্গত সূফী দৃষ্টিকোণ, সূফী আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই জিনিসকে মধ্য-যুগের ভারত সাদরে বরণ ক'রে নিলে, এর মধ্যে সে অচেনাকে খুঁজে পেলে। কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি সন্তগণের আবির্ভাব হ'ল, ভারতের সূফী সাধকেরা এলেন; কাশ্মীরের

জৈনুল-আবেদীনের মতন উদার-হৃদয় রাজার, সম্রাট্ আকবরের মতন 'সুল্হ্-ই-কুল্ল্' অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রীর প্রচারকের, রাজকুমার দারা শিকোহের মতন হিন্দু আর মুসলমান চিন্তার ও সাধনার দুই মহাসাগরের মিলনাকাঙ্ক্ষী স্বপ্ন-দ্রষ্টার প্রকাশ ঘ'ট্‌ল। ইসলামী সংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতি, এই দুইয়ের পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ কেবল বিরোধের সংঘাত নয়। উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতার কাছে নম্র পরমত-সহিষ্ণুতাকে আপাত-দৃষ্টিতে লাঘব স্বীকার ক'র্‌তে হ'য়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ঝড়ের পরে মৃদু সমীরণের মত সূফী মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণ-ই হ'চ্ছে ভারতে ইসলামী আর হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের মুখ্য কথা। নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি—যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয় বিশুদ্ধ আরব-জাত ইসলামও নয়, যা হ'চ্ছে সত্যকার ভারতীয় হিন্দু-ইস্‌লামীয় সংস্কৃতি—এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে—নানা ধরণের খ্রীষ্টান মত ও সাধনা, জনসেবা, নানা নোতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব-নব শিল্প-সৃষ্টি. Socialism বা সম্পত্তি-সাম্য প্রভৃতি নানা সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা আর প্রযোজনা। আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় ক'রে বহুরূপ হ'য়ে যা বিরাজ ক'র্‌বে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ক'রে এক ক'রে তুল্‌বে।

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৩]

যবদ্বীপের মহাভারত

ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতীয় ধর্মের, সভ্যতার ও সাহিত্যের প্রসারের সূত্রপাত খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে, ভগবান্ বুদ্ধের জীবৎকালের অবসানের পর হইতেই যে ঘটিয়াছিল—এইরূপ অনুমান করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের দুইটি বিশিষ্ট রূপ—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম—ভারতের বাহিরে প্রসৃত হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমের দুর্গম গিরি- ও মরু-ময় সীমান্ত-পথ দিয়া, 'ক্ষুদ্র ভারত' (India Minor—এখনকাব আফগানিস্তান), বাহ্লীক (এখনকার বল্‌খ্ প্রদেশ) পারস্য, চুলিক দেশ (Sogdiana—এখনকাব রুষ-তুর্কিস্তান), কুস্তন দেশ (খোতান—চীন-তুর্কিস্তানের দক্ষিণ অংশ), কুচ (কুচার ও কাবা-শহব—চীন-তুর্কিস্তানেব উত্তর অংশ), ভোট দেশ (আধুনিক তিব্বত), এবং মহাচীন (চীনদেশ), কোরিযা ও জাপানে, ভারতীয় কৃষ্টি ও চিন্তার যে ধারা প্রবাহিত হয, তাহা মুখ্যতঃ বৌদ্ধ চিন্তা ও ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভগবান্ বুদ্ধের জীবন-চবিত এবং প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ও বৌদ্ধ মনোভাবের দ্বারা শোধিত নানা গল্প, আখ্যায়িকা, জাতক, অবদান ইত্যাদি, ভারতের বৌদ্ধ-সংস্কৃতিব সহিত ভারতেব বাহিরের পূর্বোক্ত সুসভ্য ও অর্ধ-সভ্য জাতির কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে ও তাহাদের চিত্তকে সবস করে। তাহাদের নিজ-নিজ ভাষার সাহিত্যেও এই সকল আখ্যায়িকা সাদরে স্থান পাইযা তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া যায়। এইরূপে ভারতীয় সাহিত্যের একটি বিরাট্ অংশকে মধ্য-এশিয়া, চীন, কোরিয়া ও জাপানের অধিবাসিগণ আত্মসাৎ করিয়া লয়; ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য স্বদেশের গণ্ডী কাটাইযা বিশ্বসাহিত্যের কোঠায নিজ চিরস্থায়ী আসন করিয়া লয়।

বৌদ্ধদের মধ্যে বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশাবলী এতটা বেশী স্থান দখল করিয়া বসে যে, তাহাদের নিকট ভারতের বুদ্ধ-পূর্ব যুগের প্রাচীন ইতিহাস বা কাহিনী বিশেষ সম্মান পায় নাই। লোক-প্রচলিত গল্পের অন্তে একটুখানি ধর্ম-দেশনা বা উপদেশ জুড়িয়া দিয়া, গল্পের ঘটনাকে বুদ্ধদেবেরই জন্মান্তরে

ঘটিত ঘটনা বলিয়া কল্পনা করিয়া, ও গল্পের পাত্র-পাত্রীকে কোনও অতীত জন্মের বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার সহচর বা সমসাময়িক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া—ভগবান্ বুদ্ধদেবের নামের সহিত আখ্যান-বস্তুকে এইরূপে কোনও ক্রমে জুড়িয়া দিয়া—যেন তাহারা স্বস্তি পাইত, ও আখ্যানটিকে বুদ্ধ শ্রাবকগণের শ্রবণ বা পাঠের যোগ্য বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন ভারতের প্রায় সমগ্র কথা-সাহিত্য এইরূপে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-কথায় সে-রূপে বুদ্ধদেবের নাম জুড়িয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া, বৌদ্ধগণ আমাদের মহাভারত ও পুরাণের বিচিত্র আখ্যায়িকাগুলি গ্রহণ করেন নাই—মহাভারত ও পুরাণাবলীর শাশ্বত রস-ভাণ্ডার হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহাভারতে ও পুরাণে, প্রাচীন আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান ও দেবতা-বাদ এবং বিশেষ-ভাবে ব্রাহ্মণ্য মনোভাব—ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদ ও পৌরাণিক শিব, শক্তি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা-প্রতীককে অবলম্বন করিয়া জগৎ-প্রপঞ্চের ব্যাখ্যার প্রয়াস—প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিক মতের অননুমোদিত ব্যাপার থাকায়, প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের এই বিরাট্ দিক্‌টি বৌদ্ধদের সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ইহার ফলে, ভারতের জাতক অবদান ইত্যাদি চীন ও জাপান লাভ করিল, কিন্তু ভারতের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ চীন জাপানে পহুঁছিল না। চীনের মত সুসভ্য জাতিকে ও জাপানের মত কর্মী জাতিকে রামায়ণ মহাভারতের মত বিরাট্ বিশাল কাব্য-রসোজ্জ্বল গ্রন্থ কিভাবে নাড়া দিত, তাহা কল্পনা করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

অপর পক্ষে, ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দুস্তর সাগর-পথ ধরিয়া যখন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও চিন্তার ধারা ইন্দোচীনে (অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, শ্যাম দেশ, কম্বোজ ও চম্পা বা কোচিন-চীনে) ও ইন্দোনেসিয়ায় (অর্থাৎ মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্নিও, সুলাবেসি, ও ফিলিপীন-দ্বীপ-পুঞ্জে) প্রসৃত হইল, তখন এই সভ্যতা ও চিন্তার ধারা তাহার দুইটি রূপেই ঐ সকল দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই জলপথে ভারতীয় বণিগ্‌গণ ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়ায় যাতায়াত করা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম যে সকল ভারতীয়ের গমন ঐ সকল দেশে ঘটিয়াছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য-মতের ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে

ব্রাহ্মণও ঐ সকল দেশে গিয়া পহুঁছিয়াছিলেন। চম্পা কম্বোজ যবদ্বীপ বলিদ্বীপ বোর্নিও প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন শিলালিপিগুলি সংস্কৃতে লেখা, এবং সেইগুলি হইতে এই কথা-ই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। খ্রীষ্ট-জন্মের দুই তিন শতকের মধ্যেই এই শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইযাছিল। এই সময়ে ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতির বাহন হইযা ব্রাহ্মণের শুভাগমন চম্পা ও যবদ্বীপ এবং বোর্নিওতে ঘটিয়াছিল।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণের অনুমোদিত আখ্যায়িকা ইতিহাস আদিও ঐ-সকল দেশে নীত হয়। খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বের বা পরের প্রথম শতকে, কোন্ কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থ ভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবিশেষ লোকপ্রিয় ছিল, তাহা আমরা জানি না। বেদ-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ অবশ্য ছিল; কিন্তু বেদ কোনও কালে লোকপ্রিয় সাহিত্য ছিল না। ইতিহাস-পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত তখনও কী আকারে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। আধুনিক গবেষকদের মতে, রামায়ণ মহাভারতকে আমরা এখন যে-আকারে পাইতেছি, এই দুই মহাগ্রন্থের আকার দুই হাজার বৎসর পূর্বে সেরূপ ছিল না; পরবর্তী যুগের নানা প্রক্ষিপ্ত অংশ তখনও ইহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। রামায়ণ মহাভারত তখনও সৃজ্যমান। তখনকার দিনে যে রামায়ণ মহাভারত প্রচলিত ছিল, এখনকার প্রচলিত পুস্তক হইতে অনেকটা পৃথক্ পুস্তক দুই হাজার বৎসর পূর্বে যবদ্বীপে নীত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে এ কথাও বলা চলে যে, তখনকার দিনে পুঁথি পহুঁছিবার আগে ভারতের নাবিক বণিক্ ও ব্রাহ্মণের মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও-দেশে পহুঁছিয়াছিল। যবদ্বীপে ঋষি অগস্ত্যের খুব নাম-ডাক; দক্ষিণ-ভারতে তামিল-দেশেও অগস্ত্যের পূজা হয়, অগস্ত্য অনেক স্থলে শিবের সহিত অভিন্ন-রূপে কল্পিত হন। দক্ষিণ-ভারত হইতেই যবদ্বীপে এই অগস্ত্য-পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান যুক্তি-যুক্ত। প্রাচীন যবদ্বীপের অষ্টম ও নবম শতকের কতকগুলি তারিখ-দেওয়া সংস্কৃত শিলা-লেখে (৬৫৪, ৬৮২ ও ৭৮৫ শকাব্দে) অগস্ত্যের উল্লেখ বা উদ্দেশ আছে। অগস্ত্যের উপাখ্যান রামায়ণ মহাভারত উভয়েই আছে। যবদ্বীপের প্রাচীন (অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার) কোনও অনুশাসন বা লেখে মহাভারত

রামায়ণের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পত্তন এই ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, এবং মহাভারতের অনুবাদকেই অবলম্বন করিয়া হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের এবং রামায়ণের আখ্যায়িকার সঙ্গে যবদ্বীপের জনগণের বিশেষ পরিচয় যে খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর পূর্বেই ঘটিয়াছিল, তাহার পক্ষে অন্য প্রমাণ আছে। যবদ্বীপের প্রাচীনতম মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের; এই মন্দিরগুলি মধ্য-যবদ্বীপের উত্তর ভাগে Dieng দিএঙ্-নামক শালভূমিতে অবস্থিত। এগুলি শৈব-মন্দির, এখন এই মন্দিরগুলি শূন্য ও ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে; কিন্তু স্থানীয় যবদ্বীপীয়গণ এই মন্দিরগুলির এক-একটিকে মহাভারতের পাত্র-পাত্রীগণের নামের সহিত জড়িত করিয়া অভিহিত করে; যথা—Tjandi Poentadewa ('চাণ্ডী পুন্তাদেব' বা 'যুধিষ্ঠির-মন্দির'—'পুন্তাদেব' যবদ্বীপে যুধিষ্ঠিরের নাম), Tjandi Ardjoena ('চাণ্ডী অর্জুন' বা 'অর্জুন-মন্দির'), Tjandi Srikandi ('চাণ্ডী শ্রীকান্দি' বা 'শিখণ্ডী-মন্দির') [আধুনিক যবদ্বীপীয় মতে 'শিখণ্ডী' হইয়া গিয়াছেন 'শ্রীকান্দি' বা 'শ্রীকান্তি', এবং তিনি রাজা দ্রুপদের কন্যা, দ্রৌপদীর কনিষ্ঠা ভগিনী ও অর্জুনের স্ত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন], Tjandi Soembadra ('চাণ্ডী সুম্বদ্রা' অর্থাৎ 'সুভদ্রা-মন্দির'), Tjandi Pandoe (পাণ্ডু-মন্দির), Tjandi Abijasa (ব্যাস-মন্দির), Tjandi Bima (ভীম-মন্দির), Tjandi Gatotkatja (ঘটোৎকচ-মন্দির), Tjandi Nakoela- Sadewa (নকুল-সহদেবের মন্দির), Tjandi Sintjaki ('চাণ্ডী সিন্ত্যাকি' বা 'সাত্যকি-মন্দির'), Tjandi Aswatama (অশ্বথামা-মন্দির), প্রভৃতি। এই নামগুলি হয়তো অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে দেওয়া; কিন্তু এই শিব-স্থানের সহিত কুরু-পাণ্ডবদের নাম জড়িত থাকা প্রাচীন ঐতিহ্য অবলম্বন করিয়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাহা হউক, দিএঙ-এর শৈব মন্দিরগুলি হইতে মহাভারতের অস্তিত্বের 'অকাট্য' প্রমাণ না হইলেও, পুরাণের কোনও কোনও আখ্যানের সহিত দেশের লোকের পরিচয়ের প্রমাণ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ইহার পরে মধ্য-যবদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে Prambanan প্রাম্বানান্-এর শিব-ক্ষেত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে তিনটি বিরাট্ মন্দির আছে, সেই মন্দিরগুলির ভিত্তি-গাত্রে খোদিত রামায়ণ ও কৃষ্ণচরিত্রের অপূর্ব সুন্দর চিত্রাবলী দর্শনে অনুমান করা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতকে যবদ্বীপের জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণের ও

মহাভারতের (অন্ততঃ মহাভারতের এক প্রধান পাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের) ঘটনাবলীর জ্ঞান বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল।

যবদ্বীপের প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দুযুগের ইতিহাসের প্রথম কল্প অন্ধতমিস্রাময়। ভারতবর্ষ হইতে—খুব সম্ভব পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ হইতে—ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী বণিগ্‌গণ আসিয়া এই দেশে উপনিবিষ্ট হয়, ও যবদ্বীপের আদিম মালয়জাতীয় অধিবাসীদিগের সহিত বিবাহ-সূত্রে মিলিত হইয়া 'হিন্দু যবদ্বীপীয়' অভিজাতবর্গের সৃষ্টি করে। প্রথম যুগের এই মিশ্র ভারতীয়-যবদ্বীপীয় জনগণের ধর্ম ব্রাহ্মণ্যই ছিল। ইতিমধ্যে সুমাত্রা দ্বীপেও হিন্দু বা ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। সুমাত্রায আগত ভারতীয়গণ বোধ হয উত্তর ও পূর্ব ভারত হইতেই আসে; ইহারা সুমাত্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সুমাত্রায় শ্রীবিষয়- বা শ্রীবিজয়-নগরে (আধুনিক Palembang পালেম্‌বাঙ্‌-এ) এক পরাক্রান্ত রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীবিজয়ের রাজবংশের নাম 'শৈলেন্দ্র-বংশ'। শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজারা দ্বীপময় ভারতের বহুল অংশে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। যবদ্বীপও ইঁহাদের দখলে আসিয়াছিল। যবদ্বীপে ইঁহারা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে সুবিখ্যাত Boro-boedoer বর-বুদুর ('বুদ্ধরের বিহার') চৈত্য নির্মাণ করেন।

অনুমান হয়, শৈলেন্দ্র রাজগণের শাসন-কালে, বৌদ্ধ রাজশক্তির পৃষ্ঠ-পোষকতার অভাবে যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেন একটু সংকুচিত, একটু নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দশম শতকের প্রারম্ভ হইতে পূর্ব যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য (শৈব)-ধর্মাবলম্বী যবদ্বীপীয রাজগণ আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ইঁহারা ধীরেধীরে সুমাত্রা হইতে আগত বৌদ্ধ-মতাবলম্বী বিদেশী শৈলেন্দ্র রাজশক্তিকে যবদ্বীপ হইতে দূরীভূত করিয়া দেশকে স্বাধীন করেন ও দেশে ব্রাহ্মণ্য মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিশুদ্ধ যবদ্বীপীয় এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে কয়জন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম নাম করিতে হয় রাজা দক্ষের। দক্ষ আনুমানিক ৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। খুব সম্ভব তাঁহারই আমলে প্রাম্বানানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তিনটি বিরাট্ মন্দির নির্মিত হয়। ইঁহার পরে রাজা Sindok সিন্দোক্-এর নাম পাই (আনুমানিক ৯৩০); ইঁহার অনেকগুলি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

এই সকল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজার রাজত্ব-কালে, যবদ্বীপে শিল্প ও সাহিত্য প্রভৃতি সব দিকেই একটি নূতন চেতনার, নবীন প্রাণের সাড়া পড়িয়া যায়। দশম ও একাদশ শতকে যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পত্তন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই সাহিত্য সৃষ্টি হয় অনেকটা মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া। রাজা ধর্ম্মবংশ যবদ্বীপে রাজত্ব করেন দশম শতকের শেষে। তাঁহার সময়ে যবদ্বীপীয় ভাষায় মহাভারতের একটি গদ্য অনুবাদ প্রস্তুত হয়। এই অনুবাদ একেবারে আক্ষরিক নহে—ইহাকে কতকটা সংক্ষেপে মূল কথা লিখিয়া যাওয়া বলা যাইতে পারে। তবে তখনকার দিনে যে সংস্কৃত মহাভারতের মূল গ্রন্থ যবদ্বীপে প্রচলিত ছিল, অনুবাদকগণ যে সেই মূল গ্রন্থ সামনে রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—ইহা বেশ বুঝা যায়। ইঁহারা মাঝে মাঝে মূল সংস্কৃত শ্লোকাংশ বা পূরা শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু এই যবদ্বীপীয় অনুবাদ হইতে মূল মহাভারতের পাঠ-নির্ণয় বিষয়ে দিগ্‌দর্শনে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়—অনুবাদ দেখিয়া, বিষয়-ক্রম এবং উদ্ধৃত মূল সংস্কৃত শ্লোক ও শ্লোকাংশ দেখিয়া, দশম ও একাদশ শতকে যে সংস্কৃত মহাভারত যবদ্বীপে ব্যবহৃত হইত, তাহার সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যাইতে পারে; এবং অধুনা-প্রচলিত ভারতীয় সংস্করণগুলির সঙ্গে তাহার একটি তুলনা করিলে, আদি মহাভারতের পাঠ-নির্ণয়ের পক্ষে সহায়তা হইতে পারে। ডচ্ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কিছু কাজ করিয়াছেন। ইঁহারা এই প্রাচীন যবদ্বীপীয় মহাভারত কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াছেন। D. H. H. Juynboll য়ুএন্‌বল্ রোমান অক্ষরে হলাণ্ড হইতে কতকগুলি পর্ব্ব প্রকাশিত করিয়াছেন—আদি, বিরাট, আশ্রমবাসিক, মৌষল ও মহাপ্রস্থানিক। বিখ্যাত ডচ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Dr. Hendrik Kern কেরন্‌-ও মহাভারতের যবদ্বীপীয় অনুবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের আলোচনা ডচ্ ভাষায় লিখিত বলিয়া আমাদের কাছে প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া রহিয়াছে।

মহাভারতের এই গদ্য অনুবাদ প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বেকার যবদ্বীপীয় ভাষায় লিখিত: এখন যবদ্বীপে সাধারণ লোকে এ ভাষা বুঝিবে না। এই প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার একটি নাম হইতেছে Basa Kawi 'কবি ভাষা' বা সংক্ষেপে Kawi 'কবি'। বোধ হয়, প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যেই এই ভাষার প্রয়োগ ছিল বলিয়া, মধ্য-যুগে যবদ্বীপীয়েরা এই নাম দিয়া তাহাদের

মাতৃভাষার প্রাচীন রূপকে নির্দেশ করিত; যেমন প্রাচীন ভারতে বেদের ভাষাকে 'ছান্দস' বা 'ছন্দঃ' বলা হইত। কবি-ভাষা সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ; ভারতের বাহিরের একটি দেশে, আধুনিক বাঙ্গালা উড়িয়া মারহাট্টির মত এত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কবি-ভাষায় গদ্য মহাভারত দশম-একাদশ শতকে রচিত হইলেও, ইহার পুঁথিগুলি তত প্রাচীন নহে; বড় জোর দুই-তিন শত বৎসরের। যবদ্বীপ তখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে—সংস্কৃতের চর্চাও তখন যবদ্বীপে লোপ পাইয়াছে। এইজন্য পুঁথিতে ধৃত সংস্কৃত শ্লোক ও শব্দাবলী ভ্রমপ্রমাদ-পূর্ণ। সম্পাদন-কালে শ্রীযুক্ত য়এন্‌বল্ কলিকাতার এশিয়াটিক্ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ পাঠ দিয়া আলোচনার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই গদ্য মহাভারত যবদ্বীপীয় ভাষার এক আদিম পুস্তক; সমগ্র মালয় পলিনেসীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই মহাভারতকে প্রাচীনতম পুস্তক বলা যায়। ইউরোপের নানা ভাষায়—এবং ইউরোপের বাহিরে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রথমে লিখিত নানা বন্য জাতির ভাষায়—যেমন হিব্রু ও গ্রীক বাইবেলের অনুবাদকেই প্রাচীনতম পুস্তক বলিতে হয়, তেমনি আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতের অনুবাদ একটি বিশাল ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন-স্থল হইয়া আছে।

কৌতুককর হইবে বলিয়া, এই প্রাচীন যবদ্বীপীয় গদ্য মহাভারতের আদি-পর্ব হইতে একটু নিদর্শন নিয়ে বঙ্গাক্ষরে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

[উতঙ্কের উপাখ্যান হইতে।

উচ্চারণ সর্বত্র স্বরান্ত; ['] = অর্ধ অ-কার; ৱ = w, ব = b]

মঙ্‌কন পব'কস্ সঙ্ সাবিত্রী রি সির। বিনেহক'ন্ ইর তেকঙ্ কুণ্ডল, আগিরঙ্ ত সঙ্ উত্তঙ্ক; মাজৱ্ ত সির রিঙ্ মহারাজ পোষ্য, অত'হ'ৱ্ অম্বিৎ মুলিহং; সিনয়ুতন্ ত সির, বিনেহ্ ভোজন রুমুহুন্। ই স'ড'ঙ্ নিঙ্ ভোজন ইনৱ্, পণ্যক'ন রি সির, কতোন্ তঙ্ স'কুল অতীস্ ততন্ য়োগ্য পঙন'ন ইং ব্রাহ্মণ; লিঙ্ নির।

"যস্মাদ্ অশুচ্যন্নং দদাসি, অতিশয়াশ্রাদ্ধস্ত মহারাজ পোষ্য, অপন্ অবেহ্ ভোজন তন্‌শুচি, মতঙ্ য়ুন্ বুতা ত কি[illegible]

মঙ্‌কন লিঙ সঙ্‌ উত্তঙ্ক। সুমহুর্ মহারাজ পোষ্য; ইক ভোজন তন্‌শুচি করেহ্‌, অপন্ সক রি গ্যা নির রি পমবিৎ সঙ্‌ উত্তঙ্ক মুলিহ তুমুলয্‌, মতঙ্‌ য়ন্ অঙ্‌গক্ পিণঙ্‌লিব'তক'ন্। মল'স্ ত সিরানপথ। "যস্মাদ্ অন্নং দূষয়সি, তস্মাদ্ অনপত্যো ভবিষ্যসি, ইবিঙ্‌ স'কুল পবেহ নি ঙ্‌হুলুন্ ভোজন রি কিত সিনঙ্‌ গুহ্‌ ত তন্‌শুচি; তন্‌তহ প্র ল্‌রিঙ্‌ত : জহ্‌ তস্মাদ অনপত্যা ত কিত।" (আদি-পর্ব, পৃঃ ১৩।১৪)

ধর্মবংশের কিছু পরে রাজা হন ঐর্‌লঙ্গ (Airlangga) বা এর্‌লঙ্গ (Erlangga)। ইনি একাদশ শতকের প্রথমার্ধে যবদ্বীপে রাজত্ব করেন। এর্‌লঙ্গের পিতা উদয়ন ছিলেন বলিদ্বীপের এক সামন্ত রাজা, তাঁহার মাতা মহেন্দ্রদত্তা ছিলেন ধর্মবংশের পূর্বজ সিন্দোক্-এর প্রপৌত্রী। এর্‌লঙ্গ প্রাচীন যবদ্বীপের এক প্রবলপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। বাল্যজীবনে ইনি বনে ব্রাহ্মণদের আশ্রমে প্রতিপালিত হন। ইনি ধর্মবংশের কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং নিজ শৌর্য্যে ক্রমে সমগ্র যবদ্বীপের অধীশ্বর হন, ও ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপের চক্রবর্তী রাজা রূপে অভিষিক্ত হন। ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার রাজ্য দুই পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই এর্‌লঙ্গের রাজত্ব-কালে যবদ্বীপীয় সাহিত্য তাহার প্রথম গৌরবময় যুগে পদার্পণ করে। ইতিপূর্বে যে গদ্য মহাভারত রচিত হয়, তাহাকে পণ্ডিতের পাঠোপযোগী পুস্তক বলা চলে। জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য, মহাভারতের আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি কাব্য যবদ্বীপীয় ভাষায় এই সময়ে সর্বপ্রথম রচিত হয়। 'অর্জুন-বিবাহ' কাব্যখানি এইরূপ মৌলিক কাব্যের মধ্যে প্রধান; বিরাট-পর্বের একটি কবিতাময় অনুবাদও রচিত হয়, এবং খুব সম্ভব রামায়ণেরও কবিতাময় অনুবাদ কবি-ভাষায় এর্‌লঙ্গের রাজত্ব-কালে প্রস্তুত হয়। এই সকল কাব্যের ছন্দ ও ভাব সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত, এবং ভাষা সংস্কৃত-শব্দ বহুল।

যবদ্বীপের প্রাচীন সাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনার রীতি বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে (১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা বর্ষজয়ের সভার কবি ত্রিগুণ, 'সুমনঃশতক' ও 'কৃষ্ণায়ণ' নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন; ইহার পরে

(১১২০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা কামেশ্বরের সভাকবি Mpu Dharmaja ম্‌পু ধর্ম্মজ 'স্মর-দহন' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

ইতিমধ্যে যবদ্বীপে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলিতে ধীরে ধীরে মূল সংস্কৃত-গ্রন্থের বহির্ভূত নানা বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় ক্রমে বিরল হইতে আরম্ভ করে ; হিন্দু ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়া ইহার একটি প্রধান কারণ। আর্য্য বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম যবদ্বীপে প্রবেশ লাভ করিবার পূর্বে, দেশের আদিম ধর্ম ও মনোভাব এবং আদিম জনগণের মধ্যে প্রচলিত আর্য্য-পূর্ব যুগের দেবতা-বাদ ও দেবতার লীলা—এই সমস্ত বস্তু একেবারে মরিয়া যায় নাই। এগুলি ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং ভারতবর্ষ হইতে আনীত রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের গল্পের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহাদিগকে বিকৃত অথবা যবদ্বীপীয় মনোভাবের অনুকূল করিয়া নবীনভাবে পুষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। ইতি-পূর্বে, এক হাজার বৎসরের অধিককাল যবদ্বীপে সাধারণ্যে মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি প্রচলিত রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালে, লোক-মধ্যে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মূল আখ্যানগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমিয়া আসায় ও অবশেষে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার ফলে, এই পরিবর্তন আরও দ্রুত বেগে ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত ভারতবর্ষ বা জম্বুদ্বীপের অস্তিত্বের কথাই যবদ্বীপের লোকে ভুলিয়া গেল ; এবং রামায়ণ-মহাভারতে ও পুরাণে বর্ণিত ঘটনাবলী যবদ্বীপেই ঘটিয়াছিল—লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল। যবদ্বীপে মহাভারতের এক নূতন রূপ ক্রমে দাঁড়াইয়া গেল—তাহাতে মূল আখ্যান ঠিক আছে, মূল পাত্রপাত্রীদের নাম ও বংশ-পরিচয় উভয়-ই কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও একেবারে পরিবর্তিত হয় নাই ;—মূলের বহু বস্তু আশ্চর্য্য-ভাবে অবিকৃত আছে—কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষে অজ্ঞাত নানা পাত্রপাত্রী ও ঘটনা-সমাবেশ আসিয়া জিনিসটিকে সম্পূর্ণরূপে যবদ্বীপেরই একটি বিশিষ্ট ব্যাপার করিয়া তুলিল।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্যাপারটি এত পরিবর্তিত হইতে পারে নাই। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজা জয়াভয়ের কালে (১১৩৫-১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) কবি Penuluh প'নুলুহ্‌ 'ভারত-যুদ্ধ' কাব্য লেখেন—ইহা মহাভারতের যুদ্ধের কথা ; এতদ্ভিন্ন হরিবংশের কাব্যানুবাদও করেন। সংস্কৃত-বহুল কবি-ভাষায়

এগুলি লেখা। কবি-ভাষা বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িল—মধ্য ও আধুনিক যুগের ভাষা আসিয়া গেল। এই সকল কাব্যকথা ভাঙ্গিয়া অর্বাচীন যুগের ভাষায় আবার নূতন কাব্য রচিত হইতে লাগিল। তারপরে মুসলমান ধর্ম আসিল, পঞ্চদশ শতকের প্রথমে প্রায় সমগ্র যবদ্বীপ মুসলমান-ধর্মাবলম্বী স্থানীয় রাজাদের হাতে গিয়া পড়িল—এই চারি শতকের মধ্যে সংস্কৃত-মূলানুসারী মহাভারত অন্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

যবদ্বীপের শিল্পে নূতন একটি রীতি ধীরে ধীরে আসিয়া যায়, এবং একটি অভিনব অভিনয়-প্রণালী ক্রম বর্ধমান লোকপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে ; ইহার প্রভাবেও যবদ্বীপে মহাভারতের ও রামায়ণের দ্রুত রূপ পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। শিল্পের নূতন ধারাটি আসিয়া যবদ্বীপের হিন্দু বা ভারতীয় প্রকৃতিকে একেবারে বদলাইয়া দিল। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ছিল বহিরঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক, অন্তরঙ্গে ভাবপ্রাণ ; অর্থাৎ দেবতা মানব পশু আদির মূর্তি অবলম্বনে কোনও গভীর আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করা-ই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। প্রতীক বা প্রকাশ স্থল রূপে এই যে মূর্তি প্রযুক্ত হইত, তাহা যথা-সম্ভব realistic বা বাস্তবানুসারী হইত। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রক পর্যন্ত, যে ভাস্কর্য-শিল্প ও চিত্র-শিল্পের নিদর্শন আমরা পাই, তাহা ভাবশুদ্ধি- ও ভাবপ্রাণতা-যুক্ত একটি বাস্তবিকতার দ্বারা উদ্ভাসিত। ইহার বিপরীত রীতি আমরা পাই অন্য ধরণের শিল্পে, যেখানে বস্তুতান্ত্রিকতা ও ভাবদ্যোতনা অপেক্ষা decoration বা অলংকৃতি-ই হইতে মুখ্য প্রেরণা ; এখানে দেবতা-, মানব-, বা পশু-মূর্তির স্থান হয় একেবারে-ই নাই, কিংবা যেখানে আছে, সেখানে বাস্তবানুসারিতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া, কেবল অলংকারের নকশা হিসাবেই অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে তাহাদের চিত্রণ করা হইয়া থাকে। মুসলমান-ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্প (কেবল পারস্য, তুরস্ক ও ভারতের মোগল যুগের মুসলমান চিত্র ছাড়া অন্যত্র) এই aniconic decorative art বা অমূর্ত অলংকৃতি-মূলক শিল্পের পর্যায়ে পড়ে ; বিজাতীয় বা গ্রীক খ্রীষ্টান শিল্প এইরূপ মূর্তিযুক্ত অলংকৃতি-মূলক শিল্পের শ্রেণীতে পড়ে। যবদ্বীপের প্রথম যুগের শিল্পে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যে শিল্প প্রচলিত ছিল তাহাতে, বাস্তবানুসারিতা ও প্রাচীন হিন্দু বস্তুতান্ত্রিক ভাবপ্রাণতা পুরাপূরি বিদ্যমান ছিল ; বর-বুদুর, প্রাম্বানান

প্রভৃতির শিল্প, এবং পরবর্তী যুগের কতকগুলি বিষ্ণু, শিব ও দেবীর মূর্তিও এই ধরণের—এই শিল্প ইহার প্রাচীন ভারতীয় জাতিত্ব হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু আদিম মালয় বা ইন্দোনেসীয় প্রবৃত্তি বা মনোভাবের নব-প্রতিষ্ঠার ফলে, যবদ্বীপের শিল্পে অলংকৃতি-প্রিয়তা আসিয়া গেল, বাস্তব রূপ অপেক্ষা অলংকার বা নক্‌শার সৌন্দর্য্যের দিকে একটা টান আসিয়া গেল। জীবৎকল্প প্রতিমূর্তি আড়ষ্ট প্রাণহীন পুতুলের পর্য্যায়ে গিয়া পহুঁছিল, এবং যবদ্বীপের শিল্প, Wayang ওয়াইয়াং বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত কিম্ভূতকিমাকার পুতুলের বিশিষ্ট শিল্পে পর্য্যবসিত হইল। চামড়ায় কাটা, রঙ্গীন ছবির মতন পুতুলের ছায়াকে সাদা চাদরের উপরে ফেলিয়া, ছায়ানাট্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী প্রদর্শন, যবদ্বীপে মধ্যযুগ হইতে প্রবর্তিত হয়; আজকাল এইপ্রকার অভিনয়-রীতি খুবই লোকপ্রিয়। যবদ্বীপের লোকেরা নামে মুসলমান হইলেও, মুখ্যতঃ এইপ্রকার ছায়ানাট্যের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতকে নিজেদের মধ্যে জীবন্ত রাখিয়াছে। জীবন্ত রাখিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ওয়াইয়াং-এর শিল্প-প্রভাবে এবং কালধর্মের প্রভাবে মূল সংস্কৃত ভাবকে অনেকটা বদলাইয়া ফেলিযাছে। ঠিক এক-ই রীতির ছায়ানাট্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পের অভিনয় বলিদ্বীপেও প্রচলিত আছে; এবং ঈষৎ অন্য ধরণের ছায়ানাট্যে, একটু অন্য রীতির মূর্তি অবলম্বন করিয়া এখনও শ্যামদেশে ও কম্বোজে রামায়ণ অভিনয়ের জন্য প্রযুক্ত হয়। যবদ্বীপের ছায়ানাট্যের বর্ণনা ইতিপূর্বে বাঙ্গালা-পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে ('প্রবাসী' পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৩৬, ও শ্রাবণ ১৩৩৮), তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে, এই ছায়ানাট্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া, মহাভারত এখনও কিভাবে দ্বীপময় ভারতে সুরক্ষিত হইয়া আছে, তাহার অল্প আলোচনা করা যাইতেছে।

যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান এখন কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ ডচ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত J. Kats কাট্‌স্ ডচ্ ভাষায় লেখা Het Javaansche Tooneel, I, Wajang Poerwa, Waltevreden (Batavia) 1923 নামে তাহার সুবৃহৎ ও সুন্দর চিত্র দ্বারা অলংকৃত পুস্তকে লিখিয়াছেন। এই পুস্তকের ইংরেজীতে বা ভারতীয় কোনও ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন, যবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত Inter-ocean নামক

ইংরেজী পত্রিকায় শ্রীযুক্তা Moons-Zorab মুন্‌স-জোরাব যবদ্বীপের মহাভারত, পুরাণ ও আখ্যায়িকার সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যপূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ বহু বৎসর হইল লিখিয়াছেন। যবদ্বীপীয় মহাভারত-কাহিনী প্রথমতঃ দেবতাদের কতকগুলি আখ্যায়িকা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্ম প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হয়। পরে কুরুবংশের কথা, এবং পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের চরিত বর্ণনা। তারপরে সংস্কৃত মহাভারতের মত পাণ্ডব ও কৌরবগণের ইতিবৃত্ত, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রভৃতি পর্য্যায় সমস্ত-ই আছে। যবদ্বীপের লোক-প্রচলিত মহাভারতে কিন্তু মূল কুরুপাণ্ডব-কথা ব্যতীত, সাবিত্রী-চরিত, নলোপাখ্যান প্রভৃতি অন্য উপাখ্যানের স্থান নাই—অন্ততঃ কাট্‌স্‌-এর বইয়ে ২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী যে যবদ্বীপীয় মহাভারতের সারাংশ দেওয়া আছে, তাহাতে পাইতেছি না। মূল কৌরব-পাণ্ডব-চরিত লইয়া-ই ইহাদের মহাভারত। তবে প্রত্যেক পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মহাভারত ও পুরাণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনেক গল্প আছে। বিশেষ খুঁটিনাটির সঙ্গে প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর জন্ম- ও বিবাহ-কথা বর্ণিত ও নাটিত হয়। অবশ্য মূল আখ্যান-ভাগ মোটের উপর অনুসৃত হইয়াছে। সংস্কৃত-মহাভারত-বহির্ভূত যে-সকল নূতন গল্প ও নূতন পাত্র-পাত্রী আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি যবদ্বীপের প্রাচীন লোক-ধর্ম-সংক্রান্ত দেবতা, যোদ্ধা বা রাজা-রাণী প্রভৃতি। ইহাদের অনেকের নামও সংস্কৃত নহে। আবার যবদ্বীপীয়দের মুখে সংস্কৃত নামগুলি বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, কিংবা নূতন নাম সৃষ্ট হইয়াছে; যথা Palasa [illegible] = পরাশর, Poentadewa = যুধিষ্ঠির, Tjompala = পাঞ্চাল, Jama-Widoera = বিদুর, Arimbi = হিড়িম্বা, Ngastina = হস্তিনাপুর, Soembadra = সুভদ্রা, Destarata = ধৃতরাষ্ট্র, Sougkuni = শকুনি, ইত্যাদি। মহাভারতের কতকগুলি কথাবস্তু যবদ্বীপে এবং বলিদ্বীপেও বিশেষরূপে জনপ্রিয়। ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ যবদ্বীপীয় মহাভারতের মতে অর্জুনের কন্যা Dewi Pregiwa 'দেবী প্রগীবা(?)'-কে বিবাহ করেন। ঘটোৎকচের পুত্রের নাম 'শশিকিরণ'। পাশুপত অস্ত্র লাভের জন্য অর্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জুনীয়ম্ (কিরাত-বেশী মহাদেবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ), অর্জুনের স্বর্গে গমন, নিবাত-কবচ বধ (সংস্কৃত মহাভারতের নিবাত-কবচ-জাতীয় রাক্ষসগণ যবদ্বীপে একজন দৈত্য রাজাতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে) ও অপ্সরা সুপ্রভার সহিত অর্জুনের বিবাহ—এই

আখ্যান যবদ্বীপে 'মিন্তরাগ' বা 'বীতরাগ' অর্জুনের আখ্যায়িকা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং বিখ্যাত যবদ্বীপীয় কাব্য 'অর্জুন-বিবাহ' এই সমস্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত। অর্জুনেব সঙ্গে বিকটাকৃতি Semar 'সেমার' নামে তিনজন অনুচব সর্বদা ফিরিত ; সেই 'সেমার'-ত্রয় প্রাচীন যবদ্বীপীয় দেবলোক হইতে মহাভারতের জগতে আমদানী-করা।

যবদ্বীপীয় জনগণ মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিবার পরে, মহাভারতের এই বিস্তৃত আখ্যায়িকার·ভিতবে কিছু-কিছু মুসলমানী ভাবও প্রবেশ করে। মহাভারতের উপাখ্যানটিকে একটি স্থফী মতবাদের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির এখনও যবদ্বীপীয়দেব কাছে 'ধর্ম-বংশ' বা 'ধর্ম-পুত্র' নামে পরিচিত, আদর্শ নরপতি রূপে সম্মানিত। তিনি শান্তিপ্রিয় লোক, এত বেশী ক্ষমাশীল যে লোকে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে পারে। তিনি শত্রু জয় করেন—তাঁহার সত্যের বলে ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। Kalima Sada 'কালিমা সাদা' নামে যুধিষ্ঠিরের একটি মন্ত্রপূত তাবিজ আছে, যাহাব ইন্দ্রজাল-প্রভাবে তিনি জগতে সর্বত্র জয়ী। এই তাবিজে লিখিত hadji 'হাজি' বা জ্ঞান যুধিষ্ঠিরের জানা আছে বলিয়াই তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব।

যবদ্বীপীয় মহাভারতে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বিরোধী যে বহু কথা আছে, সেগুলির দুই-একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব 'চম্পাল' বা পাঞ্চাল রাজ্যে গেলেন। সেখানে রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হইতেছিল। রাজা দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভীম বীরত্ব না দেখাইয়া এইরূপে কন্যাগ্রহণ করা অনুমোদন করিলেন না,—কারণ সেরূপ করিলে পাণ্ডব-নামে কলঙ্ক পড়িবে। তিনি রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুপদের ভ্রাতা Gandamana গন্ধমনের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে জয় করিলেন। যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। যবদ্বীপীয় মহাভারতে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কথা নাই, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বের কথাও নাই। যবদ্বীপীয় মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য বরাবর-ই পাণ্ডবদের বিরোধী, তাঁহার-ই চেষ্টায় পাশা-খেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ঘটে। মূল মহাভারতে

বর্ণিত আছে যে, পাণ্ডবদের অরণ্যবাস-কালে একদা দ্রৌপদী যখন আশ্রমে একা ছিলেন, তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবার প্রয়াস করেন, কিন্তু সফলকাম হন না, পাণ্ডবদের হাতে তাঁহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা ঘটে। অপর, বিরাটের রাজসভায় কীচকের হাতে দ্রৌপদীর নিগ্রহ হয়, ফলে ভীম কর্তৃক কীচক-বধ ঘটে। এই দুই কথার আধারেব উপরে যবদ্বীপের মহাভারতে ভারতবর্ষে অজ্ঞাত দুইটি নূতন ও সম্পূর্ণরূপে যবদ্বীপীয় গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দাতা ছিলেন, যে যাহা চাহিত তিনি তাহাকে তাহা দিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র, যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিবার মানসে, Bismaradja 'ভীষ্মবাজ' নামে অসুরের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, দ্রৌপদীকে নিজের রাণী করিবার জন্য যুধিষ্ঠিবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজচিহ্ন Toouggoel Naga 'তুঙ্গুল নাগ' নামে রাজচ্ছত্র ও 'কালিমা-সাদা' নামে ঐন্দ্রজালিক তাবিজ তাঁহার সঙ্গে থাকিলে, কেহ-ই তাঁহার হানি করিতে পারিবে না; সেজন্য ভীষ্মরাজ-রূপী ইন্দ্র তাঁহাব ভগিনীকে দেবর্ষি নারদের বেশে যুধিষ্ঠিবের কাছে গিয়া ঐ দুইটি বস্তু চাহিয়া আনাইবার জন্য পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির নারদ-বেশী ভীষ্মবাজ-ভগিনীকে বস্তু দুইটি দিলেন, এবং দ্রৌপদীকে ভীষ্মরাজের গৃহে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাঁহাব ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না—তাঁহারা এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন বিনা কিছু করিবেন না স্থির করিলেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ দ্বারাবতী হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য আকাশ-মার্গে উড়িয়া গেলেন। ইতিমধ্যে স্বীয় রাজচিহ্ন ও তদধীন রাজ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যুধিষ্ঠির উন্মাদের মত হইয়া গেলেন, এবং রাক্ষসবৎ যাহা সম্মুখে পড়ে তাহা-ই ধ্বংস করিতে লাগিলেন। অন্য পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের আগমনের অপেক্ষায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ঘটোৎকচের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গগন-মার্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে নারদ-বেশী ভীষ্মরাজ-ভগিনীর নিকট হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজচিহ্ন ছত্র ও তাবিজ উদ্ধার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে তাহা আনিয়া দিলেন; ইহাতে যুধিষ্ঠির শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইতিমধ্যে ভীষ্মরাজ-বেশী ইন্দ্র উপস্থিত হওয়াতে, অর্জুন বাণ মারিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন; ইন্দ্র ভীষ্মরাজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে দেখা দেন। যুধিষ্ঠির এদিকে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুদূর দেশে গমনপূর্বক তপশ্চারণের

জন্য Mega-malang 'মেঘ-মালঙ্' নামে বিরাট্ এক মেঘখণ্ডকে আসন করিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য 'মেঘ-মালঙ্' অভিমুখে গমন করিলেন। পথে Dewa Mambang 'দেব মাম্বাঙ্' নামে এক রাক্ষসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়—শ্রীকৃষ্ণ তখন Tiwikrama 'ত্রিবিক্রম' নামে নিজ রাক্ষসী মূর্তি প্রকট করিয়া চক্রাস্ত্রের দ্বারা দেব-মাম্বাঙ্-কে বধ করেন। তাহার পরে তিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে আবার গৃহে পাঠাইয়া দেন।

এই প্রকার নানা অপরূপ উপাখ্যান যবদ্বীপেই কল্পিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। অনুরূপ আর একটি যবদ্বীপীয় গল্প হইতেছে Erangbaya 'এরঙ্ভয়'-এর আখ্যান। Roedjemlawa 'রুজিম্লব' দেশের রাজা এরঙ্ভয়-ও দ্রৌপদীকে কামনা করে। এই ব্যাপার লইয়া দ্রৌপদীর কনিষ্ঠা ভগিনী অর্জুনের পত্নী Srikanti 'শ্রীকান্তি' জ্যেষ্ঠা দ্রৌপদীকে নানা বিষয়ে যথেষ্ট অপদস্থ করেন। বলা বাহুল্য, এই আখ্যানও আমাদের দেশে অজ্ঞাত।

সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ-কাহিনী ব্যতীত যবদ্বীপের লোক-প্রচলিত মহাভারতে পাণ্ডবদের পরলোক-গমনের অন্য এক অদ্ভুত কাহিনী বিদ্যমান আছে। পাণ্ডবেরা পরীক্ষিৎকে রাজা করিলেন, ও নিজেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনবাস করিতে লাগিলেন। পরে পরীক্ষিতের কাছে দূত পাঠাইয়া যুধিষ্ঠির, পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদী, ইঁহাদের জন্য ছয়টি 'চাণ্ডী' বা 'চান্দি' অর্থাৎ স্মৃতি- বা সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, শীঘ্রই ইঁহারা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া মোক্ষলাভ করিবেন। সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হইলে পরে, শ্রীকৃষ্ণ সহ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া মন্দিরগুলি অবলোকন করিলেন। তৎপরে চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া, প্রথমে দ্রৌপদী ও পরে অর্জুন নকুল সহদেব ও যুধিষ্ঠির তাহাতে প্রবেশ করিয়া অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন করিলেন। কিন্তু ভীম অগ্নিপ্রবেশ না করিয়া কেবল তাঁহার কেশচ্ছেদ ও হস্তপদের নখ কর্তন করিয়া যোগাসনে বসিলেন, এবং আকাশের সঙ্গে মিশিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মুসলমান-যুগের একখানি ইতিহাসে যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যান আছে:—পাণ্ডবগণের নাশ হইল, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁহার 'কালিমা-সাদা'র ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে অমর হইয়া রহিলেন। পরে Sultan

Kalidjaga 'সুলতান কালিজাগা' নামে একজন যবদ্বীপীয Wali 'ওলী' বা ঐশ্বরিক-শক্তি-বিশিষ্ট প্রথম যুগের ইস্‌লাম-প্রচারক—যুধিষ্ঠিরের 'কালিমা-সাদা'র মধ্যে নিহিত 'হাজি' বা যোগবিদ্যা বা জ্ঞানের সন্ধান পান, ও তাহা পাঠ করিয়া এই জ্ঞান আত্মসাৎ কবেন। এইরূপে যুধিষ্ঠিরেব যোগবিদ্যার অধিকার লাভ করিযা, এই মুসলমান সাধু, নিজেই যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মরাজের পুত্র বা অংশ হইয়া গেলেন—প্রাচীন যবদ্বীপের সমস্ত আধ্যাত্মিক ও ঐন্দ্রজালিক সম্পদ্‌ মুসলমান গুরুর অধিকারে চলিযা গেল। যুধিষ্ঠিবের তখন আব জীবিত থাকিবাব আবশ্যকতা রহিল না—তিনি যবদ্বীপে ইস্‌লাম-ধর্ম প্রচারেব সঙ্গে-সঙ্গে দেশেব প্রাচীন হিন্দুধর্মেব সহিত-ই মরিলেন। হিন্দু যবদ্বীপের উপরে মুসলমান-ধর্মের বাহ্য চিহ্ন পডিল, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাহাব গভীরতম অনুভূতির প্রতীক-স্বরূপ যুধিষ্ঠিরের নামের সহিত জড়িত এই যোগবিদ্যা বহিযা গেল। ইহা যেন একটি সজ্ঞানে রচিত রূপক।

এমনি করিয়া যবদ্বীপে মূল সংস্কৃত মহাভারতের পরিবর্তন ও পর্য্যবসান ঘটিয়াছে।

[বঙ্গাব্দ ১৩৩৮]

রামায়ণ

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ দ্যুলোকে প্রচরিষ্যতঃ।
তাবদ্ রামায়ণী কথা ভূলোকে প্রচরিষ্যতি ॥

একজন ভক্ত খ্রীষ্টান লেখক যীশু খ্রীষ্টের জীবন-চরিতকে the Greatest Story Ever Told অর্থাৎ "জগতের সব চেয়ে মহৎ উপাখ্যান" আখ্যা দিয়া কিছুকাল আগে আমেরিকায় ও ইউরোপে খ্রীষ্টায়নের বা যীশু-চরিতের পুনঃ-প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করেন। যে-কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেই হউক না কেন, ভক্তের নিকটে তাঁহার ইষ্টদেবতার কথার চেয়ে বড়ো আর কিছু-ই নাই—পাঠে শ্রবণে কীর্তনে অনুধ্যানে নব-নব অনুপ্রেরণা ও রসানুভূতির চিরন্তন উৎস-স্বরূপ হইয়া, ভক্তের প্রাণে তাঁহার ইষ্টদেবতার কথা চিরতরে বিরাজমান থাকে। কিন্তু এমন কতকগুলি উপাখ্যান বিশ্বমানবের রস-সর্জনার ভাণ্ডারে সুপ্রাচীন কাল হইতেই রক্ষিত হইয়া আছে, যেগুলি অমর, যুগযুগান্তর ধরিয়া যেগুলি মানুষের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করিয়া আসিতেছে; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকে যেগুলি বিভিন্ন দেশে নব-কলেবর ধারণ করিলেও, মূল কথা-বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার আভ্যন্তর মহত্ত্বের আবেদন আপামর সাধারণের নিকটে পহুঁছাইয়া দিতেছে। রামায়ণের উপাখ্যান সমগ্র বিশ্ব-মানবের চিত্তের রসায়ন-স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি উপাখ্যানের মধ্যে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর উপাখ্যান। প্রাচীন ভারত-বিদ্যার আধুনিক রীতির আলোচকগণের মতে, অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতে আর্য্যভাষায় রামায়ণ-কথা তাহার প্রথম রূপ গ্রহণ করে। পরে ভারতবর্ষের মধ্যেই নানা সাহিত্যিক ও মৌখিক রূপভেদকে আশ্রয় করিয়া এই উপাখ্যান পরিবর্ধিত ও মার্জিত হয়; এবং ভারতের বিভিন্ন কথ্য ভাষায় প্রচলিত মৌখিক রূপগুলির বিলোপ-সাধন না করিয়া; পরন্তু সেগুলিকে অতিক্রম করিয়া, মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্য নামের সহিত জড়িত সংস্কৃতভাষায় রচিত রামায়ণ-রূপে এই উপাখ্যান এমন একটি চিরস্থায়ী মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়াছে, যাহা কেবল ভারতীয় মানবের পক্ষে নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেও, এক অতি মহৎ সাহিত্যিক রিক্থ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। এই রিক্‌থের অন্তর্নিহিত পারিবারিক ও ধার্মিক আদর্শ ও নীতি তথা রম্য ভাবসম্পুট, সমগ্র মানবজাতিকে সর্বকালে অনুপ্রাণনা দান করিবে ও আকুল করিতে সমর্থ হইবে।

ভারতবর্ষের সভ্যতার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে, ভারতের ভারত-ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে রামায়ণ ও মহাভারতের মাধ্যমেই। বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে এশিয়া-খণ্ডে ও অন্যত্র যেখানেই ভারতের বাণী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই রামায়ণ এবং মহাভারতের উপাখ্যান ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা অথবা প্রচার হইয়াছে। ভারতের ভারতীয়তার প্রসারের ফলে এশিয়া-খণ্ডের কতকগুলি দেশকে Greater India অর্থাৎ "বৃহত্তর ভারত" নাম দিয়া বিশালতর ভারতবর্ষের এক একটি অংশ বলিয়া ধরা হয়। এই দেশগুলি হইতেছে, Farther India বা "প্রত্যর ভারত", অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, কোচিন-চীন বা চম্পা এবং লাওস্-অঞ্চল (Viet nam ভিয়েৎনাম বা Indo-China ইন্দোচীনের আনামী-ভাষী জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত দেশ, ঠিক মত বৃহত্তর ভারতের অংশ নহে—এই দেশ বাস্তবিক "বৃহত্তর চীন"-এরই অংশ) ; Malaya বা মালয়-উপদ্বীপ, ও Indonesia ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ "দ্বীপময় ভারত" বা দ্বীপান্তরের দ্বীপসমূহ (সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, লম্বক, সুম্বাওয়া, তিমোর, সুলাবেসি, বোর্নিও প্রভৃতি) ; এবং Serindia অর্থাৎ প্রাচীনকালের মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি প্রদেশ (যেমন কুস্তন বা খোতন, অর্থাৎ পশ্চিম Sin-Kiang সিন-কিয়াং বা চীনা তুর্কিস্তান ; ক্রোরায়্না বা পূর্ব-সিন-কিয়াং ; ঋষীক দেশ বা তোখারিস্তান অর্থাৎ উত্তর-সিন্‌-কিযাং ; চুলিক বা সুগ্‌দ দেশ অর্থাৎ প্রাচীন সোগ্দিয়ানা)। ভারতবর্ষ হইতে যে-সমস্ত দেশে ভারত-ধর্মের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার হইয়াছে, সেই-সমস্ত দেশে রামায়ণ মহাভারত ও নানা পৌরাণিক উপাখ্যানও পহুঁছিয়াছে—তবে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার উপর-ই এই-সব দেশে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। এইজন্য মধ্য-এশিয়া হইয়া চীনে রামায়ণ-কথা পহুঁছায় বটে, কিন্তু 'রামঞ্‌ঞদেস' বা সুবর্ণভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ-ব্রহ্মের, ও দক্ষিণ-শ্যামের দ্বারাবতী রাজ্যের Rmen 'র্মেঞ্‌' বা Mon মোন্‌-জাতি, Cambodia বা কম্বুজদেশের Khmer খ্‌মের-জাতি, উত্তর- ও মধ্য-ব্রহ্মের Thul-Cuk থুল-চুক্‌ অথবা Pyu

প্যু এবং Mran-Ma ম্রন্‌-মা বা ব্রহ্ম-জাতি, উত্তর-শ্যামের Dai দৈ বা Thai থাই-জাতি, চম্পার Cham চাম-জাতি, মালয়-উপদ্বীপের Malay মালাই-জাতি এবং যবদ্বীপের সুন্দা, মাদুরা ও যবদ্বীপীয় জাতি তথা বলিদ্বীপের ও লম্বকদ্বীপের অধিবাসিগণ—ইহারা সকলেই এককালে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শে অনু-প্রাণিত ধর্ম ও সমাজ গড়িয়া তুলে, এবং এই ধর্ম ও সমাজকে জীবনে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে। সেই হেতু ইহাদের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের—বিশেষ করিয়া রামায়ণের—এক লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায়। এক বলিদ্বীপ ও আংশিকভাবে লম্বকদ্বীপ ছাড়া, এই-সমস্ত দেশে এখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম বা ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ বিদ্যমান নাই;—ব্রহ্মে, শ্যামে, কম্বুজদেশে ও চম্পায় লোকে এখন বৌদ্ধধর্ম পালন করে, যদিও তাহারা কিছু পরিমাণে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে তৎতদ্‌-দেশের ব্রাহ্মণের নির্দেশ মানিয়া চলে। অন্যত্র—মালয়-উপদ্বীপে ও দ্বীপময়-ভারতে, জনসাধারণ মুসলমান-ধর্মই স্বীকার করিয়া লইয়াছে; তথাপি তাহাদের জীবনে অতীতের অবশেষ-স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব এখনও গভীরভাবে কার্য্য করিতেছে, বিশেষ করিয়া যবদ্বীপে;—স্বাধীন ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারত রাষ্ট্রের আমাদের ভারতে প্রেরিত প্রথম রাজদূত শ্রীযুক্ত Soedorsono সুদর্শন ভারতবর্ষে অবস্থান-কালে এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ইন্দোনেসিয়ার ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে, বাহিরে মুসলমান-ধর্ম সকলে মানিলেও, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব এখনও বিশেষ প্রবলভাবে বিদ্যমান।

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়া, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত রামায়ণ-উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু ছোট-বড়ো কাব্য-নাটকাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য ভাষাতে, যথা পালি ও বিভিন্ন প্রাকৃতে, রামায়ণ-কথা নানাভাবে মিলে। রামায়ণ জৈনদের মধ্যেও বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল, এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতে জৈন রামায়ণ আছে। ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে, উত্তর-ভারতের আর্য্যভাষার মতই, রামায়ণের বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। তমিল্‌ ভাষায় মহাকবি কম্বন্‌-রচিত রামায়ণ, তমিল্‌ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তেলুগু, কানাড়ী ও মালয়ালম্‌ ভাষায় রামায়ণ-আখ্যান লইয়া বহু কাব্য ও নাটক আছে। বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রাম-কথা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ

করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হইতেছে—রামায়ণাশ্রয়ী কোনও-না-কোনও মহাকাব্য। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহৃদয় সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিগণের চেষ্টায় রামায়ণের একাধিক অনুবাদ বা রূপায়ণ ফারসী ভাষাতেও হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে, তিব্বতী, চীনা, বর্মী, মোন্, খ্মের, শ্যামী, মালাই, প্রাচীন ও মধ্যযুগের যবদ্বীপীয় ও সুন্দানী ভাষায়, এবং বলিদ্বীপের ভাষায়, সংক্ষিপ্ত রাম-কথা অথবা নাতি-ক্ষুদ্র রামায়ণ-গ্রন্থ উপলব্ধ হইয়াছে। যবদ্বীপীয় ভাষায় একাধিক রামায়ণ বিদ্যমান। ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাহিরে যে এতগুলি বিভিন্ন রূপে রাম-কথা প্রচলিত আছে, সেগুলির বিষয়-বস্তু সর্বত্র এক নহে—ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা পার্থক্য সেগুলির মধ্যে দেখা যায়। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন রাম-কথার বিভিন্ন রূপ-ভেদ সম্বন্ধে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আলোচনা প্রসঙ্গে। দীনেশ-বাবু এই বিষয়ে পরে আরও বিশদ করিয়া তাঁহার ইংরেজী পুস্তক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ সালে প্রকাশিত) The Bengali Ramayanas-তে আলোচনা করেন। তিনি দেখাইয়া দেন, মহর্ষি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ও বাঙ্গালা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, এই উভয়ের মধ্যে ভাবের ও ঘটনার পার্থক্য কত বেশী। বস্তুতঃ, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কেবল মূল কথা-বস্তুর ব্যত্যয় না করিয়া, রাম-কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া রচিত সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ ও বাঙ্গালা কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, দুইখানি পৃথক্ পুস্তক। তুলসীদাসের কোসলী (হিন্দী) রামায়ণ, যাহার কবি-দত্ত নাম হইতেছে 'শ্রীরামচরিত-মানস', এইরূপ আর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক; ইহাতে কেবল বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করা হয় নাই—তুলসীদাস স্বয়ং বলিতেছেন—

নানা-পুরাণ-নিগমাগম-সম্মতং যদ্
রামায়ণে নিগদিতং, ক্বচিদ্ অন্যতোঽপি বা।
স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা-
ভাষানিবন্ধম্ অতিমঞ্জুলম্ আতনোতি ॥

"অনেক পুরাণ-, বেদ- ও শাস্ত্র-সম্মত যে কথা রামায়ণে আছে, আরও

অন্যত্র হইতে (নিজের অনুভব) একত্র করিয়া, নিজের অন্তরের স্থখের জন্য রঘুনাথজীর গাথা, ভাষায় মনোহর ছন্দাদিরূপে বিস্তারপূর্বক তুলসী রচনা করিতেছে।" (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের বঙ্গানুবাদ)

তুলসীদাস নিজ অনুভব ও কবি-কল্পনার প্রয়োগে তাঁহার "রামরচিত-মানস"-কাব্য রচনা করিয়াছেন; এবং সর্বোপরি এক অপূর্ব ভক্তিব ধারায় তাঁহার রাম-কথা আপ্লুত কবিযা দিয়াছেন। এই ভক্তির প্রবাহ বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। এইজন্য তাঁহার কাব্য ভক্তিরসের এক অপূর্ব উৎস হইয়া বিরাজমান; সহৃদয় পাঠক একবার তুলসী-রামাযণের রস আস্বাদন করিলে, তাহাকে আর ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ছোট-খাটো বিষযে তিনি বাল্মীকি-রামায়ণকে পূরাপুরি অনুসরণ কবেন নাই,—দুই-চারিটি এমন ঘটনার সমাবেশ তিনি করিয়াছেন যাহাতে মূল আখ্যায়িকার হানি হয় নাই অথচ তাহা আরও কল্পনোজ্জ্বল হইযাছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জনকের সভায় বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের আগমনের পূর্বে মিথিলার রাজোদ্যানে রাম ও সীতার পরস্পরকে দর্শন ও পূর্বরাগ—ইহাতে মূল উপাখ্যান যেন আরও সুন্দর হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, দক্ষিণ-ভারতের তমিল্ মহাকবি কম্বন্-এর রামায়ণে এই পূর্বরাগের কথাও আছে—কম্বন্ তুলসীদাসের প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বেকার কবি; সুতরাং অনুমান করা যায় যে, এ বিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত অন্য কোনও রাম-কথার ধারা অনুসৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যেই রামায়ণের কতকগুলি পৃথক্ ধারা দেখিতে পাওযা যায়। 'অদ্ভুত রামায়ণ' আছে; তদ্ভিন্ন রাম-কথার দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এবং 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত রাম-কথার বিভিন্ন রূপ লইয়া বিচার করিলে, একখানি অতি উপাদেয় গবেষণাত্মক পুস্তক রচিত হইতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন যুগে রচিত রাম-কথায় মূল উপাখ্যানের অতিরিক্ত যে ঘটনা-বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, তাহা লক্ষণীয়। সাধারণ অষ্ট পুরাণানুমোদিত বহু ব্যাপার রামায়ণের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে যেমন, অন্যত্রও তেমনই কবিগণ সাধারণতঃ বাল্মীকির গ্রন্থ লইয়া-ই অনুবাদ করিতে বসিতেন না। রাম-কথা আকাশের আলো ও বাতাসের মতো দেশের মানুষের মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া

বিরাজ করিয়াছে। কবিরা সহজভাবে চোখের জ্যোতি ও নাসিকার শ্বাসের মতো রামায়ণ-কথা নিজ-নিজ চিত্তে গ্রহণ করিয়া, পুরাণ-পাঠক এবং রামায়ণ-গায়কের দ্বারা প্রচারিত নানা পুণ্যময় প্রাচীন আখ্যায়িকা বা ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া, নূতনভাবে দেশের জনগণের মধ্যে রামায়ণ-কথার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বাহিরেও রাম-কথার লক্ষণীয় বিকাশ বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। পালি জাতক-গ্রন্থে প্রাপ্ত 'দসরথ-জাতক'-এ যে-ভাবে রাম-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রচলিত রাম-কথা হইতে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের—ইহাতে রাবণ বা সীতা-হরণের স্থান নাই। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ হিমালয়-অঞ্চলে বনবাসে গিয়াছিলেন, এবং পরে সেখান হইতেই তাঁহারা রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন; পালির দশরথ-জাতকের মধ্যে অদ্ভুত কথা এই যে, সীতা ছিলেন রামের ভগিনী ও পরে বিবাহিতা স্ত্রী। কোনও-কোনও মতে, রামায়ণ-কথায় অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র উপাখ্যানের সমাবেশ বা সংমিশ্রণ আছে—অযোধ্যার কথা, কিষ্কিন্ধ্যার কথা, এবং লঙ্কার রাবণের কথা। ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ অবদান-কথার অনুবাদের মাধ্যমে রাম-কথা চীন দেশে পহুঁছায়—সে রাম-কথা পালি দশরথ-জাতকেরই আখ্যানের মত। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে, মধ্য-এশিয়ার সোগ্‌দিয়ানা বা চুলিক-দেশের এক ভিক্ষু কর্তৃক চীনা ভাষায় যে রাম-কথা অনূদিত হয়, তাহা কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ—ইহাতে রাম-সীতার নির্বাসন, রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণ, জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ, বালি- ও সুগ্রীব-সংবাদ, সেতুবন্ধ, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা প্রভৃতি মূল বিষয়-বস্তু আছে; কিন্তু লক্ষণীয় কথা, রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতির নামগুলি মূল সংস্কৃত রূপে নাই। রামায়ণ-কথার প্রারম্ভিক রূপ আলোচনার জন্য, দশরথ-জাতক ও চীনা ভাষায় অনূদিত রাম-কথাগুলির সার্থকতা আছে। চীনারা ভারতীয় (সংস্কৃত) নামেরও চীনা অনুবাদ করিত; তাহাদের এই অনুবাদ, অনেক সময়ে আমাদের কাছে সুপরিচিত সংস্কৃত নামের আধারে না হইয়া, অন্য অনুরূপ ও অজ্ঞাত নামেরই অনুবাদ হইত। তদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে এই-সব নামের অন্য বিকল্প-রূপও প্রচলিত ছিল। চীনারা "ধৃত-রাষ্ট্র" না বলিয়া (বা বলিবার চেষ্টা না করিয়া) ইহার অনুবাদ করিত "তী-কুও" (Ti-Kuo অর্থাৎ Hold-Kingdom); সেইরূপ "তথাগত" = "ঝু-লাই"

(Ju-lai অর্থাৎ That-way Gone), "অশ্বঘোষ" = "মা-হেঙ্" (Ma-heng = Horse-Neigh)। "দশ-রথ" এই নামের অন্য একটি প্রচলিত রূপ "দশ-রত" ধরিয়া, তাহারা ইহার অনুবাদ করিয়াছে—Shih-hsi "শ্যঃ-শী" = Ten-Pleasures ; "দশ-রথ" = Ten-Chariots-এর চীনা অনুবাদ হয় Shih-choe "শ্যঃ-চ্যো"। সুতরাং যে প্রাচীন রামায়ণ-কথা প্রথম চীনা ভাষায় অনূদিত হয়, তাহাতে "দশ-রত" নামটিই ছিল—"দশ-রথ" নহে। (তুলনীয, "ভারত"-শব্দের প্রাচীন কালে প্রচলিত দুইটি রূপ—"ভারত" ও "ভারথ" ; এই "ভারথ" হইতেই প্রাকৃতে "ভারধ", "ভারহ", এবং আধুনিক ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষায় "ভারথ")।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খণ্ডে, ইন্দোচীনে, ও ইন্দোনেসিযা-তে রামায়ণ-কথা খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের প্রথম ভাগেই প্রচারিত হইযাছিল। কম্বুজদেশের Veal Kantel বেআল্ কান্তেল্ নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয ষষ্ঠ শতকের একটি সংস্কৃত লেখ হইতে জানা যায় যে, সেখানকাব একটি মন্দিরে বাজা ভববর্মা কর্তৃক রামায়ণ, ও অশেষ বা সম্পূর্ণ ভারত অর্থাৎ মহাভাবত এবং পুবাণ গ্রন্থ অর্পিত হইয়াছিল, এবং ঐ সকল গ্রন্থ প্রত্যহ পঠিত হইত—

রামায়ণ-পুরাণাভ্যাম্ অশেষং ভারতং দদৌ
অকৃতাহন্বহম্ অচ্ছেদ্যাং বাচনাস্থিতিম্।

চম্পা-দেশের Tra Kieu ত্রা-কিয়্যো লেখ হইতে জানা যায যে, রামায়ণের কবি মহর্ষি বাল্মীকির একটি প্রতিমা পূজার জন্য ঐ দেশে স্থাপিত হইয়াছিল ; এই লেখটি রাজা প্রকাশবর্মা (৬৫৩-৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) কর্তৃক উৎকীর্ণ হয। এইরূপ 'পাথুরে' প্রমাণ' হইতে বুঝিতে পারা যায়, এখন হইতে অন্ততঃ দেড-হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীনে রামায়ণ-মহাভারত কিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দোচীনের—কম্বুজ ও চম্পার, তথা শ্যামের—ভাষা-সাহিত্যে ও শিল্পেও রামায়ণের অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য শিল্প-সৃষ্টি হইতেছে Angkor Vat অঙ্কর বাৎ-এর (অর্থাৎ 'নগর-বাস্তু'র) বিখ্যাত বিষ্ণু-মন্দির—এই মন্দির খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্য-ভাগে গঠিত কম্বুজ-রাজ্যের এক বিরাট্ কীর্তি—ইহার প্রস্তরময ভিত্তি-গাত্রে রামায়ণের চিত্র উৎকীর্ণ আছে। কম্বুজ-দেশের ভাষায় (Khmer খ্মের ভাষায়) প্রচলিত রামায়ণের কোনও ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ দেখি নাই। কিন্তু

শিল্পে রামায়ণ-কথার এই বিরাট্ প্রকাশ হইতে এইরূপ অনুবাদেরও অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চম্পার Cham চাম-জাতির লোকেরা এখন জাতি-হিসাবে ধ্বংসের পথে—তবে তাহারা এখনও বিকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম পালন করে। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে প্রাচীন কালের স্মৃতি ও প্রাচীন ধর্মের কথা এখন প্রায় অবলুপ্ত হইতে চলিযাছে। শ্যামের অধিবাসী Dai দৈ বা Thai থাই-জাতির মধ্যে রামাযণ-কথা সমধিক প্রচলিত; রামায়ণের পাত্র-পাত্রীব নামের ও কৃতির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাঙ্কক-নগরী শ্যামের রাজধানী, সেখানে শ্যামের জাতীয় সংগ্রহশালার প্রবেশ-চত্বর-গৃহে ব্রঞ্জ-নির্মিত মানবাকার ধনুর্ধারী রামচন্দ্রের সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্যামের দৈ-জাতির প্রথম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইন্দ্রাদিত্য রাজার পুত্র রাজা রাম গম্‌হেং (খম্‌হেং) ত্রয়োদশ শতকে দৈ বা থাই-জাতিকে কম্বুজ-রাজের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার নাম হইতে তখনকার দিনেও থাই-জাতির মধ্যে রাম-কথার প্রভাব সূচিত হয়। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে নূতন এক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজা রামাধিপতি নূতন 'অযোধ্যা' (Ayuthia আইযুথিযা) নগরী স্থাপন করিয়া সেখানেই নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্যামদেশের এখনকার রাজ-বংশের নাম 'মহাচক্রী' বংশ, এই বংশের প্রত্যেক রাজা 'রাম' নামে অভিহিত। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ-বংশের পত্তন হয়; প্রথম রাজার নাম ছিল 'রাম ফা বুদ্ধ য়োদ্ ফা চুড়ালোক', অথবা প্রথম রাম (১৭৮২-১৮০৯ পর্য্যন্ত ইঁহার রাজত্ব-কাল); তৎপরে 'ফ্রা বুদ্ধ লোএস্ লা নাভালৈ', দ্বিতীয় রাম (১৮০৯-১৮২৯); 'ফ্রা নাঙ ক্লাও', তৃতীয় রাম (১৮২৯-১৮৫১), 'ফ্রা চোম ক্লাও মহা-মংকুৎ' চতুর্থ রাম (১৮৫১-১৮৬৮); 'চুডালংকার', পঞ্চম রাম (১৮৬৮-১৯১০); 'বজ্রাযুধ', ষষ্ঠ রাম (১৯১০-১৯২৫); 'প্রজাধিপক', সপ্তম রাম; এখন 'অতুল্য-তেজাঃ' (শ্যামী উচ্চারণে 'অদুল্‌দেৎ'), নবম রাম, রাজত্ব করিতেছেন। শ্যামদেশে ১৭০ বৎসর ধরিয়া—সাত পুরুষ জুড়িয়া—সত্যকার 'রাম-রাজ্য' চলিয়া আসিয়াছে।

শ্যাম-ভাষায় যে জনপ্রিয় রামায়ণ প্রচলিত, যাহা সকলেই পাঠ করে এবং যে রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া জীবন্ত নটনটী ও নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা অভিনয় তথা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়, এবং চিত্রের সাহায্যে Hnang 'হ্নঙ্' বা ছায়া-নাট্য দেখানো হয়, সে রামায়ণ "রামায়ণ" নামে অভিহিত নহে, এবং তাহা বাল্মীকির রামায়ণের আধারেও রচিত নহে। সেই রাম-কথা 'রাম-কীর্তি'

নামে অভিহিত হয় (যেমন তুলসীদাসের কোসলী হিন্দীতে রচিত রামায়ণের নাম 'রামচরিত-মানস')। 'রাম-কীর্তি' শব্দটি শ্যামীদের উচ্চারণে প্রথমে Rama-Kir 'রাম-কীর্' রূপ গ্রহণ করে; শ্যামীরা অন্ত্য র-কারকে ন-রূপে উচ্চারণ করে বলিয়া, 'রাম-কীর্তি' শব্দ এখন শ্যামী ভাষায় Rama-Kien 'রাম-কিয়েন্' রূপে পরিচিত।

কিছুকাল হইল, শ্যামদেশের রাজধানী বাঙ্কক নগরের "থাই-ভারত সংস্কৃতি মন্দির" (Thai-Bharat Cultural Lodge) শ্যামী 'রাম-কিয়েন্'-এর এক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯); অনুবাদ করিয়াছেন ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বর্গীয় সত্যানন্দ পুরী এবং শ্যামী লেখক চারোএন সারাহিরান্ Charoen Sarahiran। স্বামী সত্যানন্দ পুরী বাঙ্গালা দেশ হইতে ১৯৩৫ সালের দিকে শ্যামদেশে ভারত-ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও প্রচার করিতে যান; তিনি সেখানে শ্যামী ভাষা খুব ভালো করিয়া শিখিয়া লন, শ্যামী ভাষায় দার্শনিক বিষয়ে একজন নামী লেখক বলিয়া শ্যামী সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, শ্যামীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া বেদান্ত-প্রচারের কার্য্যে আত্মনিয়োজিত হন; কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানীরা নাকি তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। 'রাম-কিয়েন্'-এর অন্যতম আধার একখানি প্রাচীন শ্যামী গ্রন্থ 'নারায়ণ-সিপ্পাং'—ইহাতে নারায়ণের দশ-অবতারের কাহিনী আছে। অবতারগুলির ক্রম ও কার্য্য বিভিন্ন—এই গ্রন্থ-অনুসারে দশ অবতার এই ভাবের ছিল: (১) বরাহ; (২) কূর্ম; (৩) মৎস্য; (৪) মহিষ—মহিষাসুর-বধ নারায়ণের এই মহিষ-অবতার কর্তৃকই সংঘটিত হয়; (৫) মুনি—ত্রিপুরাসুরের রাজধানী হইতে শিবলিঙ্গ উদ্ধার করেন; (৬) সিংহ (অর্থাৎ নরসিংহ)—হিরণ্যকাসুরকে বধ করেন; (৭) কুব্জ—বামনের পরিবর্তে, দানব তাবন্‌কে পরাভূত করেন; (৮) কৃষ্ণ; (৯) অপ্সরা—নারায়ণ অপ্সরা-মূর্তি ধারণ করিয়া নন্দকাসুরকে মোহিত করিয়া পরে তাহার বধ-সাধন করেন (এই নন্দকাসুর-ই পরে 'দশকণ্ঠ রাবণ' রূপে অবতীর্ণ হয়); এবং (১০) রাম। 'নারায়ণ-সিপ্পাং' গ্রন্থে বিষ্ণু-ই প্রধান দেবতা, কিন্তু 'রাম-কিয়েন্'-এ ঈশ্বর বা শিব হইতেছেন প্রধান।

'রাম-কিয়েন'-এর রাম-কথা নানা বিষয়ে স্বতন্ত্র—রামায়ণের মূল উপাখ্যানটি ঠিক থাকিলেও, ছোট ও বড়ো ঘটনাগুলির বিস্তর হেরফের আছে,

ভারতীয় রাম-কথায় অজ্ঞাত নানা কথা আছে, সুপরিচিত নামগুলিও বহুস্থলে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর নাম 'রাম-কিয়েন্'-এ "কৌসুরিয়া, সমুদ্রজা, কৈয়কেশী" হইয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠের নাম ঠিক আছে, কিন্তু বিশ্বামিত্র হইয়া গিয়াছেন "স্বমিত্র"। মন্দোদরীর শ্যামী নাম "মণ্ডো", তিনি পূর্বজন্মে এক মণ্ডুকী বা বেঙ ছিলেন। রামের গাত্রবর্ণ হরিৎ, ভরতের (শ্যামীতে "বরত") রক্ত, লক্ষ্মণেব ("লক্ষণ") পীত এবং "শত্রুদ্" বা শত্রুঘ্নের গাত্র-বর্ণ ছিল রক্তনীল। শ্যামী রামায়ণের উপাখ্যান-বৈচিত্র্য এবং পাত্র-পাত্রীদেব নামের পার্থক্য, কতটকু ভারতে প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণের বহির্ভূত অন্য রাম-কথা বা পুরাণ-কথা হইতে প্রাপ্ত ও কতটুকু শ্যাম-দেশের প্রাচীন থাই-জাতিব পুরাণ-কথার প্রভাবে সৃষ্ট, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। শ্যামী রাম-কথা লইযা আর আলোচনা করিব না—তাহার পূর্ণ পরিচয় এক্ষেত্রে অনাবশ্যক ; কৌতূহলী পাঠকদের জন্য স্বামী সত্যানন্দ পুরীর অনুবাদ আছে। ভারতের ও শ্যামের (তথা যবদ্বীপের রাম-কথা অবলম্বন করিয়া একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে।

ইন্দোনেসিয়ায় (যবদ্বীপে ও অন্যত্র) রামাযণের ইতিহাস অতি বিচিত্র। যবদ্বীপের রামায়ণ লইয়া, 'কবি' বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় ও ডচ্ ভাষায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকার এম-এ (অধুনা খড়্গপুর কলেজের অধ্যক্ষ) Indian Influences on the Literature of Java and Bali (Greater India Society কলিকাতা হইতে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত) নামক তাঁহার গবেষণাত্মক ইংরেজী পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন (অধ্যায় ৭, ৮, ৯, ১০, পৃঃ ১৭০-২৩১)। প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ ডচ্ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত Hendrik Kern হেন্ড্রিক্ কেরন্ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়া দেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডচ্ পণ্ডিত W. F. Stutterheim ষ্টুটর্‌হাইম জর্‌মান ভাষায় ম্যুনিক্ শহর হইতে Rama-legenden und Rama-reliefs in Indonesien অর্থাৎ 'ইন্দো-নেসিয়ায় রাম-কাহিনী ও রাম-কথার প্রস্তর-চিত্র' বিষয়ে বৃহৎ সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে তিন খণ্ডে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডচ্ সরকার কর্তৃক পরিচালিত জনশিক্ষা-পরিষদ্ (Voolks-lektuur)-এর প্রকাশন-মন্দির, Weltevreden Batavia (অধুনা Djakarta জকর্তা)-নগরের Balai Poestaka "বালাই-পুস্তাকা" অর্থাৎ "গ্রন্থ-গৃহ" নামক প্রতিষ্ঠান হইতে Serat Rama 'রাম-কথা'

পুস্তক রোমান লিপিতে ও যবদ্বীপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে Tjandi Prambanan চাণ্ডি (চাণ্ডি) প্রাম্বানান্-এ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের বিরাট্ মন্দিরত্রয়ের মধ্যে, মধ্যস্থলে অবস্থিত শিবের মন্দিরের প্রস্তরময় ভিত্তি-গাত্রে খোদিত অদ্ভুত-সুন্দর রামায়ণ-চিত্রাবলীর প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে—এইরূপ সুন্দর রামায়ণ-চিত্র ভারতবর্ষেও কোথাও নাই; উপরন্তু, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে Tjardi Panataran চাণ্ডি পানাতারান্ মন্দির-গাত্রের সম্পূর্ণ অন্য রীতিতে খোদিত চিত্রগুলিও প্রকাশিত হইয়াছে। যবদ্বীপে প্রচলিত রামায়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে, এই পুস্তকে ভারতে ও মালয়-দেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন রামায়ণের বিচার আছে। বাল্মীকি-মতে মূল রাম-কথা প্রদত্ত হইয়াছে, ও যবদ্বীপের এক অতিপ্রসিদ্ধ কাব্যময় রাম-কথাও মুদ্রিত হইয়াছে।

যবদ্বীপ ও ইন্দোনেসিয়ার রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। শ্যাম-দেশের মত অত পরিবর্তন ইহাতে হয় নাই। রাম ও সীতা যবদ্বীপে আদি স্রষ্টা, মানব-জাতির পিতা ও মাতা রূপেও কল্পিত হন ("র-মো, সী-ত্যো" রূপে নাম দুইটি উচ্চারিত হয়)। এ বিষয়ে পূর্ণ বিচারের এখন আবশ্যকতা নাই। বহু পূর্বে এ বিষয়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ও Rupam 'রূপম্' পত্রিকায় কিছু লিখিয়াছিলাম। 'প্রবাসী'-তে চাণ্ডি প্রাম্বানান্-এর খোদিত রামায়ণ-চিত্র প্রকাশিতও হইয়াছিল। এখানে কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীতা-হরণের পরে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধানে কিষ্কিন্ধ্যার নিকটে অরণ্যে ঘুরিতেছেন, এমন সময়ে রাম তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ বাঁশের চোঙ্গা করিয়া জল আনিলেন, নিকটে প্রবহমান একটি স্রোতস্বিনী হইতে। রাম সেই জল আস্বাদ করিয়া দেখিলেন, তাহা লবণাক্ত। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ কারণ অনুসন্ধান করিতে নির্গত হইলেন—তিনি নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে উজাইয়া হাঁটিয়া চলিলেন, কোথায় সেই ক্ষুদ্র নদীটির উৎপত্তি তাহা দেখিবার জন্য। দেখিলেন, নদীটি আর কিছু-ই নহে, সুগ্রীব এক গাছের উপরে বসিয়া নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু হইতে নির্গত অবিরল অশ্রুধারা নদী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এইভাবে লক্ষ্মণ-সুগ্রীবের ও পরে রাম-সুগ্রীবের মিলন ঘটিল। প্রাম্বানান্-এর মন্দিরের রামকথা-চিত্রে দেখা যায়, লক্ষ্মণ জলপাত্রের জন্য মোটা বাঁশের চোঙ্গা

লইয়া বৃক্ষে উপবিষ্ট রোরুদ্যমান সুগ্রীবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। যবদ্বীপে রামায়ণ-কথা লইয়া Wayang Koelit "ওআইয়াং-কুলিৎ" অর্থাৎ ছায়া-নাট্যও হইয়া থাকে, নৃত্য-নাট্যও হয়। এই-সব নাট্য-অনুষ্ঠানেও রাম-কথার বিষয়-বস্তুতে কিছু কিছু অভিনবত্ব থাকে। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণের সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে যবদ্বীপের এক সামন্ত-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর গৃহে আমাদের এই প্রকার নৃত্য-নাট্য দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। এবিষয়ে আমার 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে (কলিকাতায় ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ৩৫০-৩৫১) আমি লিখিয়াছি। শূর্পণখার একসঙ্গে আট আটটি রাক্ষস স্বামীর কল্পনা (প্রত্যেকেরই মুখ মহিষ এবং শূকরের মুখের ভাব মিলাইয়া প্রস্তুত মুখসের দ্বারা আবৃত—এই মহিষশৃঙ্গ শকরমুখ আটটি রাক্ষস যেন বর্বরতা ও মূর্খতার প্রতীক)—শূর্পণখার বিরহে আটজন স্বামীর নাচ-গানের মাধ্যমে চিত্তের অধৈর্য্য প্রকাশ, এবং দণ্ডকারণ্য হইতে শূর্পণখার প্রত্যাবর্তনে যুগপৎ আট স্বামীর সোল্লাস নৃত্য—অদ্ভুত ও বীভৎস-মিশ্র হাস্যরসের এক অনপেক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা এইভাবে পল্লবিত রাম-কথা যবদ্বীপে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, পরন্তু মূল আখ্যানের মর্য্যাদা ইহাতে মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রামায়ণ-কথা এইভাবে নানাজাতির চিত্তকে রসসিক্ত করিয়াছে। বিশ্বমানবের সাহিত্য-রস-পিপাসু মনের জন্য রাম-কথা এক অক্ষয় রসভাণ্ডার-রূপে বিরাজমান। বিরাট্ সাহিত্য-সর্জনার গুণ-ই এই—ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের মনকে নানাভাবে আকুল করিতে পারে। আমাদের দেশে রামায়ণের সাহিত্য-রস তো আছেই; সেই সাহিত্য-রস, সাহিত্য-রসিকজনের চিত্তকে কী কারণে এবং কী ভাবে আবিষ্ট করিয়া থাকে, আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকগণ তাহার বিচার করিয়াছেন। রামায়ণে romance অর্থাৎ রমন্যাস বা রোচিষ্ণুতা আছে, এই রোমান্স সকলের চিত্তকে আকুল করিবেই। ইহাতে বাস্তবানুসারিতাও আছে, বিশেষতঃ চরিত্র-চিত্রণে—সেই বাস্তবানুসারিতার সত্যদৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে। উপাখ্যানের অলৌকিক অংশ বর্জন করিয়াও, তাহার যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সন্দেহ দেখা দেয়, এই সত্যদৃষ্টি-ই তাহার নিরসন করে।

কিন্তু ইহার মধ্যে যে পারিবারিক জীবনের আদর্শ আছে, তাহার আর তুলনা হয় না। রামায়ণের প্রথম প্রচারের সময় হইতেই ইহার অমৃত-প্রবাহ ভারতীয় পারিবারিক জীবনকে পবিত্র ও পুণ্যময় করিয়া রাখিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম, সৌভ্রাত্র, প্রভুভক্তি, আশ্রিত-রক্ষা প্রভৃতি যে-সমস্ত 'গুণে সমাজের মানুষের মধ্যে শান্তি ও সুখ সহজলভ্য হয়, যে-সমস্ত গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হইতে পারে, নিখিল-চিত্ত-মথনকারী মনোহর উপাখ্যানের মাধ্যমে, উপাখ্যানের পটভূমিকা নগর ও অরণ্য উভয়ের পারিপার্শ্বিকে, অদ্ভুত সুন্দর ভাবে সকলকে প্রীত বিস্মিত করিবার সে-সমস্ত গুণ ও আদর্শ রামায়ণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। রামায়ণের সামাজিক আদর্শ ও বিশেষ করিয়া পারিবারিক আদর্শ-ই হইতেছে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের আদর্শ। সত্য বটে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী সব যুগে ও সর্বত্র এক-ই প্রকার থাকে না বা হয় না। রাম-চরিত্র একদিকে মহীয়ান্, তাহার মহত্ত্বের তুলনা হয় না। অন্যদিকে, রামের কতক-গুলি আচরণে বা কার্য্যে আধুনিক যুগের মানুষ সহমত হইতে পারিবে না; যেমন বালি-বধ, সীতার বনবাস ও শম্বুক-বধ। কিন্তু তাহা হইলেও, রামায়ণের সহজ সরল পারিবারিক আদর্শকে আমরা কোনও কালে কোনও সমাজে উপেক্ষা করিতে পারি না। রামের চরিত্রের গৌরব, লক্ষ্মণের ও ভরতের কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃভক্তি, সীতার চরিত্রের বিপুল মাধুর্য্য ও মহিমা, ঊর্মিলার আত্মবিলোপ, হনুমানের ভক্তি ও কর্তব্য-পরায়ণতা—এ-সমস্তই আমাদের হৃদয়ের বস্তু। ইঁহাদের চরিত্র বাল্মীকির মহাকাব্যে অতিমানব মহাপুরুষ, বীর এবং বীরাঙ্গনার চরিত্র—মানবিকতার আধারে দণ্ডায়মান থাকিয়াও, এই মহাগ্রন্থে তাঁহারা সকলেই দেবত্বের পদে অধিরূঢ় রহিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের চরিত্রের মানবিক গুণের জন্যই তাঁহারা আমাদের কাছে এত প্রিয়, এত আপনার হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষের ও বহির্ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণ ইঁহাদিগকে সেই সেই অঞ্চলের জীবনের অন্তঃস্থলে টানিয়া লইয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের সীতা ক্ষত্রিয়াণী, বীরাঙ্গনা; বাঙ্গালায় আসিয়া তিনি কৃত্তিবাস-প্রমুখ বাঙ্গালী কবির অঙ্কিত চরিত্রালেখ্যে বাঙ্গালার গৃহস্থ ঘরের বধূ হইয়া গিয়াছেন। আবার রাজস্থানে তিনি মধ্যযুগের রাজপুতানী, কেরলে তিনি কেরল-সীমন্তিনী, তুলসীদাস-প্রমুখ কবির কল্যাণে

তিনি উত্তর-ভারতের লজ্জাশীলা অথচ তেজোদৃপ্তা কুলবধূ। সীতা মহীয়সী বীরাঙ্গনা, কিন্তু আমরা "জনম-দুখিনী" বাঙ্গালী ঘরের লাজুক বধূ সীতাকেই জানি, তাঁহার পুণ্য চরিত্র আকুল চিত্তে পূজা করি—এবং এই জনম-দুখিনী অথচ স্বামীর প্রেমে গরবিনী এবং স্বামীর আদর্শে ধন্যা ও অনুপ্রাণিতা রাম-ঘরণী সীতাকে, নূতন করিয়া গৌরাঙ্গ-জায়া বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে ও রামকৃষ্ণ-পত্নী সারদা দেবী রূপে পাইয়াও আমরা ধন্য হইয়াছি।

রামায়ণের কথা একাধারে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ধর্মাদর্শ-পূত সুসংস্কৃত জীবনের কথা, এবং মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের ভারতীয় গৃহস্থ-জীবনের শুচিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা। ইহার প্রাচীন স্বরূপ প্রণিধানের জন্য আমাদের সমক্ষে বাল্মীকির মূল রামায়ণ রহিয়াছে। আমাদের জীবনের উপযোগী করিয়া ইহার অনর কাহিনীর নানা ঘরোয়া রূপ আমরা দিয়াছি। আবার প্রাচীন বীরগাথার যুগ, যেখানে বিরাট্ উপাখ্যানের পাত্র-পাত্রী হয় দেবধর্মী মানব, না-হয় মানব-ধর্মী দেবতা, তাহাকে অতিক্রম করিয়া বা তাহাকে প্লাবিত করিয়া আমরা মধ্যযুগের ভক্তির এবং আত্মনিবেদনের ধারা বহাইয়াছি। বাল্মীকির রামায়ণ এক ধরণের বস্তু; কিন্তু তুলসীদাসের রামচরিত-মানসে আছে ভক্তের পুলক, স্বেদকম্প ও অশ্রুবর্ষণ, এবং ভক্তিশাস্ত্রের দার্শনিক বিচার ও জীবনে তাহার প্রতিফলন; তেমনি কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা পাই, সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় যে রামায়ণ-কথা "স্বে মহিম্নি" বিদ্যমান, তাহার উপাখ্যানের সংকলন, ও সঙ্গে সঙ্গে ধরাধামে অবতীর্ণ দেবতা রামচন্দ্রের ললিত-কোমল স্নেহ-প্রবণ ভক্ত-বৎসল দেবপ্রকৃতির প্রকাশন। নানা দিক্ হইতে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষার দ্বারা প্রচারিত এই রামায়ণ-কথার পূর্ণ সার্থকতা পরিস্ফুটিত হইতেছে।

কিন্তু একদিকে রাম-কথার অন্তর্নিহিত জীবনের আদর্শ ও নীতিনিষ্ঠতা, অথবা ইহার দ্বারা সমাজ-সংস্করণ এবং সমাজ-রক্ষা, ও অন্য দিকে রাম-কথার বাহ্য রূপের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অথবা সংস্কৃতির পরিচয়, প্রাচীন ভারতীয় জাতির পরিচয়—এ সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে রামায়ণের ভিতরের কাব্য-প্রাণ, যেটি সোনার-কাঠির মত মানব-মনে কাব্যামৃত-রসাস্বাদের সাহায্যে নূতন অনুভূতি, নবীন চেতনা আনিয়া দেয়; যাহাতে সমগ্র ভাবে, কেবল পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রাণী রূপে নহে, মানবকে

সংযত করে, পবিত্র করে, উন্নত করে, পরিপূর্ণ করে। এই জন্য রামায়ণ, মহাভারত, য়িহুদী পুরাণ, কালিদাসের নাটক ও কাব্য, ঈরানী ইতিহাস-কথা শাহ্‌নামা, গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াদ ও ওদিসি, গ্রীক ট্র্যাজেডি নাট্য-সম্পুট, শেক্‌স্পিয়ারের নাটকাবলী, গ্যেটের রচনাবলী, টল্‌স্টয়ের রচনাবলী, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রভৃতি মহাগ্রন্থের সার্থকতা। ব্যাপক-ভাবে আমাদের জাতির পক্ষে, আমাদের জাতির প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে, ইহা এক বিধি-দত্ত পরম সৌভাগ্য যে, রামায়ণ-মহাভারতের মতো গ্রন্থ আমাদের সভ্যতার আধার-ভূমি ও প্রকাশ-ভূমি হইয়া আছে। মহাকবির এবং সাধকের ভাষায় আমরা আমাদেরও প্রাণের ভাষা পাই; সেইজন্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানব-মনের প্রতি রামায়ণের আবেদন উদ্ধার করিয়া, আমার এই অক্ষম রামায়ণ-প্রশস্তি সমাপ্ত করিতেছি—

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি,
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।

অসহ দুঃখ সহি' নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি'
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস।

কহিল, "বারেক ভাবি দেখো মনে,
সেই একদিন কেটেছে কেমনে,
যেদিন মলিন বাকল-বসনে
চলিলা বনের পথে—

ভাই লক্ষ্মণ, বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন,
নববধূ সীতা আভরণ-হীন
উঠিলা বিদায়-রথে।

রাজপুরী-মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে-সার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে।

অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গল-দীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে।

আর একদিন, ভেবে দেখো মনে
যেদিন শ্রীরাম ল'য়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি,—

'জানকী, জানকী', আর্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা-অরণ্য আঁধার-আননে
রহিল নীরবে চাহি'।

তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবসের—
এত বিষাদের, এত বিরহের
এত সাধনের ধন,

সেই সীতাদেবী রাজসভা-মাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।

সে-সকল দিন সে-ও চ'লে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়—
যায়নি তো এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।

দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযুর কূলে দুলে তৃণ সার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।

শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুব,
মধুব-করুণ তানে ;

সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে,
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবেব কানে।"

[বঙ্গাব্দ ১৩৬৪]

কুরল্‌

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় যতগুলি সাহিত্য আছে, সেগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যের। তাহার পরেই, মৌলিকত্বে, মনোহারিত্বে, প্রসারে, বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে তমিল সাহিত্যের স্থান। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল জুড়িয়া সংস্কৃত সাহিত্য বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়েই উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট। ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির সাহিত্য বহুশঃ সংস্কৃত সাহিত্যেরই আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের ভাষাসাহিত্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এই-সমস্ত নূতন সাহিত্যের উদ্ভব সত্ত্বেও, সংস্কৃত-ভাষায় সাহিত্য-রচনা এখনও লুপ্ত হয় নাই। ইহা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, প্রাচীনতম কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে গ্রথিত, ও ইহার অন্যতম প্রতীক-স্বরূপ বিদ্যমান—ইহা ভারতের প্রধান মৌলিক সাহিত্য। সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু ও চীনা—জগতের এই চারিটি মৌলিক সাহিত্য বিদ্যমান; অন্যগুলি প্রায়শঃ এইগুলিরই অনুকারী।

উত্তর-ভারতে বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, ধীরে-ধীরে সংস্কৃত সাহিত্য পুষ্টি ও প্রসার লাভ করিবার সহস্র বৎসর পরে, দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর তমিল জাতির মধ্যে স্বাধীন-ভাবে সাহিত্য-চেষ্টা দেখা যায়। আদি-যুগের তমিল সাহিত্যে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবর্ধমান প্রভাব প্রথম হইতেই তমিল সাহিত্যের উপরে আসিয়া পড়ায়, তমিল সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী কালে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। প্রথম যুগের তমিল সাহিত্যে যেটুকু সংস্কৃত বা উত্তর-ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে, সেটুকুর দ্বারা ইহার মৌলিকত্ব নষ্ট হইতে পারে নাই; প্রথম যুগের তমিল সাহিত্য সেই প্রভাবটুকুকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, নিজ বৈশিষ্ট্যকেই বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিশুদ্ধ তমিল সংস্কৃতির প্রকাশ-স্বরূপ আদি যুগের তমিল সাহিত্য ভারতবর্ষের সাহিত্য-জগতে অন্যতর মৌলিক বস্তু।

কবি তিরুবল্লুবর্ (তিরু—ৱল্‌ল্‌ুৱর্)-কর্তৃক রচিত কুরল্ (কুৱল্), বা 'মুপ্পাল্' এই প্রথম যুগের তমিল-সাহিত্যের একটি মুখ্য গ্রন্থ। ইহা তমিল ভাষার অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক, এবং উত্তর-ভারতের সংস্কৃতাদি আর্য্য-ভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির সহিত দক্ষিণ-ভারতের বিশুদ্ধ দ্রাবিড় তমিল সংস্কৃতির প্রথম যুগের সার্থক সংমিশ্রণের ফল-স্বরূপ। ইহাতে ভাষায়, ছন্দে, বর্ণন-ভঙ্গীতে এবং কোনও-কোনও বিষয়ের প্রকটনে দ্রাবিড়-বৈশিষ্ট্য সুন্দর-ভাবে রক্ষিত আছে। লোক-প্রিয়তায় ইহা তমিল ভাষার অদ্বিতীয় পুস্তক।

প্রস্তুত গ্রন্থ এই প্রাচীন, উপাদেয় এবং জনপ্রিয় তমিল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ : মূল তমিল ভাষা হইতে অনূদিত না হইলেও, ইহার দ্বারা বঙ্গ-ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। ভারতের একটি গরিষ্ঠ ভাষার অমূল্য রত্ন-স্বরূপ এই পুস্তকের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়, বঙ্গভাষী জনগণের মানসিক সংস্কৃতির প্রসার-কল্পে বিশেষ শ্রমস্বীকার-পূর্বক, বাঙ্গালা-পাঠকগণের সমক্ষে ইহা উপস্থাপিত করিয়াছেন—বঙ্গবাণীর চরণে এই অভিনব সুরভি ও বর্ণোজ্জ্বল পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া বঙ্গভাষা-সরস্বতীর শোভা বর্ধন করিয়াছেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের প্রসার বিষয়ে যত্নবান্ প্রত্যেক বাঙ্গালী এইজন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিবেন।

কুরল্-গ্রন্থ এবং ইহার রচয়িতা, তথা প্রথম যুগের তমিল-সাহিত্যের সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ সম্বন্ধে নলিনী-বাবু তাঁহার ভূমিকায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত ভী. আর্. রামচন্দ্র দীক্ষিতর্-রচিত Studies in Tamil Literature and History (Luzac & Co, London, 1930), স্বর্গীয় পী. টী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর-রচিত History of the Tamils (C. Coomaraswami Naidu & Sons, Madras, 1929), শ্রীযুক্ত এম্. এস্. পূর্ণলিঙ্গম্ পিল্লৈ-প্রণীত A Primer of Tamil Literature (Ananda Press, Madras, 1904 ; পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ Munnirpallam Dt. Tirunelveli, 1929), শ্রীযুক্ত এম্. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর্-প্রণীত Tamil Studies (Guardian Press, Madras, 1914) প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এখানে সে-সমস্ত আলোচনার পুনরবতারণা না করিয়া, মোটামুটি-ভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে ষষ্ঠ শতকের

মধ্যে কোনও সময়ে কুরল্-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তিরুবল্লুবর্-এর জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে পারে; কিন্তু প্রচলিত কুরল্-গ্রন্থ খুব সম্ভব অত প্রাচীন কালের রচনা নহে—উহার ভাষা পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে।

ইহা অবিসংবাদিত যে তিরুবল্লুবর্ ও তাঁহার সমসাময়িক কতকগুলি কবির গ্রন্থে তমিল ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন রক্ষিত আছে। এই সকল কবিকে তমিলের 'সঙ্গম্' যুগের কবি বলা হয়। সংস্কৃতের 'সংঘ' শব্দ প্রাচীন তমিলে 'চঙ্্কম্'-রূপ ধারণ করে; এখন আধুনিক তমিলে প্রাচীন তমিলের বানান 'চঙ্্কম্' বিদ্যমান, কিন্তু শব্দটির উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে 'শঙ্গম্' বা 'সঙ্গম্'। তমিল ভাষায় এই 'শঙ্গম্' বা 'চঙ্্কম্' অর্থাৎ 'সংঘ' শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'পণ্ডিত ও কবিদের পরিষৎ'। তমিলদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ-কথা অনুসারে, বহু প্রাচীন যুগে তমিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনটি 'সংঘ' বা পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। এই-সব সংঘ সম্বন্ধে পুরাণ-সুলভ বহু অত্যুক্তিময় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। স্বয়ং মহাদেব, কার্ত্তিকেয় এবং অগস্ত্য মুনি—ইঁহারা প্রথম সংঘের কবিদের মধ্যে অন্যতম তিনজন ছিলেন। প্রথম দুইটি সংঘ যথাক্রমে প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর এবং তিন হাজার সাত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কেবল শেষ সংঘটিতেই ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয়; এই সংঘ, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দিকে বিদ্যমান ছিল। তমিল সাহিত্যের প্রাচীনতম কবিরা এই তৃতীয় সংঘেরই সদস্য ছিলেন, কিংবা এই যুগের লোক ছিলেন। ইঁহাদের সমসাময়িক রাজাদের ঐতিহাসিকত্ব, সুতরাং ইঁহাদেরও ঐতিহাসিকত্ব, একরূপ প্রমাণিত। সুতরাং, প্রথম দুই সংঘের কথা বাদ দিলে, মোটামুটি খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম শতক হইতে তমিল সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

দুই হাজার বৎসর ধরিয়া তমিল সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। দুই হাজার বৎসরে উত্তর-ভারতের আর্য্য-ভাষার যেমন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে—প্রাচীন প্রাকৃত যেমন আধুনিক বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে,—তমিল ভাষারও তেমনি বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিশেষভাবে শিক্ষা না করিয়া যেমন বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী,

মহারাষ্ট্রীয় বা পাঞ্জাবীর পক্ষে তাহার মাতৃভাষার প্রাচীন রূপ প্রাকৃতের অর্থগ্রহণ করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য, তেমনি আধুনিক তমিল-ভাষীর পক্ষে বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে সংঘ-যুগের সুপ্রাচীন তমিল কাব্য পাঠ করিয়া বুঝা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। এখনকার প্রচলিত তমিল, প্রাচীন তমিল-ভাষা হইতে অনেকটা পৃথক্ আর একটি ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন তমিলকে তমিল ভাষায় 'চেন্-তমিঝ্'' (আধুনিক উচ্চারণে 'শেন্দমিঝ্'') বলে। 'কুরল্' এই প্রাচীন তমিলে, 'চেন্-তমিঝ্''-এ লিখিত।

তমিল ভাষার ইতিহাসকে মোটামুটি এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

[১] প্রাচীন-তমিল বা 'চেন্-তমিঝ্''—সংঘ-যুগের কবিদের রচনায় ধৃত; দ্বিতীয়-তৃতীয় হইতে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টীয় শতকের শেষ পর্য্যন্ত। ভাষার ও সাহিত্যের গতি ধরিলে, প্রাচীন তমিলে দুইটি স্তর দেখা যায়—(ক) খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক পর্য্যন্ত, ও (খ) নবম-ত্রয়োদশ শতকের তমিল। এই প্রাচীনতম যুগের তমিলের ব্যাকরণ 'তোল্-কাপ্পিয়ম্' (? তৃতীয়-চতুর্থ শতক) এবং অর্বাচীন প্রাচীন তমিলের জন্য 'বীর-চোঝি''য়ম্' (একাদশ শতক)।

[২] মধ্য-তমিল—চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত। 'নন্নূল' (ত্রয়োদশ শতক) এই যুগের তমিলের ব্যাকরণ। মধ্য-যুগের তমিলকে আবার দুই যুগাংশে বিভক্ত করা যায়—(ক) প্রথম মধ্য-তমিল, ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত; এবং (খ) দ্বিতীয় মধ্য-তমিল, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক। (কেরলের মালয়ালম্ ভাষা মধ্য-তমিলের বিকারে পঞ্চদশ শতকে নিজ বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়, এবং তদনন্তর স্বতন্ত্র সাহিত্যিক পথ অনুসরণ করে।)

[৩] নব্য-তমিল—অষ্টাদশ শতক হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত। ১৮০০-১৯০০, এই এক শত বৎসর ধরিয়া নব্য-তমিলের দ্বিতীয় যুগাংশ।

প্রাচীন-তমিলের যুগে তমিল বর্ণমালা দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতের জন্য ব্যবহৃত 'গ্রন্থ' লিপির আধারে গঠিত হয়, এবং তমিল বর্ণ-বিন্যাস-রীতি ঐ

সময়ে স্থিরীকৃত হইয়া যায়। এই বানানের রীতি এখনও পর্য্যন্ত তমিলে চলিতেছে। তখনকার যুগের তমিল উচ্চারণ বদলাইয়াছে, কিন্তু বানান আছে সেই দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার তমিল উচ্চারণকে অবলম্বন করিয়া।

সংস্কৃত বা প্রাকৃতের তুলনায়, ধ্বনি-বিষয়ে প্রাচীন তমিল নিতান্ত অসম্পূর্ণ বা দরিদ্র ছিল।* সেই হেতু প্রাচীন তমিলের জন্য গঠিত তমিল বর্ণমালাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। নিম্নে এই বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ দেওয়া যাইতেছে—

[১] স্বরবর্ণ—'অ, আ; ই, ঈ; হ্রস্ব এ, দীর্ঘ এে; হ্রস্ব ও, দীর্ঘ ওো; ঐ, ঔ'।

[২] ব্যঞ্জনবর্ণ—'ক, ঙ; চ, ঞ; ট, ণ; ত, ন; প, ম; য়, র, ল, ব (=ৱ); ঝ", ळ, ঢ়, ন; ঃ।

হ্রস্ব 'এ' এবং 'ও' বাঙ্গালা অক্ষরে কেবল 'এ, ও,' দ্বারা লিখিত হইতে পারে; এবং দীর্ঘ 'এ' ও দীর্ঘ 'ও', এই দুই বর্ণ দুইবার লিখিয়া বাঙ্গালায় প্রকাশিত করা যাইতে পারে; যেমন হ্রস্বধ্বনি—'পেরিয়, পোয্, তেন্'; দীর্ঘধ্বনি—'তেেচম্' (=দেশ), 'অরোোক্কিয়ম্' (=আরোগ্য); 'তেেণ্'।

প্রাচীন- ও মধ্য-তমিলে পঞ্চবর্গের স্পর্শধ্বনি কয়টির মধ্যে মাত্র প্রথমটি ছিল—অঘোষ অল্পপ্রাণ 'ক, চ, ট, ত, প' মাত্র; প্রাচীন-তমিলেরও পূর্বাবস্থায, বর্গের তৃতীয় ধ্বনিগুলিও ছিল (ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ 'গ, জ, ড, দ, ব')। কিন্তু অনুমান হয়, প্রাচীন-তমিলের যুগে, খ্রীষ্টীয প্রথম হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যে, ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলি সর্বত্র অঘোষ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আদি-দ্রাবিড ভাষায় মহাপ্রাণ-ধ্বনি (খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ,) ছিল কিনা, তাহা জানা যায় না; থাকিলেও, সেগুলি প্রাচীনতমিলের পূর্বাবস্থাতেই অল্পপ্রাণ হইয়া যায়, এবং পরে এই অল্পপ্রাণ সঘোষ হইতে অঘোষ পর্য্যায়ে নীত হয়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—আদি-দ্রাবিড রূপ 'দ্রমিঝ্"' ('ঝ"'-ধ্বনি সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে); উহা হইতে সংস্কৃত 'দ্রমিড, দ্রমিळ', দ্রবিড'; আদি-দ্রাবিড '*দ্রমিঝ্"' হইতে, প্রাচীন তমিলের প্রথম অবস্থায় '*দমিঝ্"', সিংহলীতে ও পালিতে 'দমিळ', এবং গ্রীকে *Damir

*সংস্কৃত এবং প্রাচীন-তমিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার তুলনা-মূলক ধ্বনি-বিচার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এস্. অনবরত-বিনায়কম পিল্লৈ-রচিত বিশেষ উপযোগী পুস্তক The Sanskrit Element in the Vocabularies of the Dravidian Languages (University of Madras Dravidic Studies III, 1919) দ্রষ্টব্য।

(*Damirikė = '*দমিঝ্"কম্', অর্থাৎ 'তমিলদেশ') রূপগুলি গৃহীত হয় ; এবং '*দমিঝ্"' পরিবর্তিত হইয়া, প্রাচীন বা 'সংঘম্'-যুগের তমিলে 'তমিঝ্" '-রূপ ধারণ করে—Tamizh বা Tamil, যাহা আমরা বাঙ্গালায় 'তমিল' (বা 'তামিল')-রূপে লিখিয়া থাকি। আদি-দ্রাবিড় '*ঘুত্র্', '*ঘোতর ;' ইহা হইতে, সংস্কৃত 'ঘোট, ঘোটক', প্রাকৃত 'ঘোড, ঘোডঅ', আধুনিক আর্য্য-ভাষা-গুলিতে 'ঘোড়, ঘোড়া' ; '*ঘুত্র্' হইতে '*গুত্র্', '*গুতির', পরে প্রাচীন-তমিলে 'কুতিরৈ', কানাড়ী ভাষায় 'কুদুরে', তেলুগুতে 'গুর্‌র' ('*গুদ্‌র' হইতে)। এইরূপে আদি-দ্রাবিড়ের ঘোষবদ্ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি, প্রাচীন-তমিলে সর্বত্র অঘোষ অল্পপ্রাণে পর্য্যবসিত হয়। আর্য্যভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে শব্দ প্রাচীন তমিলে আসিলে, সেই সব শব্দের অন্তর্গত ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিরও সেই অবস্থা ঘটিত ; যথা—সংস্কৃত 'মুখ, উদ্বেগ, গণেশ, রাজা, কথা, নাথ, গদা, রাধা, দৃষ্টান্ত, স্বয়ম্ভূ' = প্রাচীন-তমিল 'মুকম্, উত্তুরেকম্ কণেচন্, অরচন্, কতৈ, নাতন্, কতৈ, ইরাতৈ, তিরুট্টান্তম্, চযম্পূ', ইত্যাদি। †

সংস্কৃতে 'শ, ষ, স'-এর অনুরূপ ধ্বনি প্রাচীন তমিলে ছিল না ; দক্ষিণ ভারতের তাবৎ দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় হইতে খ্রীষ্টের পরের তৃতীয় শতকের মধ্যে, সর্বত্র, কি শুদ্ধ দ্রাবিড় শব্দে, কি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে, Sibilant বা উষ্ম ধ্বনি বিলুপ্ত হয়। পরে নূতন করিয়া গৃহীত সংস্কৃত শব্দসমূহে, এই উষ্ম ধ্বনিগুলি 'চ, ত, য, ট' প্রভৃতির দ্বারা প্রাচীন-তমিলে নির্দেশিত হইত। প্রাচীন-তমিলে 'হ'-এর ধ্বনি ছিল না। পরবর্তী কালে, মধ্য-তমিলের যুগে, তমিল ভাষায় ঘোষবৎ 'গ, জ, ড, দ, ব'-এর ধ্বনি, শব্দের অভ্যন্তরে (আদিতে নহে), একক অবস্থিত 'ক, চ, ট, ত, প'-এর বিকারে উদ্ভূত হয় ; এবং বর্তমানে কালের কথিত নব্য-তমিলে আবার এই নব-সৃষ্ট, শব্দাভ্যন্তরস্থিত 'গ, দ, ব'-এর spirant বা উষ্ম উচ্চারণও আসিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ 'গ'-স্থানে আরবী-ফারসীর 'ঘয়ন্' অক্ষরের ধ্বনি, বা ক্বচিৎ 'হ'-এর ধ্বনি ; 'দ-'স্থানে ইংরেজী this, then, that-এর th-এর ধ্বনি ; এবং 'ব'-স্থানে ওষ্ঠ্য v-এর ধ্বনি)। এই

† এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য আমার প্রবন্ধ Old Tamil, Ancient Tamil and Primitive Dravidian (মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত Tamil Culture পত্রিকায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত, Volume V. no. 2, April 1956)।

সমস্ত কারণে, প্রাচীন-তমিল অনুযায়ী তমিল বানানে, এবং আধুনিক-তমিল উচ্চারণে,এক বিরাট্ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। তমিলে তাই 'গণপতিকে' লেখে 'কণপতি', এখন উচ্চারণ করে 'ক-ণ-ব-দি' বা ka-ṇa-va-thi (this, that-এর উষ্ম 'দ')। ইংরেজী-শিক্ষিত তমিলগণ সেইজন্য অনেক সময়ে th-দ্বারা 'ত' ও উষ্ম 'দ' এই উভয়বিধ ধ্বনি প্রকাশ করেন : Thamotharan = 'তামোদরন্ = দামোদর'। আধুনিক-তমিলে 'চ'-এর উচ্চারণ 'শ' বা 'স'-রূপেও শোনা যায়। সংঘ-যুগের প্রাচীন-তমিল নাম বা শব্দ, রোমান বা ভারতের অন্য প্রদেশের লিপিতে লিখিতে গেলে, আজকাল পণ্ডিতগণ মূল তমিল বর্ণ-বিন্যাসের অক্ষরান্তরীকরণ মাত্র করিতে অনুমোদন করেন—আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া লিখিবার প্রয়াস, প্রাচীন-তমিলের পক্ষে ঠিক হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নলিনী-বাবুর ভূমিকাতে প্রদত্ত কতকগুলি নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে; এইগুলির নিয়ম-সিদ্ধ বর্ণান্তরীকরণ এইরূপ হইবে: 'ময়িলাপুর্' ('মলয়াপুর' নহে, পৃঃ ২), 'এরেলেল-চিঙ্কন্' (পৃঃ ৩), 'উক্কিরপ্-পেরু-বঝু"তি' (পৃঃ ৩, ৪, ৪২), 'চিলপ্পতিকারম্, মণিমেকলৈ' (পৃঃ ৪), 'উরৈয়ুর্, কব্বিরিপ্-পট্টম্, কলিং-তোকৈ, ইনন-নর্পতু, নেট্টু-নল্-বাটৈ, কুরিঞ্চিপ্-পাটটু, তিরু-মুরুকার্রুপ্-পটৈ' (পৃঃ ৪১), ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচীন-তমিলের উচ্চারণ অনুসারে গঠিত তমিল বানানকে, আধুনিক-তমিলের রকমারি উচ্চারণ ধরিয়া, রোমান লিপিতে এখন তমিল লেখকেরাই বিভিন্ন-রূপে লিখেন; সেইজন্য তমিল ভাষায় প্রচলিত বর্ণ-ন্যাস-রীতি এবং সঙ্গে-সঙ্গে তমিল ধ্বনিতত্ত্বের খোঁজ না লইয়া, ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় তমিল শব্দের বর্ণান্তরীকরণ করিতে গেলে, অল্প-বিস্তর বিভ্রাট্ অবশ্যম্ভাবী।*

সংস্কৃত-প্রমুখ আর্য্য-ভাষার কতকগুলি ধ্বনি যেমন তমিলে নাই, তমিলের তেমনি কতকগুলি স্বকীয় বিশিষ্ট ধ্বনি আছে। বাঙ্গালায় ইহাদের উপযোগী বর্ণ না থাকায়, আমি নাগরী হইতে তিনটি বর্ণ, ও একটি বাঙ্গালা

* ৪৬-এর পৃষ্ঠায় নলিনীবাবু যে তমিল শ্লোকটি দিয়াছেন, সেটি 'কুরল্'-এর সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদের দশম শ্লোক নহে, সেটি হইতেছে ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদের দশম শ্লোক (অনুবাদ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৭৬)। G. U. Pope-এর সংস্করণের মূলের পাঠ অনুসরণ করিয়া লিখিলে, উহার যথাযথ বাঙ্গালা বর্ণান্তরীকরণ এইরূপ হইবে—

নামম্ ব্রেকুত্তি ময়ক্কমি রৈমূনরি
নামঙ্ কেটকৃকেটু নোয়্।

বর্ণ, বিশেষ-চিহ্নযুক্ত করিয়া লইয়া, ব্যবহার করিলাম। মূর্ধন্য ল (= বৈদিক ळ—বাঙ্গালা ছাপাখানায় ळ অক্ষর না মিলিলে, 'ল.'-রূপে লেখা চলে) প্রাচীন সংস্কৃতে ছিল, এখনও পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী ও উড়িয়াতে মিলে; জীভ মুখের ভিতরে উল্টাইয়া লইয়া, এই 'ळ' উচ্চারণ করিতে হয়। ৎ ও ন—সাধারণ র ও ন-এর উচ্চারণের সঙ্গে এই দুই দ্রাবিড়-ধ্বনির যে পার্থক্য আছে, আমরা তাহা সহজে ধরিতে পারি না; এই দুই 'ৎ, ন' দন্তমূলীয় ধ্বনি; সাধারণ 'র, ন' যে-স্থানে উচ্চারিত হয়, তাহার ঊর্ধ্বে এই দুইটি উচ্চারিত হয়। এই দুইটিকে (অর্থাৎ 'ৎ, ন'-কে) তালব্য 'র, ন' বলাও চলে। 'ৎ'-এর দ্বিত্ব হইলে, 'ৎ্ৎ' আধুনিক-তমিলে দন্তমূলীয় 'ত্ত(ৎত)'-য়ে—অর্থাৎ আমাদের মূর্ধন্য 'ট্ট' নহে, দন্ত্য 'ত্ত' নহে—ইংরেজীর tt-র ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এখনকার তমিলে 'ন্ৎ'-ও ইংরেজীর ndr-তে রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের কাহারও-কাহারও মতে, এই 'ৎ' প্রাচীন-তমিলে র-জাতীয় ধ্বনি ছিল না, ইহার আদি উচ্চারণ ছিল দন্তমূলীয় 'ত'।

'ঝ″' তমিল ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। বাঙ্গালায় অক্ষরের অভাবে ইহার জন্য 'ঝ″' এই চিহ্নযুক্ত 'ঝ'-বর্ণ ব্যবহার করিলাম; এই ভূমিকায় তমিল শব্দে 'ঝ″'-এর উচ্চারণ, 'ঝ = জ্ + হ্, j-h'-এর মতো হইবে না, zh-এর মতো হইবে,—মাত্র একটি ধ্বনির, ঘোষবৎ মূর্ধন্য 'ষ'-এর, প্রকাশক হইবে; জীভ উল্টাইয়া ঘোষবৎ 'ষ' = sh, অর্থাৎ zh উচ্চারণ করিতে হইবে। তমিলে 'ঝ' = মহাপ্রাণ 'জ্‌হ্' ব্যঞ্জন-ধ্বনি নাই। দন্ত্য 'স' বা 's'-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে z; তালব্য 'শ'-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে ফরাসীর j, ইংরেজী pleasure, leisure শব্দের s-এর ধ্বনি; তেমনি মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষবৎ রূপ হইতেছে এই তমিল ধ্বনি; ইহা কতকটা r (খাঁটি ইংরেজের spirant বা উষ্ম r-এর মত) এবং zh-এর মিশ্রিত ধ্বনির মতো লাগে। ইহা-ই হইতেছে সংস্কৃত মূর্ধন্য 'ষ'-এর ঘোষবৎ রূপ, এবং তমিলের বিশিষ্ট ধ্বনি। ইংরেজীতে l̲ বা l̤, ও ক্বচিৎ বা zh রূপে ইহা লিখিত হয়। *

* ভূমিকা-রূপে প্রথম প্রকাশিত এই প্রবন্ধে, তমিলের এই মূর্ধন্য zh ধ্বনিকে 'ঝ়' রূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। এখন 'ঝ″' ব্যবহার করিতেছি—ইহা মূর্ধন্য zh-এর অনেকটা কাছাকাছি হইবে।

প্রাচীন-তমিলে এক প্রকার বিসর্গ-ধ্বনি ছিল, ইহার উচ্চারণ ছিল 'খ়' (ফারসীর 'খে়' বর্ণের ধ্বনি)।

তমিল অক্ষরের দ্বারা শুদ্ধভাবে সংস্কৃত লেখা সম্ভব নহে; সেই হেতু তমিল দেশে সংস্কৃত লিখনের জন্য আর একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা প্রচলিত আছে—ইহার নাম 'গ্রন্থ-লিপি'। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রসাদে, উত্তর-ভারতের নাগরী লিপি দক্ষিণের গ্রন্থ-লিপিকে অনেকটা অপ্রচলিত করিয়া দিলেও, গ্রন্থ-লিপিতে ছাপা সংস্কৃত পুস্তক তমিল দেশে এখনও পাওয়া যায়, এবং কিছুকাল হইল এই লিপির অল্প-স্বল্প পুনঃ-প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীনকালে তমিল-দেশে সব সংস্কৃত পুঁথি-ই এই লিপিতে লিখিত হইত। আধুনিক-তমিলে সংস্কৃত ও অন্য ভাষার শব্দের ধ্বনি যথাযথ জানাইবার জন্য, প্রচলিত তমিল বর্ণমালায় গ্রন্থ-লিপি হইতে এই কয়টি বর্ণ গৃহীত হইয়াছে—'জ, ষ, স, হ, ক্ষ শ্রী'; শুদ্ধ তমিল রচনায় এই অক্ষরগুলি পাওয়া যায় না।

তমিলের প্রাচীন ও অর্বাচীন উচ্চারণ ও বানান লইয়া এত কথা বলা গেল এই জন্য যে, এই উচ্চারণ-রীতিকে আশ্রয় করিয়া এ ভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের সমক্ষে দেখা দিতেছে। তমিল ভাষা আমাদের আর্য্য-ভাষা—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষা—হইতে যে কতটা পৃথক্, ধ্বনি-বিষয়ে ও শব্দ-বিষয়ে, তাহা উপরের কতকগুলি দুরুচ্চার্য্য ও দুর্বোধ্য নাম হইতেও কতকটা প্রণিধান করা যাইবে। আধুনিক-তমিলে বহু সংস্কৃত শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে; প্রাচীন-তমিলে সংস্কৃত শব্দ তত আসে নাই; শব্দ-বিষয়ে তমিল ভাষা নিজ বিশুদ্ধি বহুল পরিমাণে অটুট রাখিয়াছিল; এবং যে-সব সংস্কৃত শব্দ তমিলে তখন স্থান লাভ করিত, তমিলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বহুশঃ সেগুলির আকার এতটা পরিবর্তিত হইত যে, তাহাদের সংস্কৃতত্ব ধরা পড়া কঠিন ব্যাপার। সংস্কৃত 'শ্রী, সভা, ঋষি, কৃষ্ণ, সহস্র, স্নেহ' প্রভৃতির প্রাচীন তমিল বিকার 'তিরু, অবৈ, ইরুটি, কিরুট্টিণন্, আয়িরম্, নেয়্ বা নেচম্' প্রভৃতির মধ্যে, মূল শব্দ বাহির করা কঠিন।

* * * * *

ভাষায় যেমন প্রাচীন-তমিল নিজস্ব দ্রাবিড় বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রাখিয়াছে, সাহিত্যেও তদ্রূপ বিশুদ্ধ তমিল মনোভাব, তমিল সংস্কৃতি ও

তজ্জাত সাহিত্যিক বাতাবরণ সুরক্ষিত আছে। এই বিশুদ্ধ তমিল সংস্কৃতির আবাস-ভূমি, মৌলিক বা আর্য্য-পূর্ব তমিল জগৎ যে কী প্রকারের ছিল, তাহা সংঘ-যুগের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং প্রাচীনতম তমিল ব্যাকরণ 'তোল্-কাপ্পিয়ম্'-এর তৃতীয় 'অধিকার' বা অধ্যায় আলোচনা করিয়া জানা যায়। 'তোল্-কাপ্পিয়ম্' ব্যাকরণ ১,২৭৬ সূত্রে গ্রথিত। 'এঝু"ত্তিকারম্' নামে ইহার প্রথম অধ্যায়ে, 'এঝু"ত্তু' অর্থাৎ বর্ণ বা উচ্চারণ এবং লিখন আলোচিত হইয়াছে; 'চোল্লতিকারম্' নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, শব্দ- ও ধাতু-রূপ এবং বাক্য-রীতির বিচার আছে। 'পোরুল্লতিকারম্' নামে তৃতীয় অধ্যায়ে, কাব্যে আলোচিত বিষয়-বস্তু, ছন্দ ইত্যাদির বিচার আছে। এই তৃতীয় অধ্যায় হইতে দেখা যায় যে, কাব্যে বর্ণিত বিষয়গুলিকে প্রাচীন তমিল বৈয়াকরণ ও আলংকারিকগণ দুইটি মুখ্য ভাগে ভাগ করিযাছেন—(১) 'অকম্' অর্থাৎ আভ্যন্তর, (২) 'পুরম্' অর্থাৎ বাহ্য। 'অকম্' অর্থে প্রেম, 'পুরম্' অর্থে প্রেম ভিন্ন জীবনের অন্য সমস্ত দিক্, বিশেষতঃ লড়াই। প্রাচীন-তমিল সাহিত্য আলোচনা করিয়া, 'অকম্' ও 'পুরম্'-এর প্রকাশ তমিল-জীবনে কিভাবে হইত, তাহার কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল হইল ইংরেজীতে প্রথম লেখেন স্বর্গীয় ভী. কনকসভৈ পিল্লৈ, তাঁহার Tamils Eighteen Hundred Years Ago-নামক বিখ্যাত পুস্তকে (প্রথম সংস্করণ ১৯০৪; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৬)। তমিল সাহিত্য বিষয়ে পূর্বে তমিল লেখকদের যে কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলিতে; এবং স্বর্গীয় পী. টী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর-রচিত History of the Tamils from the earliest times to 600 A.D. (C. Coomaraswamy & Sons, Madras, 1929) গ্রন্থে তথা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Pre-Aryan Tamil Culture পুস্তকে; 'তোল্-কাপ্পিয়ম্'-এর তৃতীয় অধ্যায় 'পোরুল্লতিকারম্'-এর শ্রীযুক্ত আর্. বাসুদেব শর্মা কর্তৃক প্রস্তুত সটীক ইংরেজী অনুবাদে (Muruga Vilasa Jnanankkula Press, Trichinopoly, 1933), এবং তদ্রূপ অন্নমলৈ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উক্ত 'পোরুল্লতিকারম্' অধ্যায়ের শ্রী পী. এস্. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী কর্তৃক প্রস্তুত সম্পূর্ণ সটীক অনুবাদে (১৯৪৫ সাল), তথা ঈ. এস্. বরদরাজ অয়্যর-কৃত আংশিক সটীক অনুবাদে (১৯৪৮ সাল); —প্রাচীন সংঘ-যুগের ও তৎপূর্বকালের তমিল সভ্যতার এবং

তমিল সাহিত্যে আলোচিত বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যাইবে। 'অকম্' ও 'পুরম্' যেভাবে প্রাচীন তমিল সাহিত্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া 'তোল্কাপ্পিয়ম্'-এর রচয়িতা প্রমুখ তমিল বৈয়াকরণ, আলংকারিক ও কবি, তমিল-সাহিত্যের উপজীব্য এক অভিনব, সংস্কৃত অলংকার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র অলংকার-শাস্ত্র, এবং তমিল বা দ্রমিড় জীবন-যাত্রার আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত এক জীবন-দর্শন রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন তমিল সাহিত্যের 'অকম্' ও 'পুরম্'-এর সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের Subjective and Reflective Poetry ও Objective and Narrative Poetry, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের 'পদ' বা গীতি-কবিতা ও 'মঙ্গল' বা দেবলীলা অথবা মানব-জীবন লইয়া কাব্য, এবং উর্দু সাহিত্যের Bazm 'বজ্‌ম্' অর্থাৎ 'সভা' বা 'গোষ্ঠী' অর্থাৎ নিভৃতে সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে আলোচ্য প্রেম, ব্যঙ্গ বা শান্তভাবের কবিতা ও Razam 'রজ়্‌ম্' অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বাজ-জাবন লইয়া রচিত কাব্য—এই দুই প্রকার শ্রেণী-বিভাগের কথা মনে করাইয়া দেয়।

আভ্যন্তর প্রেম এবং বাহ্য প্রেমেতর বিষয়—'অকম্' ও 'পুরম্'—প্রাচীন যুগের তমিল কবিরা জীবনকে এই দুই বর্গে বা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য চিন্তায়, মানব-জীবনের কর্তব্য বা মানবের অনুষ্ঠেয় বিষয়কে চারিটি ভাগে—চতুর্বর্গে—বিভক্ত করা হইল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চতুর্বর্গ-বিষয়ক ধারণা, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে, দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে, তমিলদের মধ্যেও আসিল। চতুর্বর্গের চারিটি বর্গকে তমিলেরা নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিষয়টি আত্মসাৎ করিয়া লইল; ধর্ম='অরম্'; অর্থ='পোরুळ্'; কাম='ইন্‌পম্'; এবং মোক্ষ='ৱীটু'। তিরু-ৱळ্ळুৱ-এর ভগিনী, কবি ঔৱৈ বা অৱ্ৱৈ, 'নালটি' ছন্দের একটি শ্লোকে এই চারি বর্গের একটি করিয়া সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন: নিম্নে G.U. Pope-এর Hand-book of the Tamil Language হইতে তাহার "চেন্-তমিऴ্" মূলটি এবং Pope-এর ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে তমিল শব্দগুলির নীচে প্রত্যেকটির আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল:—

ঈতল্ অরম্; তীৱিনৈ ৱিট্টু-ঈট্টল্ পোরুळ্;
দান(ই) ধর্ম; পাপকে ছাড়িয়া, সংগ্রহ-করা(ই) অর্থ;

এঞ্ঞ্ঞানুহ্ম্ / কাতল্ ইরুবর্ করুত্তু্র বৈত্ত্-
সদা (সদৈব) প্রীতি দুইজনে মনে রাখিয়া

আতরর্ / পট্টটতে ইন্পম্ ;
আশ্রয় যাহা-অনুভব-করিয়াছে, (তাহাই) কাম ;

পরনৈ নিনৈন্ত্— ইম্-মূন্হ্ম্ /
পরব্রহ্মকে চিন্তা-করিয়া এই-তিনটি

ব্বিট্টটতে পেরূ-ইন্প ব্বীটু ॥
যাহা-পরিত্যাগ-করিয়াছে, (তাহাই) মহা-কাম (বা আনন্দময়) মোক্ষ ॥

এই চতুর্বর্গময় জীবন-ই কবিগণের উপজীব্য। চতুর্বর্গের মধ্যে ত্রিবর্গ— 'ধর্ম' বা জীবনে মানুষের কর্তব্য এবং আদর্শ, 'অর্থ' বা মানুষের পার্থিব লাভালাভ, এবং 'কাম' বা স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ—এই তিনটি, চতুর্থ বর্গ 'মোক্ষ' বা পরমার্থ লাভের পথ। এই তিনটির সাধনায় মানবকে পবিচালিত করিবার জন্য বা মানবকে সহায়তা দিবার জন্য, জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা ধর্মশাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র ও কাম-শাস্ত্র প্রণীত হইযাছে। ব্যবহারিক জীবনের সহিত এই তিনটির সম্বন্ধ ; এবং এই তিনটিকে লইযা যে শাস্ত্র, যে শাস্ত্র বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—সে শাস্ত্র, আধুনিক ভাবের কথায় বলিতে গেলে, বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ জড-বিজ্ঞান-মূলক এবং মানব-বিজ্ঞান-মূলক—'ভৌতিকী' ও 'মানবিকী'কে আশ্রয় করিয়া। মোক্ষ-বিষয়ক শাস্ত্র—'আধ্যাত্মিকী'—হইতেছে দর্শন- এবং অনুভূতি-মূলক ; এখানে বিশেষ বিশেষ প্রকারের দর্শন ও অনুভূতির অবকাশ আছে। ত্রিবর্গাত্মক ব্যাবহারিক জীবন, মানব-সাধারণ ও বস্তুনিষ্ঠ ; ত্রিবর্গের উত্তরাবস্থা মোক্ষ-ধর্মের সাধনা লইয়া, দর্শন ও অনুভূতি লইয়া, মতভেদ থাকিতে পারে। এইজন্য, পরমার্থ লাভ করিয়াছেন এমন দিব্যজ্ঞান-যুক্ত ঋষি ও তত্ত্বজ্ঞ ছাডা, সাধারণ পণ্ডিত বা উপদেশক ত্রিবর্গ লইয়া-ই আলোচনা করিতে বা উপদেশ দিতে পারেন। তিরু-ব্বল্ল্লুবর্ ত্রিবর্গ লইয়া-ই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; 'নাল্-পাল্' অর্থাৎ চতুর্বর্গের পরিবর্তে, তিনি মাত্র 'মুপ্-পাল্' বা ত্রিবর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। 'অরম্', 'পোরুল্ল্' ও 'ইন্পম্' অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের বর্ণনা, বিচার ও

বিশ্লেষণাত্মক শ্লোকাবলী লইয়া-ই তাঁহার 'মুপ্পাল্' অর্থাৎ 'ত্রিবর্গ-কাব্য'; 'কুৰ্‌ৰ্‌ৰ্' নামক দ্বিপংক্তিময় ক্ষুদ্র ছন্দে রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া, এই 'মুপ্পাল্'-কাব্যের অন্যতম নাম 'কুৰ্‌ৰ্‌ৰ্'। 'মুপ্পাল্' ও 'কুৰ্‌ৰ্‌ৰ্ ব্যতীত' এই কাব্যের আরও কতকগুলি নাম আছে, যথা—'উত্তর-বেদ (উত্তিরবেতম্), পোয়্য়-মোঝি", তমিঝ্"-মরৈ, তিরু-ৰব্ব্ৰুৰপ্পয়ন্, তৈৰনূল্,' ইত্যাদি।

নীতি- ও প্রেম-বিষয়ক শ্লোকের সংগ্রহ বলিযা, কুরলের অনেক শ্লোক প্রবাদের মতো লোকের মুখে-মুখে ফিরিত, এবং এখনও এগুলির প্রভাব খুবই বেশী। এই কারণে, তমিলদের মধ্যে কুরল্-সম্বন্ধে এক উচ্চ ধারণা বিদ্যমান। অনেক তমিল লেখক ও সমালোচকের মতে কুরল্ হইতেছে তমিল ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কুরলেব প্রশংসা লইযা একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়া থাকে। নিম্নে প্রদত্ত তমিল শ্লোকটিতে, কুবল্-প্রশস্তি কতদূব পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহা দেখা যায়—

> আরিয়মুম্ চেন্-তমিঝ্'ম্ আবাযিন্ত—
> অতন্ ইনিতু, চীরিয চেপ্‌পরিতু :
> আরিয়ম্ ৱেতম্ উটৈত্‌তু,
> তমিঝ্" তিরুৰব্ব্ৰুৰর্-পা উটৈত্‌তু ॥
> 'আর্য্য-ভাষা (সংস্কৃত) ও তমিল, ইহাদের তুলনা করিলে,
> কোনটি বড়ো তাহা বলা কঠিন;
> আর্য্য-ভাষায় যেমন বেদ আছে,
> তেমনি তমিল-ভাষায আছে তিরুবল্লুবরের পদ ॥'

বেদের মতন বিরাট্ সাহিত্যের সঙ্গে, ধর্ম- অর্থ- ও কাম-বিষয়ক নীতি-কবিতার সংগ্রহ তুলিত করা অবশ্য অত্যন্ত অতিশয়োক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বেদ সমগ্র মানব-জীবনকে লইযা, একটি জাতির জীবনের পরিচায়ক মহাগ্রন্থ; হোমরেব মহাকাব্য-দ্বয়, আমাদের সংস্কৃত মহাভারত, ইহুদি পুরাণ ও শাস্ত্র, শেক্স্পিয়রের গ্রন্থাবলী, গ্যোটের গ্রন্থাবলী, টলস্টয়ের রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী—এইরূপ বিরাট্ সাহিত্য সম্পুট-ই বেদের সম-পর্য্যায়ের। তমিল ভাষায় কুরল্ একখানি শ্রেষ্ঠ বই, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ সাহিত্য-দৃষ্টিতে, মৌলিক এবং জাতির প্রাণের পরিচায়ক, জাতির

আত্মার পরিচায়ক সাহিত্যের কথা চিন্তা করিলে, তমিল সাহিত্যে প্রথম স্থান দিতে হয়, প্রাচীনতম ‘সংঘম্’-যুগের কতকগুলি গ্রন্থকে—যেমন ‘পত্তুপ্পাট্টু’ (বা দশখণ্ড-কাব্য), ‘এট্টুত্তোকৈ’ (অষ্ট-সংগ্রহ), প্রাচীনতম দুই মহাকাব্য ‘চিলপ্পতিকারম্’ ও ‘মণিমেকলৈ’ ; তাহার পরে ধরিতে হয়, ‘পতি-নেণ্-কীঝ্”-কণক্কু’ (অর্থাৎ ‘অষ্টাদশ নীতি-শ্লোক গ্রন্থ’—‘কুরল্’, নালটিয়ার্, ইন্না-নার্প্পতু’ প্রভৃতি আঠারো খানি বই এই শ্রেণীতে পড়ে) ; এবং কুরলের আগেই, সঙ্গে-সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়, ‘নযন্মার্’ অর্থাৎ তমিল শৈব ভক্ত-গণের আধ্যাত্মিক সাধনার কাব্য, কবিতা ও সংগীত (‘তেব্বারম্’—বিশেষ করিয়া মাণিক্ক-বাচকের কবিতাবলী) ও ‘অঝ্”ৱার’ বা বৈষ্ণব ভক্তদের পদের সংগ্রহ (নাল্-আযিরপ্-পিরপন্তম্’—চারি সহস্র প্রবন্ধ-পদের গ্রন্থ)।

কুরল্-ছন্দে রচিত ১৩৩০টি বিচ্ছিন্ন শ্লোকের সংগ্রহাত্মক এই কাব্য। ইহা মণিহার বা পুষ্পমালা—অবিচ্ছিন্ন ধাবাব স্রোতস্বতী নদী নহে। ‘মুপ্পাল্’-এর তিনটি পৃথক্ বিভাগ—‘অরত্তুপ্-পাল্’ বা ধর্ম-বর্গ, ‘পোরুট্-পাল্’ বা অর্থ-বর্গ, এবং ‘কামত্তুপ্-পাল্’ বা ‘কাম-বর্গ। ধর্ম-বিষয়ে ৩৮০টি শ্লোক, অর্থবিষয়ে ৩৮১ হইতে ১০৮০ পর্য্যন্ত ৭০০ শ্লোক, এবং অবশিষ্ট ২৫০টি শ্লোক কাম-বিষয়ে। ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে তমিল কবি যাহা লিখিযাছেন, তাহার মধ্যে সংস্কৃত ধর্ম-নীতি- ও অর্থ-শাস্ত্রের বহু শ্লোকের প্রতিধ্বনি পাওযা যায—মনু-স্মৃতি, কামন্দকীয় নীতিসার, কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্র, রাজনীতি-রত্নাকর, রামাযণ, মহাভারত (বিশেষতঃ গীতা), বৌধাযন ধর্ম-সূত্র, প্রভৃতির উক্তির সঙ্গে কুরলের উক্তির সামঞ্জস্য, স্বর্গত অধ্যাপক রামচন্দ্র দীক্ষিতর্ মহাশয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, ধর্ম-বর্গ ও অর্থ-বর্গেব এবং বিশেষ করিয়া কাম-বর্গের শ্লোকগুলি, পরিমেলঝ”কর্ প্রমুখ টীকাকারগণের মতে, প্রাচীন তমিল পদ্ধতি বা বিচার অনুসারে সজ্জিত। যেমন, ধর্ম-বর্গে দুই খণ্ড—‘ইলম্’ বা গার্হস্থ্য ধর্ম, এবং ‘তুব্বরম্’ বা সন্ন্যাস-ধর্ম ; অর্থ-বর্গে তিন খণ্ড—‘অরচিয়ল্’ বা রাজ-ধর্ম, ‘অঙ্গবিয়ল্’ বা রাজ-কার্য্য, এবং ‘ওঝিপিয়ল্’ বা সামান্য বা সাধারণ কর্তব্য। সংস্কৃতের ধর্ম ও অর্থের পর্য্যায়ের সহিত এগুলির অসংগতি নাই। কাম-বর্গের শ্লোকগুলি বিশুদ্ধ তমিল বিচার-পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত। কাম-বর্গ দুই খণ্ডে বিভক্ত—‘কল্লবিয়ল্’ বা ‘কল্লব্’ অর্থাৎ গুপ্ত প্রেম ও গান্ধর্ব-বিবাহ বিষয়ক, এবং ‘কর্পিয়ল্’

অর্থাৎ প্রকাশ্য বিবাহ বিষয়ক। তমিল প্রেম-বিষয়ক অলংকারের সহিত অনেকে কিন্তু সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ শাস্ত্রের একটা সংগতি দেখিয়া থাকেন।

আমি G. U. Pope-এর, এবং নলিনী-বাবু কর্তৃক অনুসৃত ভী. ভী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর-এর—এই দুইটি অনুবাদ দেখিয়াছি। পোপ ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরি, তথাপি তিনি কুরলের মহত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিরু-বল্লুবর্-এর মতো উচ্চ আদর্শের প্রচারক এবং কবি, শৈব সাধক ভক্ত-কবি মাণিক্ক-বাচকের মতো দিব্যোন্মাদ-যুক্ত ঋষিকল্প ব্যক্তি, খ্রীষ্টান না হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই নরকে যাইবেন—পোপ-সাহেবের ধর্ম-বিশ্বাসে তাহাই বলিত। অথচ এত উচ্চ কোটির আদর্শবান্ কবি বা ভক্ত যদি নরকেই যান, তাহা হইলে সেটা নিজ ধর্মে আস্থাশীল অথচ গুণগ্রাহী পাদরির পক্ষে একটা অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল। তাই পোপ আশা পোষণ করিতেন যে, পরলোকে ঈশ্বরের কৃপায় ইঁহারা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান ধর্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়া, অন্য খ্রীষ্টানদের মতো স্বর্গবাসের অধিকারী হইয়াছেন। পোপের অনুবাদ অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দোময় ইংরেজীতে করা হইয়াছে। ছন্দের খাতিরে পোপকে মূলের কথার কিছু-কিছু সংক্ষেপ বা বিস্তার করিতে হইয়াছে। ভী. ভী. শ্রীনিবাস অয়্যঙ্গর্ পোপের অনুবাদ সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অনুবাদ, পোপের পদ্যানুবাদ অপেক্ষা সহজবোধ্য।

কুরলের অন্য ইংরেজী অনুবাদও আছে। স্বর্গত অধ্যাপক ভী. আর. রামচন্দ্র দীক্ষিতর্ সমগ্র কুরলের মূল তমিল, রোমান লিপিতে রূপান্তরিত করিয়া, এক পৃষ্ঠায় তমিল আর তাহার সামনের পৃষ্ঠায় ইংরেজী অনুবাদ দিয়া প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন (Tirukkural of Tiruvalluvar, in Roman Transliteration, with English Translation: Madras, the Adyar Library, 1949)। তমিল লিপির বাধা এই সংস্করণে দূরীভূত হইয়াছে। আধুনিক তমিলেও কুরলের অনুবাদ বাহির হইয়াছে—প্রাচীন তমিল-ভাষা সকল তমিল-ভাষীর বোধগম্য নহে। জরমান, ফরাসী, চেখ ও রুষ ভাষায়, এবং হিন্দীতেও কুরলের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে।

কুরল্-এর মতো সুবিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মূল ভাষা হইতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শীঘ্র তাহা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন অধ্যাপক নলিনীমোহন সান্ন্যাল মহাশয়ের

অনুবাদ-দ্বারা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকগণের কাজ চলিবে। ভী. কনকসভৈ পিল্লৈ-এর The Tamils Eighteen Hundred Years Age পুস্তক অবলম্বন করিয়া, নলিনী-বাবু প্রাচীন তমিল সভ্যতার যে পরিচয় তাঁহার অনুবাদের পরিশিষ্টে দিয়াছেন, তদ্দ্বারাও মোটামুটি-ভাবে বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে উপকার হইবে। নলিনী-বাবুর অনুবাদটি প্রাঞ্জল ও সুপাঠ্য; এবং স্বজাতির প্রতি ও তিরুবল্লুবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তমিল-ভাষী অনুবাদকের ইংরেজী অনুসরণ করায়, মূলের অনেকটা-ই তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

সৎসাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা দেশে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

[অধ্যাপক ডাক্তার নলিনীমোহন সান্ন্যাল কর্তৃক কুরল্-এর বঙ্গানুবাদের ভূমিকা-রূপে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া, এই নিবন্ধ দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল।]

কোল-জাতির সংস্কৃতি

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, কয়েকটি বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতির নিজ-নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল। ভাবতের অধুনাতন অধিবাসিগণের পূর্ব-পুরুষ ছিল বিভিন্ন প্রকারের মানব, বিভিন্ন যুগে বাহির হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল—ভারতের মধ্যে কোনও প্রকার মানব উদ্ভূত হইবার প্রমাণ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। যে-যে বিভিন্ন জাতির জনগণ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে নবীনতম মতবাদ, ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগের নৃতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের রচিত ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান্ পুস্তক The Racial Elements in the Indian Population (Oxford Pamphlets on Indian Affairs, No. 22) মধ্যে পাওয়া যাইবে। দৈহিক গঠন ধরিয়া আলোচনা করিয়া, আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, ভারতে ছয়টি বিভিন্ন জাতির মানুষ তাহাদের নয়টি শাখায় বিভিন্ন কালে ভারতে আসিয়াছে ; এবং ইহাদের মিশ্রণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই মিশ্রণ-ক্রিয়া কোথাও বা গভীর-ভাবে হইয়াছে, কোথাও বা উপর-উপর হইয়াছে। এই ছয়টি জাতি হইতেছে এই : [১] হ্রস্বকায় কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকপাল উর্ণাকেশ পৃথুনাসিক উচ্চহনু স্থূলাধর Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতি—eolithic অর্থাৎ "উষঃপ্রস্তর" যুগে আফ্রিকা হইতে স্থলপথে আরবদেশ হইয়া ইহাদের ভারতে আগমন ঘটে ; এই জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে ছিল, পরবর্তী জাতিদের আগমনে ইহারা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ভারতে কচিৎ ইহাদের কিঞ্চিৎ অবশেষ-মাত্র পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ইহাদের ভাষা এখন সম্পূর্ণ-ভাবে লুপ্ত। [২] Proto-Australoid "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতি—ইহারা মধ্যমাকার, শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, পৃথুনাসিক, দীর্ঘকপাল জাতি—পশ্চিম-এশিয়া হইতে ইহারা আইসে, এবং সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহাদের প্রসার হয়। ভারতের মধ্যেই এই জাতির মানুষ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করে ; এবং পরে ভারত হইতে, অতি প্রাচীন কালে, ইহাদের একদল দক্ষিণের মহাদ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ায়, গিয়া উপনীত হয়, এবং তদনন্তর অন্য দল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়াতে এবং Indonesia বা দ্বীপময়-ভারতের দ্বীপপুঞ্জে, Melanesia বা কৃষ্ণদ্বীপপুঞ্জে, এবং Polynesia বা পুরুদ্বীপপুঞ্জে প্রসৃত হয়, ও নানা ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ-সমস্ত অঞ্চলের আধুনিক অধি-বাসী-রূপে পরিণত হয়। এই Proto-Australoid বা "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" মানব এখন ভারতের প্রায় সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর জনসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, এবং বহুশঃ ইহারা পরবর্তীকালে আগত নানা জাতির মানুষের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভাষায় ইহারা কী ছিল তাহা জানা যায় না; তবে অনুমান হয়, ইহাদের ভাষা (এই ভাষাকে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ" ভাষা নাম দেওয়া যায়) ভারতখণ্ডে আধুনিক কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীব ভাষায় পরিণত হইয়াছে—যে ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, কোর্কু, কোর্‌বা, শবর, গদব প্রভৃতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এবং আসামে মোন্-খ্মের শ্রেণীর ভাষা খাসিয়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে ইহাদের ভাষা, মোন্-খ্মের, ইন্দোনেসীয় বা মালাই-শ্রেণীয় ভাষা, এবং মেলানেসীয ও পলিনেসীয ভাষা রূপে বিদ্যমান। অন্য জাতির লোকেদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর মিশ্রিত হইলেও, কোল-জাতি মুখ্যতঃ এই "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির বংশধর; এই কোলদিগের সংস্কৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা এই প্রবন্ধে করা যাইতেছে। [৩] "প্রাথমিক দাক্ষিণাকার" জাতির পবে আইসে শ্যাম বা শ্যামাভ-বর্ণ মধ্যমা-কার দীর্ঘকপাল সরলনাসিক Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির মানব। ইহাদের আদি বাসভূমি হইতেছে পূর্ব-ভূমধ্য-সাগরের দেশ—এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া ও পালেস্তীন, মিসর, গ্রীস ও Ægean ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ। দৈহিক সমাবেশে কিঞ্চিৎ পৃথক্ ইহাদের তিনটি শাখা ভারতে আইসে। ইহারাই ভারতে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে; এবং অনুমান হয়, দ্রমিড বা আদি-দ্রাবিড় ভাষা ভারতে ইহাদের দ্বারাই আনীত হয়। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মোহেন্-জো-দড়ো প্রভৃতি স্থানের নাগরিক সভ্যতা, যাহার সূত্রপাত সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০০ বৎসর হইতে, তাহা ইহাদের কীর্তি বলিয়া মনে হয়। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে, হিন্দুধর্মের রূপ-গ্রহণে, এই দ্রাবিড়দের আনীত উপাদান বিশেষ মূল্যবান্। [৪] চতুর্থ জাতির মানব যেটি ভারতে আইসে, সেটি হইতেছে Western Brachycephals অর্থাৎ "পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল" জাতি। ইহাদেরও তিনটি শাখা; অনুমান হয়, ইহারা, এবং [৫] Nordic "উদীচ্য'

নামে বৈজ্ঞানিকগণ-কর্তৃক আখ্যাত একটি জাতির মানবগণ, আর্য্য-ভাষা লইয়া, ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পরে, ঈরান ও আফগানিস্থানের পথ ধরিয়া এশিয়া-মাইনর ও মেসোপোতামিয়া হইতে ভারতে আগমন করে। ভাষা ইহাদের এক ছিল; কিন্তু জাতি-হিসাবে এই "পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল" জাতি ও "উদীচ্য" জাতি ছিল একেবারে পৃথক্; সম্ভবতঃ আর্য্য-ভাষা ছিল দীর্ঘকপাল উদীচ্যদেরই ভাষা, ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া হ্রস্বকপালগণ পরে এই ভাষা গ্রহণ করে। উদীচ্যগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, ঋজুনাসিক, হিরণ্যকেশ ও নীলচক্ষু। বৈদিক সভ্যতার ও ধর্মের এবং বৈদিক সাহিত্যের মূলসূত্র ইহারাই এদেশে আনয়ন করে, এবং পরবর্তী কালে ইহাদের ভাষাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও "ভাষা", এই তিন বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় মিশ্র সভ্যতার প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়ায়। উপরের এই পাঁচ প্রকার মৌলিক জাতির মানুষদের সকলেই পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, পূর্ব ও উত্তর হইতে আসাম ও ব্রহ্ম-সীমান্তের পথে এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া আইসে [৬] Mongoloid বা "মোঙ্গোলাকার" জাতির মানুষ। এই শ্রেণীর মানুষ কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতে ও দক্ষিণ হিমবন্ত প্রদেশেই মিলে, ঐ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে এই উপাদান বেশী করিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু উত্তর-ভারতের সমতল ভূভাগে, এবং দক্ষিণে রাজস্থান ও মধ্য-ভারতেও ইহাদের প্রসার ঘটিয়াছিল। আর্য্যগণ কর্তৃক পর্বতবাসী মোঙ্গোল-জাতীয় মানব প্রথম-প্রথম "কিরাত" নামে অভিহিত হয়।

ভারতীয় জনগণের মধ্যে অধিকতর [২], [৩], [৪] ও [৫] জাতির মানবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে; ভারতের সভ্যতা—বাস্তব বা ভৌতিক সভ্যতা, মানসিক প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক বোধ বা বিচার—এ সমস্ত-ই হইতেছে Proto-Austric বা "আদি দাক্ষিণ" (অথবা সংক্ষেপে Austric বা "দাক্ষিণ"), দ্রাবিড় ও আর্য্য-ভাষীদের সম্মিলিত জীবনের ফল। উত্তর-ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গার দেশে যাহারা পাশাপাশি বাস করিতে থাকে, এমন দাক্ষিণ, দ্রাবিড ও আর্য্য-ভাষী জনগণ, রক্তে ও সভ্যতায়, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। মনে হয়, দ্রাবিড়দের আগমনের পর হইতেই এই মিশ্রণ দ্রাবিড় ও দাক্ষিণদের মধ্যে আরব্ধ হয়; এবং পরে আর্য্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেও, এই মিশ্রীকরণ বা জাতীয় সমীকরণ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, ও খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বার্ধেই এই সমীকরণ নিজ বিশিষ্ট পথে চালিত

হয় ;—আর্য্য-ভাষী হিন্দু বা প্রাচীন ভারতীয় জাতি তখন দাক্ষিণ, দ্রাবিড ও আর্য্যের এবং কিছু পরিমাণে মোঙ্গোলেরও মিশ্রণের ফলে প্রথম নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে।

পূর্ব-ঈরানে—পূর্ব-পারস্যে ও আফগানিস্থানে—এবং পাঞ্জাব প্রদেশে যে প্রাগ্-আর্য্য জনগণের সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া ও মেসোপোতামিয়া হইতে আগত আর্য্যদের সংঘাত ঘটে, তাহাদের দুইটি জাতীয় নাম ছিল—"দাস" ও "দস্যু"। সম্ভবতঃ এই দুইটি নাম একই পর্য্যায়ের, এই দুইটির মূলে এক-ই অজ্ঞাতার্থ "দস্" শব্দ বা ধাতু বিদ্যমান। ঋগ্বেদে এই "দাস" ও "দস্যু" শব্দদ্বয় জাতি-বাচক নাম-হিসাবে পাওয়া যায়। আর্য্য ও দ্রাবিডের প্রথম সংঘাতের যুগে, বিদেশী শত্রু আর্য্যের কাছে, আর্য্য-সম্বন্ধে প্রতিরোধ-পরায়ণ অনার্য্য দস্যুর বৈরি-ভাব মনে করিযা, "দস্যু" এই নামটি 'লুণ্ঠনকারী' অর্থে আর্য্যের ভাষায় রূঢ়ি হইয়া যায় ; তেমনি বিজিত "দাস" জাতির নর-নারী আর্য্যের ঘরে কেনা-গোলামের কাজে বহুশঃ অবনমিত হওয়ায়, "দাস" নামটি 'ক্রীতদাস' বা 'ভৃত্য' অর্থ গ্রহণ করে। ইউরোপেও তেমনি Slav "শ্লাব"-জাতির লোকেরা একসময়ে জর্‌মানিক জাতির লোকেদের দ্বারা বিজিত হইযা এত অধিক পরিমাণে ক্রীতদাস-পর্য্যায়ে নীত হইত যে, জর্‌মান প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের ভাষায় জাতি-বাচক নাম Slav বা Sklav হইতে 'দাস'-বাচক slave, Sklav শব্দ উদ্ভূত হয়। (Slav শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ হইতেছে "শ্রবঃ" অর্থাৎ 'গৌরব, সম্মান'—Slav অর্থে গৌরবময় জাতি ; এই ভাবে অবস্থাগতিকে পাওয়া শব্দটির অর্থগত অবনমন ঘটিয়াছে)। "দাস"-জাতির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ, "দস্যু-হত্যা" অর্থাৎ যুদ্ধে "দস্যু"-জাতির হনন—এ-সমস্ত ঋগ্বেদের যুগের লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। এই প্রথম সংঘাতের পরে, এক-ই দেশে বাস করার ফলে, আর্য্য ও দ্রাবিডের মিলন ক্রমে অবশ্যম্ভাবী রূপে ঘটিতে থাকে।

আর্য্যগণ প্রথম হইতেই Austric-ভাষী Proto-Australoid বা আদিম দাক্ষিণ জাতির লোকেদের "নিষাদ" নামে অভিহিত করিত বলিয়া অনুমান হয় ; "শবর" ও "পুলিন্দ" এই নাম দুইটিও ইহাদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত। অস্টিক বা দাক্ষিণ বা নিষাদ জাতির লোক, নগরিয়া সভ্যতার ধার ধারিত না বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের হাতে ভারতের কৃষিমূলক ও

গ্রাম-নিবদ্ধ সভ্যতা-ই গড়িয়া উঠে। নাগরিক সভ্যতার পত্তন ঘটে মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দের হাতে। আর্য্যেরা প্রথমতঃ যাযাবর ছিল—শর্য্যাত মানব প্রভৃতি তাহাদের গোত্রপতি "গ্রামেণ চচার"—অর্থাৎ নিজ-নিজ "গ্রাম" বা কুল বা গোত্র (ইংরেজীতে যাহাকে tribe বা clan বলে তাহা) লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। অনেকগুলি "গ্রাম", সাধারণ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার জন্য যখন একত্র হইত, তখন হইত "সংগ্রাম"—বিভিন্ন গোত্রের যুদ্ধার্থ মিলিত হওয়া। আর্য্যদের পশ্চিম-এশিয়ায় ও মেসোপোতামিয়ায় উপনিবিষ্ট হওয়ার পরে, পশু (অর্থাৎ গো, মেষ, অশ্ব ও উষ্ট্র)-পালনের সঙ্গে-সঙ্গে, যব, ব্রীহি ও গোধূমের কর্ষণ আরম্ভ হয়। এই কৃষিও তাহারা ভারতে আরও বেশী করিয়া আশ্রয় করিতে থাকে। নগরের পত্তন, দাস-দস্যু বা দ্রাবিড়দের দেখাদেখি আর্য্যদের মধ্যে আবস্ত হয়; আর্য্যভাষার "পুর্, পুব, পুরী" শব্দ মূলে নগর-বাচক ছিল না, ইহার মৌলিক অর্থ হইতেছে 'গড' বা 'সুরক্ষিত স্থান'; এবং সংস্কৃত "নগর" শব্দ যে মূলে দ্রাবিড শব্দ, ইহার প্রাথমিক অর্থ প্রাচীন তমিল প্রভৃতি ভাষায় ছিল 'বাসভূমি, প্রাসাদ', এই শব্দের এইরূপ নিরুক্তি-ও সম্প্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে [দ্রষ্টব্য, T. Burrow : Some Dravidian Words in Sanskrit, *Transactions of the Philological Society for 1945*, London 1946, pp. 107-108]। গোরু, ভেড়া ও ঘোড়ার পাল লইয়া ভ্রমণশীল যাযাবর আর্য্য "গ্রাম" বা গোত্র অনার্য্যের "পুর" বা "নগর" আক্রমণ করিয়া ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিত; সেইজন্য তাহাদের প্রধান দেবতা, আর্য্যজাতির নেতৃ-স্বরূপ ইন্দ্রকেও তাহারা "পুরন্দর" অর্থাৎ নগরধ্বংস-কারী আখ্যা দিয়াছিল।

নিষাদ বা দাক্ষিণ জাতি, সাঁওতাল প্রভৃতি আধুনিক কোল-জাতির পূর্বপুরুষ, এক সময়ে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল, ইহা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। দ্রাবিড়েরা বেশীর ভাগ উপনিবিষ্ট হয় পশ্চিম- ও দক্ষিণ-ভারতে—এই-সব অঞ্চলে ইহাদের ঘন বসতি হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়, এবং সেইজন্য এখানে ইহাদের ভাষা প্রবল হইয়াছিল। তবে উত্তর-ভারতে, পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত সর্বত্র, দাক্ষিণদের পাশাপাশি দ্রাবিড়দেরও বাস ছিল। ধীরে-ধীরে আর্য্য-ভাষার প্রসারের ফলে, পাঞ্জাবে ও সিন্ধু-প্রদেশে, দ্রাবিড় ও দাক্ষিণ্ উভয় শ্রেণীর ভাষার লোপ ঘটে; কেবল বেলুচিস্থানে

ব্রাহুইদের মধ্যে এই দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রের একটু অবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাট, অন্ধ্রদেশ, দ্রাবিড়দেশ বা তমিল্‌নাডু এবং কেরলে এখনও অবিচ্ছিন্ন-ভাবে দ্রাবিড-ভাষার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিদ্যমান। রাজস্থানে এবং মালবে-ও দাক্ষিণদিগের প্রসার বা বাস অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়—এই অঞ্চলের ভীল-জাতি (মধ্য-যুগের আর্য্য-ভাষায়, প্রাকৃতে, যাহাদের "ভিল্ল" বলিয়া অভিহিত করা হইত) এখন আর্য্য গুজরাটী রাজস্থানী ও মালবী বুলী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা কোল-শ্রেণীর অনার্য্য-ই ছিল—বহ্রাড বা বেরার প্রদেশের কোর্‌কুগণ এখন এই অঞ্চলের দাক্ষিণ অধিবাসীদেব একটি অবশেষ-রূপে বাঁচিযা আছে। পাঞ্জাবে ও গঙ্গার উপত্যকায, আফগানিস্থান হইতে পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম পর্য্যন্ত, প্রথম আগত দাক্ষিণদের পাশে-পাশে নবাগত দ্রাবিডদেবও বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজস্থান-মালব হইতে আবম্ভ কবিযা পশ্চিম-বঙ্গ পর্য্যন্ত, গঙ্গার দেশের দক্ষিণে অরণ্যময় ও গিরিসঙ্কুল কৃষি-বিরল অঞ্চলে, মধ্য-ভারতে, ছোট-নাগপুরে, উডিষ্যায ও মধ্য-দাক্ষিণাত্যে, দাক্ষিণ কোল জাতিরই প্রসার বেশী হইয়াছিল—যদিও ইহাদের প্রতিবেশী-রূপে অনুরূপ আরণ্য ব্যাধ-সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড জনগণও বাস করিত। এই হেতু, আমরা এই অঞ্চলে এখন যেমন কোর্‌কু, কোরবা, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, সাঁওতাল, গদর, শবর প্রভৃতি কোল-ভাষী গণসমূহকে দেখিতে পাই, তেমনি-ই গোণ্ড, কন্ধ বা কুই, কুড়ুঁখ বা ওরাওঁ এবং মালের্ বা মাল-পাহাডী প্রভৃতি দ্রাবিড-ভাষী আটবিক বা আরণ্য জাতির লোকেদেরও পাই।

গঙ্গার তীরের কৃষি-প্রধান সমতল-ক্ষেত্রেব অধিবাসী দাক্ষিণ জাতিব লোক এবং তাহাদের প্রতিবেশী দ্রাবিড জাতির লোক—হয তো ইহাদের মধ্যে, অর্থাৎ প্রাচীন কালের দাস-দস্যু-দ্রমিড এবং নিষাদ-ভিল্ল-কোল্ল-শবর-পুলিন্দগণের মধ্যে, প্রথমটায় সংঘাত ঘটিয়াছিল; পরে ইহাদেব পাশাপাশি অবস্থান শান্তিপূর্ণ ভাবেই হইয়াছিল—যেমন আমরা ছোট-নাগপুরে ওরাওঁ ও মুণ্ডাদের মধ্যে দেখি। তবে একসঙ্গে দুই বিভিন্ন জাতির এবং ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ, গঙ্গার দেশে পাশাপাশি থাকাতে, তৃতীয় জাতি এবং ভাষা ও সংস্কৃতির, অর্থাৎ আর্য্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে, স্থান করিয়া লওয়া এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে দুই প্রকার অনার্য্য ভাষাকে কোণ-ঠেসা করিয়া ক্রমে

তাহাদের স্থান দখল করিয়া লওয়া, সহজ হইয়াছিল। ক্রমে উত্তর-ভারতে আর্য্যের সঙ্গে দাক্ষিণ ও দ্রাবিড়-ভাষী (এবং কিছু পরিমাণে মোঙ্গোল জাতির মানুষ) মিলিয়া, ভাষায় এক হইয়া গেল ; কোল-ভাষী দাক্ষিণ জনগণ, উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য-ভাষী জনগণে বিলীন হইল।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা এই দাক্ষিণ কোল-জাতির সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতায় ইহাদের দ্বারা আনীত উপাদানের, কিছু-কিছু পরিচয় আমরা পাইতে পারি। এই জাতির লোকেরা প্রথমটায় 'জুম'-চাষের মতো চাষ করিত—সূক্ষ্মাগ্র বৃহদাকার যষ্টিখণ্ড দ্বারা ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ দিয়া চাষ করিত। নেপালের নেবার জাতির মতো কোদালি দিয়া মাটি কোপাইয়া চাষ করাও সম্ভবতঃ তাহাদের রীতি ছিল। পরে, খুব সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-ভাষীদের কাছে, তাহারা লাঙ্গলে গোরু মহিষ জুড়িয়া রীতিমত ধান চাষ করিতে শিখে। কেবল নদীমাতৃক অঞ্চলেই, কৃষি দাঁড়াইয়াছিল ইহাদের সংস্কৃতির মুখ্য আধার বা প্রতিষ্ঠাভূমি। অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশে কিন্তু ইহারা প্রধানতঃ শবর বা ব্যাধের জীবন যাপন করিত ; পরে চাষও সেখানে অল্প-স্বল্প করিত। সমতল নদীমাতৃক দেশে ও অন্যত্র ইহারা কতকগুলি স্থানীয় ফল ও শাক-তরকারীর চাষ-ও করিত—যেমন কলা, নারিকেল, লাউ, কুমড়া, বেগুন, কচু, লেবু। পান ও সুপারীর ব্যবহার ইহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় সভ্যতায় গৃহীত হয়। সরিষা, হলুদ, আদা ও মরিচ (পিপুল) ইহারা চাষ করিত। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহারাই ভারতের অরণ্যাবৃত দেশে হাতীকে পোষ মানায়। মাংসের জন্য ও ডিমের জন্য ইহারা শূকর ও মুরগী পুষিত। কার্পাস হইতে সূতা কাটিয়া তুলার কাপড় প্রথমতঃ এই দাক্ষিণ জাতির মানুষেই তৈয়ারী করে। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুক প্রধান ছিল।

দাক্ষিণ জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক এবং ধার্মিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন প্রমাণ তেমন কিছুই নাই। বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-যুগ পর্য্যন্ত সংস্কৃতাদি সাহিত্যে ক্বচিৎ কখন দুই-চারিটি কথা বা আভাস যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়া বিচার তো করিতেই হয় ; এতদ্ভিন্ন ভারতের ও ভারতের বাহিরের দাক্ষিণ-ভাষা-ভাষী জনসমূহের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও অনুষ্ঠান, মানসিক প্রবণতা ও ধর্ম-বিশ্বাস—এই-সবেরও আলোচনা করিতে হয়।

দাক্ষিণ শ্রেণীর ভাষাগুলিকে এই ভাবে শ্রেণী-বদ্ধ করা হয়। এগুলি দুইটি প্রধান বিভাগে পড়ে—[১] Austro-Asiatic বা দক্ষিণ-আসিয়া-স্থিত, ও [২] Austronesian বা দক্ষিণ-দ্বীপপুঞ্জাশ্রয়ী।

এই দুই বিভাগের অন্তর্গত ভাষাগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ ও এগুলির অবস্থান নীচে দেওয়া দুইটি বংশলতিকা দ্বারা দেখানো যাইতেছে।
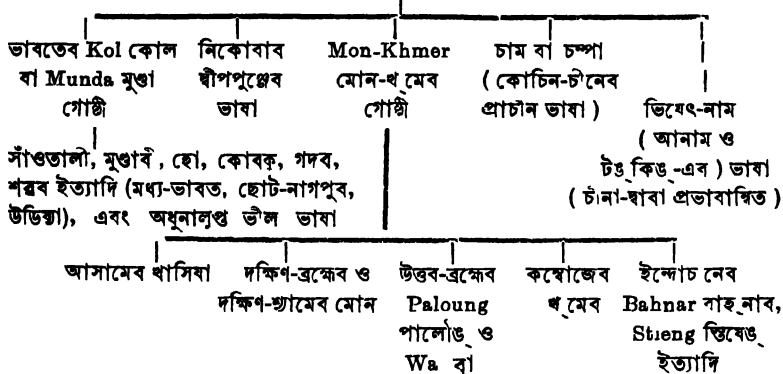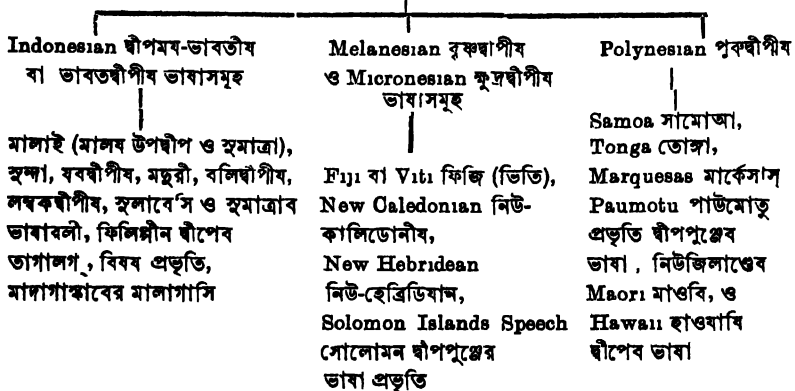
এই-সমস্ত বিভিন্ন ভাষা ও তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির আলোচনার আধারে, আদিযুগের দাক্ষিণ সংস্কৃতি ভারতবর্ষে কী ভাবের ছিল তাহার বিচার ও

অনুমান করা চলে। তবে মোটামুটি বলা চলে যে, ধর্ম-জগতে লিঙ্গ-প্রতীকে পূজা আংশিক ভাবে দাক্ষিণ জাতির দান। ভারতীয় দর্শনে পুনর্জন্মবাদ, দ্রাবিড়ের নিকট হইতে না হইয়া দাক্ষিণদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়—আর্য্যদের মধ্যে পুনর্জন্মবাদ উদ্ভূত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়; আর্য্য-মতে, মৃতব্যক্তি পিতৃলোকে বা এক অনির্দিষ্ট পরলোকে তাহার পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হইত; এ সম্বন্ধে এক প্রকার আবছা-আবছা ধারণা-ই তাহাদের সম্বল ছিল। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ধার্মিক নিষেধ—taboo—দাক্ষিণদের মধ্যে বিশেষ প্রবল ছিল। বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা দাক্ষিণদের নিকট হইতে-ই হিন্দু পুরাণে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বপ্রপঞ্চকে অণ্ডবৎ ("ব্রহ্মাণ্ড"-রূপে) কল্পনা, এবং মৎস্য কূর্ম বরাহ প্রভৃতি অবতারের কল্পনা, মূলতঃ ইহাদের-ই বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের তিথি ধরিয়া কাল নিরূপণ-ও সম্ভবতঃ ইহাদের-ই রীতি ছিল। নাগ-পূজা, ও কতকগুলি উপাখ্যান (যেমন মৎস্যগন্ধার উপাখ্যান) মূলে দাক্ষিণ জাতির। Totemism বা কোনও মানবেতর প্রাণীকে মানববংশ-বিশেষের আদিপুরুষ-রূপে কল্পনা, ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মৃতের বৃক্ষ-সমাধি (মহাভারতে যে রীতির উল্লেখ আছে), এবং মৃতের উপর স্তূপ রচনা, ইহাও দাক্ষিণ জাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ছিল। পূর্ব-ভারতে হিন্দু বিবাহে 'স্ত্রী-আচার', এবং সিন্দুর হরিদ্রা প্রভৃতির ব্যবহার, দাক্ষিণ জাতির-ই রীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালাদেশে (বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গে) যে ধর্ম-পূজা প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কোনও যোগ নাই; অনুমিত হয় যে, এই ধর্ম-পূজা হইতেছে বঙ্গদেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মের বিকৃত অবশেষ। এই ধর্মের অন্যতম দুইটি প্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে লুইয়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করা, এবং ধর্মের গাজন—এই দুইটি বস্তু প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির বিশিষ্ট বস্তু। প্রচলিত ধর্ম-পূজার সঙ্গে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক কিছু মিলিয়া গিয়া জিনিসটিকে সম্পূর্ণ মিশ্রিত বা হিন্দু-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। [এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত প্রবন্ধ India and Polynesia: Austric Bases of Indian Civilisation and Thought—*Bharata Kaumudi* (Studies in Indology in honour of Dr Radha Kumud Mookerji), Part I, Allahabad 1945, pp. 193-208; এবং B. C. Law Volume, Part I,

Calcutta 1945, pp. 75-87-তে প্রকাশিত মৎ-প্রণীত অন্য একটি প্রবন্ধ Buddhist Survivals in Bengal ।]

ইহা তো হইল মিশ্র ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীন নিষাদ বা দাক্ষিণ-জাতির আহৃত উপাদানের কথা। নিষাদ বা প্রাচীন দাক্ষিণ-জাতির ভাষার—প্রাচীন যুগের কোল ও মোন-খ্মের গোষ্ঠীদ্বয়ের দাক্ষিণ ভাষার—বহু শব্দ, কিভাবে প্রাকৃত সংস্কৃত, ও আধুনিক আর্য্য-ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার-ও আলোচনা কিছু-কিছু হইয়াছে ও হইতেছে। [লক্ষণীয়—প্রবোধচন্দ্র বাগচীর Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India: Calcutta University, 1929—Jean Przyluski ঝাঁ প্শিলুস্কি, Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক্ ও Sylvain Lévi সিল্ভ্যাঁ লেভি কর্তৃক লিখিত কতকগুলি ফরাসী প্রবন্ধের অনুবাদ, ও তৎসঙ্গে মুদ্রিত অন্য কতকগুলি প্রবন্ধ; এবং মৎপ্রণীত প্রবন্ধ Two New Indo-Aryan Etymologies, *Zeitschrift fuer Indologie*, Berlin 1932, এবং Non-Aryan Elements in Indo-Aryan, *Journal of the Greater India Society*, 1936, Vol. III, pp. 43 ff.; দ্রাবিড় ভাষায় আগত দাক্ষিণ ভাষার শব্দের আলোচনা কোচিন-এরনাকুলম্-এর অধ্যাপক স্বর্গীয় ল-ব রামস্বামী অয়্যর্ তাঁহার একটি প্রবন্ধে ইতিপূর্বে করিয়াছেন।]

ভারতের কোল-বংশীয় দাক্ষিণ-জাতির এবং কোল-ভাষার সম্বন্ধে হঙ্গেরীয় লেখক Vilmos Hevesy ভিল্মোশ্ হেভেশি কিছুকাল হইল একটি নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোল-ভাষা, Ural উরাল (অথবা Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়) গোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধ—ভারতের বাহিরের মোন্-খ্মের ও Austronesian দাক্ষিণ-দ্বীপাশ্রয়ী ভাষাগুলির সঙ্গে নহে। হেভেশির মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই Finno-Ugrian ফিন্নো-উগ্রীয়-ভাষী কোনও জাতি নিজ ভাষা লইয়া ভারতে আইসে, এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কোল-জাতিতে পরিণত হয়। ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা-গোষ্ঠীতে মিলে—Hungarian হুঙ্গেরীয় বা Magyar মজর, Finn ফিন্, Esth এস্ত্, Lapp লাপ, এবং রুষ-দেশের কতকগুলি স্বল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত আদিম-জাতীয় ভাষা, যথা Vogul ভোগুল্, Ostyak ওস্ত্যাক্, Mordvin মোর্দ্ভিন্, Cheremis চেরেমিস্, Siryen সির্য়েন্ প্রভৃতি; এবং এই গোষ্ঠী, Altaic আলতাই-গোষ্ঠীর ভাষা তুর্কী মোঙ্গোল মাঞ্চু প্রভৃতির

সহিত সংপৃক্ত। হেভেশির এই মত, যে-টুকু এখনও ভালো করিয়া যাচাই করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহা যুক্তি- বা বিচার-সহ নহে ; দাক্ষিণ ভাষাসমূহের যে বংশচিত্র পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহা-ই এখনও মানিতে হয়,—ফিন্নো-উগ্রীয় গোষ্ঠীর সহিত কোল ভাষার সংযোগ এখনও প্রমাণিত হয় নাই বলিতে হয়।

আধুনিক কোল-জাতি, সুপ্রাচীন দাক্ষিণ- বা নিষাদ-জাতির বংশধর। ভাষাগত অল্প-বিস্তর পার্থক্য ধরিয়া এই জাতির গণ-সমূহকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব-প্রধান হইতেছে এই কয়টি: [১] সাঁওতাল, সংখ্যায় প্রায় ২৭ লাখ ; দাক্ষিণ, দ্রাবিড় ও মোঙ্গোল নির্বিশষে, ভারতের Aboriginal আদিবাসী বা ভূমিপুত্র অর্থাৎ Tribes গণ-সমূহের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সব-চেয়ে অধিক। সাঁওতাল-পরগণায়, সিংহভূমে, বাঙ্গালাদেশে, মানভূমে, উড়িষ্যায় এবং আসামের চা-বাগানসমূহে সাঁওতালদের বাস ; [২] মুণ্ডারী-ভাষী মুণ্ডাজাতি, সংখ্যায় ৬॥০ লাখ, রাঁচীকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের বাস ; [৩] হো, সংখ্যায় ৪॥০ লাখ, চাঁইবাসার আশে-পাশে ইহাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ; ছোট-নাগপুরে [৪] খাড়িয়া, ১ লাখ ৮০ হাজার, ও [৫] ভূমিজ, ১ লাখ ১৩ হাজার : এবং [৬] কোর্‌কু—বহ্রাড (বেরার) ও মধ্য-প্রদেশে, ১ লাখ ৬০ হাজার : এবং এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যায় [৭] শবর, ১ লাখ, ১৬ হাজার ও [৮] গদব, ৪৪ হাজার।

ইউরোপীয় ভাষা-তাত্ত্বিকদের পরিভাষায়, Austric অর্থাৎ দাক্ষিণ ভাষার অন্তর্গত Austro-Asiatic বা দাক্ষিণ-আসিয়া-স্থিত বিভাগের এই কোল-শাখাকে Munda "মুণ্ডা" নামে সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়। কিন্তু "মুণ্ডা" নামটি তেমন উপযোগী নহে। ভারতবর্ষে ইহা কোল-জাতির মাত্র একটি বিশিষ্ট গণকে বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয়—রাঁচীর আশ-পাশের কোল-জাতীয়দের জন্য সীমিত এই নামকে, ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের কোনও আবশ্যকতা নাই। Kol "কোল" এই নামটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারীরা "কোল" বলিলে, দ্রাবিড-ভাষী ওরাওঁ, কন্ধ এবং মাল-পাহাড়ীদের বাদ দিয়া, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ভূমিজ, খাড়িয়া, প্রভৃতিদেরই বুঝে ; সুতরাং এই ব্যাপক সুপরিচিত সংজ্ঞা ব্যবহার করা-ই ভালো। কোলদের নাম হইতে ছোট-নাগপুরের একটি অঞ্চলের নাম

হইয়াছে "কোল্‌হান" অর্থাৎ কোলদের দেশ (যেমন "ভোটান"=ভোটদের দেশ, "গোণ্ডৱানা"=গোণ্ডদের দেশ, "রাজপুতানা"=রাজপুতদের দেশ, "ঈরান" বা "এরান"=আর্য্যদের দেশ)। আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য ভাষার এই সুপরিচিত "কোল" শব্দটি, মধ্য-যুগের ভারতীয়-আর্য্য ভাষার (প্রাকৃতের) "কোল্ল" শব্দ হইতে উদ্ভূত ; এবং মারাঠী ও গুজরাটী ভাষাতেও এই জাতীয় মানুষের জন্য "কোলী" শব্দের প্রয়োগ আছে। কোনও মতে, কোল-জাতীয় সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি দিন-মজুরী করিবার জন্য কলিকাতায় ও অন্যত্র আসিত বলিয়া, ইহাদের নাম হইতেই "কুলি" শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এ ব্যুৎপত্তি ঠিক বলিয়া মনে হয় না। মধ্য-ভারতের অরণ্য- ও পর্বত-বাসী অনার্য্য নিষাদগণকে এখন হইতে দেড হাজার বছর আগে "ভিল্ল" ও "কোল্ল" বলিয়া উল্লেখ করা হইত। "কোল" শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃতেও পাওয়া যায় —ইহার অর্থ হইতেছে 'শূকর'—একটি জাতি-বাচক নামের ঘৃণা-প্রকাশক অপপ্রয়োগ মাত্র। সাঁওতালেরা নিজেদের "হড়্" বলে, মুণ্ডারা বলে "হোড়ো", হো-রা বলে "হোও" বা "হো" (হো-ভাষায় ড-ধ্বনি লোপ পায), এবং কোর্‌কু-রা বলে "কোরো" ; উহাদের ভাষায় এই শব্দের অর্থ হইতেছে—'মানব বা মানুষ'। বহু জাতির মধ্যে, স্বকীয নাম হিসাবে, তাহার ভাষার মানব-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হইত ; "কোল" জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কোল-জাতির দৃষ্টিতে, সমগ্র মানব-জাতি দুইটি বিভাগে বিভক্ত—এক, সত্যকার মানব, "হোড়ো, হড়, কোরো", যাহাদের ভাষা বুঝি, ও যাহারা আমাদের আপন জন ; এবং দুই, যাহাদের ভাষা বুঝি না, যাহারা পর, তাহারা হইতেছে Diku "দিকু"। ইহা যেন প্রাচীন আর্য্যদের বা হিন্দুদের "আর্য্য" তথা "ম্লেচ্ছ" বা "বর্বর", প্রাচীন গ্রীকদের Hellenes ও Barbaroi, ইহুদীদের Benim Yisrael ও Goyim বা Gentiles অর্থাৎ 'জাতি-সমূহ', জর্‌মানিক জাতির Thiudiskoz ও Walhoz, শ্লাবদের Slavu ও Nyemetsu, আরবদের "আরব" ও "আজম"—এইরূপ 'স্বজাতি' ও 'বিজাতি' এই দুই ভাগে মানব-জাতিকে বিভক্ত করার মতো। এখন ইহা অনুমিত হয় যে আধুনিক কোল-ভাষীদের "হোড়ো, হড়, কোরো" প্রভৃতি শব্দের একটি প্রাচীন রূপ, দেড়-হাজার দুই-হাজার বৎসর পূর্বে আর্য্য-ভাষীদের কানে যেরূপ শুনাইয়াছিল, তাহার-ই আধারে "কোল্ল" শব্দ গঠিত

হইয়াছে। অর্থাৎ "কোল্ল" শব্দকে প্রাচীন কোল-ভাষায় মানব-বাচক শব্দ বলিয়া ধরিতে পারি। তাহার-ই আধুনিক রূপ, এই জাতির স্বকীয় নামের অন্যতম প্রাচীন রূপ বলিয়া, এই জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী নাম। Kolarian বলিয়া একটি নাম ইংরেজীতে ইহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত, কিন্তু অর্থহীন বলিয়া তাহা প্রায় সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বি-অক্ষর "কোল্ল", "কো-ল" Kolla, Kola, বা আধুনিক উচ্চারণে একাক্ষর "কোল্" Kol শব্দটি, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বা 'নগ্ন' বিবেচিত হইতে পারে: সেইজন্য ইহাকে একটু পরিবর্ধিত করিয়া, আমরা "কোলীয" বা "কোল্লীয়" (ইংরেজীতে Kolian) শব্দ অক্লেশে প্রয়োগ করিতে পারি।

কোলদের জাতি, সমতল নদীমাতৃক পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান ও বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী দাক্ষিণ-জাতির (নিষাদগণের) নানা গণ, দেশের অন্য-জাতীয় দ্রাবিড় ও মোঙ্গোল এবং আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া, এখন উত্তর-ভারতের হিন্দু (অথবা মুসলমান-ধর্মান্তরিত) জন-সমূহের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বন ও পাহাড়ের দেশ মধ্য-ভারত ও ছোট-নাগপুরে ইহাদের সংস্কৃতি একটু অন্য ধরণের হইতে বাধ্য হয়—কৃষি ও পশু (গো, মহিষ, শূকর, কুক্কুট)-পালনের সঙ্গে-সঙ্গে মৃগয়া ইহাদেব আজীবিকার একটি প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কৃষিকে (বিশেষতঃ গো-মহিষ ও লাঙ্গল যোগে ধান-চাষকে) ইহারা সভ্য জীবনের ও উন্নত জীবনের প্রথম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইতেছিল। ইহারা ধীরে-ধীরে মধ্য-ভারতের ও ছোটনাগপুর ঝাড়খণ্ডের অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতেছিল। ইহাদের আদিম সংস্কৃতি, ধর্ম-মত প্রভৃতি, নানা দিকে পরিবর্তিত হইয়া যায়; Bir-Buru "বির্-বুরু", অর্থাৎ অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে বাস করার দরুন, Ote-Serma "অতে-সেরমা" অর্থাৎ ধরিত্রী ও আকাশ, অথবা দ্যাবা-পৃথিবী, আসমান-জমীন, বা স্বর্গ-মর্ত্য সম্বন্ধে ইহাদের ধারণাও পরিবর্তিত হয়—বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইহারা একটি স্বকীয় বিশিষ্টতা লাভ করে। এখনকার কোলদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি এবং তাহাদের সংস্কৃতি, তাহাদের অধুনা-অধ্যুষিত দেশ ছোট-নাগপুরের অরণ্য ও পর্বত-অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালার প্রত্যন্ত বা সীমান্ত প্রদেশে এই দেশ ; বাঙ্গালার "সামন্ত" বা "সম্-অন্ত" অর্থাৎ সীমাসংলগ্ন ভূখণ্ডে যে কোল জনগণ বাস করিত, দ্বিসহস্রাধিক-বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালা দেশের আর্য্য-ভাষীরা তাহাদের নাম দেয় "সামন্ত-পাল" ; ইহা, প্রাকৃত "সাৱঁন্ত-ৱাল" শব্দের মধ্য দিয়া, আধুনিক বাঙ্গালা "সাঁওতাল—সাঁওতাল", এই শব্দের রূপ ধরিয়াছে। (তুলনীয়—"সামন্ত-রাজ" হইতে পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দু পদবী "সাঁতরা" ।) "মুণ্ডা" শব্দ সাঁওতালদের পশ্চিমে অবস্থিত কোল জনগণের নাম—ইহা আর্য্য-ভাষার শব্দ—মূলে অনার্য্য হওয়া সম্ভব—কিন্তু ইহা এই জাতির লোকেদের head বা chief, মুণ্ড বা মাথা অর্থাৎ প্রধানদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত ; পরে সৌজন্য করিয়া ইহা এই গণের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে থাকে, ও সমগ্র গণের নাম হইয়া দাঁড়ায়। সাঁওতালদের মধ্যে সম্মান-সূচক পদবী হইতেছে "মাঝি", ইহাও আর্য্য-ভাষার শব্দ—"মধ্য—মাধ্যিক" হইতে উৎপন্ন ; অনুরূপ অর্থের শব্দ হইতেছে ভদ্রব্যক্তি-বাচক বাঙ্গ'লা মুসলমান পদবী "মিয়াঁ", যাহার অর্থ ফারসী ভাষায় হইতেছে 'মধ্য' বা 'মধ্যস্থ'।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা, উড়িয়া, বিহারী বা হিন্দী সাহিত্যে কোলদের কোনও উল্লেখ নাই। প্রাচীন বাঙ্গালায় "শবর", ও মধ্যযুগের বাঙ্গালায় "রাঢ়" বা "রাড়" ও "চুহাড়" বা "চোয়াড়" শব্দ, সম্ভবতঃ কোল-ভাষীদের সম্বন্ধে-ই ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্য-ভাষার প্রসার ধীরে-ধীরে কোল-অধ্যুষিত প্রদেশকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু এই ভাষা-সংঘাতের কোনও ইতিহাস নাই। আর্য্য-ভাষীর সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল, এবং প্রায় সর্বত্র হিন্দু-সমাজের জাতিগুলিতে পরিণত হইতেছিল। হয়তো ক্বচিৎ ইহাদের রাজা বা স্থানীয় ভূম্যধিকারী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করিয়া, ক্ষত্রিয় বলিয়া ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছিল—কিন্তু ভাষা-ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে, সাংস্কৃতিক অধঃপতন-ই হইতেছে ইহাদের অতি আধুনিক ইতিহাস।

প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী কোলেদের সম্বন্ধে, অর্থাৎ ভিল্ল-কোল্ল-নিষাদ-শবর-পুলিন্দদের সম্বন্ধে, আমাদের আর্য্য-ভাষী পূর্বপুরুষগণ খুব বেশী কৌতূহল দেখান নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে বাণভট্ট তাঁহার "শ্রীহর্ষচরিত" গ্রন্থের অষ্টম উচ্ছ্বাসে জনৈক শবর-যুবকের বর্ণনা খুঁটিনাটির সহিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যাচলের কোল বা শবরগণ স্থানীয় দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর উদ্দেশে নরবলি-দানের সময়ে উপস্থিত হইয়াছে—হয় তো বা ইহার বর্ণনা "গউড়বহ" নামে নবম শতকের প্রাকৃত-কাব্যে পাওয়া গেল ; হয় তো কোনও পুরাণে কেবল ইহাদের নামমাত্র উল্লিখিত হইল। পুরাণে নানা স্থানে পুলিন্দ শবর প্রভৃতিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান আছে। "কথাসরিৎসাগর" গ্রন্থে মধ্য-ভারতবাসী পুলিন্দদের সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। "বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ" পুস্তকে ইহাদের মধ্যে প্রচলিত বেশ কৌতূলোদ্দীপক কাহিনীর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার বেশী আর কিছু পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনের কৌতূহল ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রথম নূতন করিয়া সচেতন করিয়া দিল, বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে। ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত হওয়ার কিছু পরেই, ছোট-নাগপুরে ইংরেজ রাজপুরুষদের ইহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইল, এবং তৎপরে বিগত শতকের দ্বিতীয় অর্ধ হইতে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণও ইহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তখন ইহাদের ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম প্রভৃতির চর্চা আরম্ভ হইল। মিশনারিরা বাঙ্গালা ও নাগরী এবং রোমান, এই তিন লিপিতে ইহাদের ভাষা লিখিয়া, এবং ইহাদের ভাষায় বাইবেল-আদির অনুবাদ করিয়া, এবং ইহাদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক পুরাণ-কাহিনী, গান, ছড়া প্রভৃতি ধীরে-ধীরে সংগ্রহ করিয়া, ইহাদের ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করিলেন, এবং খ্রীষ্টান ধর্মের সাহায্যে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে ইহাদের বিলীন হইয়া যাওয়া অনেক অংশে বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে বিদেশী মিশনারিদের দলের বাহিরে আমাদের মধ্য হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে দরদী অনুসন্ধিৎসু ও ইহাদের অকৃত্রিম বন্ধু বাহির হইলেন ; কোল ও অন্য বন্য জাতির এইরূপ উদার-হৃদয় প্রেমীদের মধ্যে রাঁচীর স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুণ্য নাম প্রথম করিতে হয়। ইহার পূর্বে বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারীদের কেহ-কেহ ইহাদের সম্বন্ধে সহানুভূতির দৃষ্টিতে আলোচনা করেন, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কোলদের বর্ণনা করিয়া লেখা ইঁহার সরস ও সদ্ভাবপূর্ণ ভ্রমণ-কথা। "পালামৌ" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাহির হয়। তাহার পরে, সাঁওতালদের ও ক্বচিৎ অন্য কোল জনগণের জীবনকথা লইয়া

বাঙ্গালী লেখকের ছোট গল্প ও উপন্যাস বাহির হইয়াছে, সাঁওতাল রূপকথার সংগ্রহ এবং ক্বচিৎ কবিতার অনুবাদও বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী শিল্পী সাঁওতাল ও অন্য কোলদের সংস্পর্শে আসিয়া বিশেষ প্রীতির সঙ্গে তাহাদের জীবন-চিত্র আঁকিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মতো শিল্পীর কথা বলিতে হয়—নন্দলালের আঁকা রঙ্গীন ও এক-রঙ্গা বহু চিত্র ও রেখাঙ্কন সাঁওতালী জীবন ও সাঁওতালী স্ত্রী-পুরুষদের লইয়া, এই জাতির সম্বন্ধে ইহা তাঁহার অসীম স্নেহ-ভাবের পরিচায়ক। শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতী কলাভবনের শিল্পীরা এ বিষয়ে তাঁহাদের গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন—তাঁহাদের আঁকা ছবিতে, হাতে-গড়া মূর্তিতে সাঁওতালী জীবনের সৌন্দর্য্য অমর হইয়া থাকিবে। নন্দলাল ও তৎশিষ্যগণের বহু-বহু প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিত্রে সাঁওতাল জীবনের নানা দিক্ প্রদর্শিত হইয়াছে—বেশীর ভাগ ইহাদের ঘরোয়া জীবন; যেমন সাঁওতাল যুবক বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার স্ত্রী বা প্রণয়িনী; সাঁওতাল রাখাল বালক; সাঁওতাল শিশু ও মাতা; সাঁওতাল মেয়েদের সারি দিয়া গমন; নাচের দৃশ্য; ধান রোয়া ও ধান কাটার দৃশ্য; সাঁওতাল ঘর-বাড়ি, গ্রাম; ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য নন্দলালেব বৃহৎ চিত্র, মাদল-বাদকের সঙ্গে কয়েকটি সাঁওতাল কন্যার নৃত্য—ইহা তাঁহার এক মহনীয় কৃতি। শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ও সাঁওতালকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—বহু পূর্বে আঁকা তাঁহার একখানি ছোট ছবি উল্লেখযোগ্য—পাহাড়ে স্রোতস্বতীর জল জমিয়া একটি ছোট জলাশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, মাথায় পলাশ ফুল গুঁজিয়া প্রসাধন-কার্য্যে নিরত একটি সাঁওতাল মেয়ে আরশীর মতন তাহাতে নিজের মুখ দেখিতেছে; সাঁওতালী নাচের দৃশ্যও তিনি নিজ বিশিষ্টতাময় রেখাপাতের দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছেন। মোট কথা, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে সাঁওতাল বা কোল জীবন তাহার আদিম সারল্য লইয়া একটি আদরের বস্তু, এমন কি কতকটা যেন আদর্শ জগতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপীয় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক। সাঁওতাল ও অন্য কোল ভাষায় মৌখিক সাহিত্য এবং কোল জীবন, ধর্ম-বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রভৃতি লইয়া যে-সব বই ও প্রবন্ধ ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেগুলির

বৈজ্ঞানিক মূল্য অসাধারণ, সেগুলি নানা তথ্যের ভাণ্ডার; এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনায় দুই-চারিজন ভারতীয়ের—বাঙ্গালীর—দানও আছে।

পরম্পরাগত আদিম জীবনের ধারা যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছে বলিয়া, কোল-ভাষী জনগণকে ভারতের সব-চেয়ে প্রাচীন জাতি বলা চলে। প্রাচীন জাতি ও বনচারী জাতি বটে—কিন্তু তাহারা অতি পরিচ্ছন্ন জাতি, নানা নৈতিক গুণে মণ্ডিত জাতি, সম্পূর্ণরূপে ভালো-বাসার যোগ্য জাতি। তাহাদের আদিম এবং অজ্ঞ বনবাসী অবস্থায় তাহাদিগকে শিশু-মনোবৃত্ত বলা চলে—সরল, সত্যবাদী, সৎ, এবং সব বিষয়ে সোজা-ভাবে তাহারা বিচার করিতে ও চলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের ধন-মূলক 'সভ্যতা' এখন তাহাদের সারল্য নষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের নূতন অভাব দেখা যাইতেছে; অর্থনৈতিক ও অন্য দিকে তাহারা ভারতের অন্য অংশ হইতে আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবে না। তাহাদের সারল্যের ও অজ্ঞানের সুবিধা লইয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ভারতীয় এবং রোমান-কাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট অথবা জরমান-বেলজীয়-ইংরেজ-নির্বিশেষে বিদেশী "দিকু"-রা, তাহাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা হানি করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহারা কোমল প্রকৃতির এবং শান্তিপ্রিয় মানব-ই রহিয়াছে। তাহারা কঠোর পরিশ্রমী, নিজের সামান্য অভাব-মোচনে নিজেরাই তৎপর, এবং তদুপরি সদানন্দ জাতি; তাহারা সকলেই মাদল-বাজানো, নাচ ও গান ভালোবাসে, এবং সময় পাইলেই তাহার দ্বারা চিত্তবিনোদন করে। তাহাদের পারিবারিক জীবন সাধারণতঃ নিষ্পাপ, প্রকৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে তাহারা স্বস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। নর-নারীর প্রেম ইহাদের কবিতায় ও রূপ-কথায় একটা লক্ষণীয় অংশ জুড়িয়া আছে—ইহাদিগের দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া ইহাদিগকে romantic বা রমন্যাস-প্রিয় জাতিও বলিতে পারা যায়। আমাদের আধুনিক নগরিয়া সভ্যতার নানা পঙ্কিলতা ও আবর্জনার পাশে ইহাদের এই সরল বন্য বা গ্রাম্য জীবন পবিত্র ও কাব্যময় বলিয়া মনে হয়। বিহারের সুপরিচিত সিভিলিয়ান, আদিবাসীদের দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত W. G. Archer আর্চার সাহেব ওরাওঁ-দের কথা লইয়া রচিত তাঁহার অতি সুন্দর পুস্তক *The Blue Grove* (London, 1940)-এ দ্রাবিড়-ভাষী ওরাওঁদের

সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এক-ই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত কোলদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য : A few notes should be added on Uraon 'character'. To the earliest observers, a capacity for cheerful hard work was the most notable character of the Uraons ; a sturdy gaiety, an exultation in bodily physique and a sense of fun are still their most obvious qualities. These are linked to a fundamental simplicity —a tendency to see an emotion as an action, and not to complicate it by postponement or obligation .....the final picture is of a kindly simplicity and smiling energy.

কোলদের ধর্মকে আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় Animism অর্থাৎ "অজ্ঞাত-দেবশক্তি-বাদ" পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। এই মতবাদ বা বিশ্বাস অনুসারে, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে এক অদৃষ্ট অজ্ঞাত দৈবী শক্তি বা আত্মা কার্য্যকর হইয়া সদা-বিদ্যমান আছে। সেই শক্তি কখনও মানুষের শত্রু, কখনও মিত্র ; নানা ভাবে পূজা-উপচারের দ্বারা, সেই শক্তিকে, শত্রু হইলে দূর করা বা শান্ত রাখা, এবং মিত্র হইলে তাহাকে পরিপোষক করিয়া রাখা, এই ধর্মের অনুষ্ঠান রূপে দেখা দেয়। কোলেরা পর্বত, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতিতে ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত দেবশক্তি বা দেবতাত্মা বা দেবপ্রাণের বিভিন্ন প্রকাশ বা মূর্তিকে, Bonga "বোঙ্গা" বা "বঙ্গা" নামে অভিহিত করে। আকাশ, পাহাড়, ভূমি, নদী, বন, গ্রাম, বাড়ি, মাঠ—সব-ই অদৃশ্য বোঙ্গাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ; আবার বিশেষ করিয়া পাহাড়ে, বনে, গিরিগুহায়, গাছের মধ্যে, পাহাড়িয়া নদী বা ঝরনার মধ্যে, এবং মাটির ভিতরেও দেবতারূপে কল্পিত এই বোঙ্গাদের বাস। সকল বোঙ্গার উপরে কিন্তু একজন পরম বোঙ্গা, প্রধান দেবতা বা পরমেশ্বর আছেন, Singi-Bonga "সিঙি-বোঙা", Siñ-Bonga "সিঞ্-বোঙ্গা" বা Sing-Bonga "সিং-বোঙ্গা" ; ইঁহাকে আর্য্য-ভাষীদের ভাষায় সাঁওতালেরা কখনও-কখনও "ঠাকুর বাবা" বলিয়াও অভিহিত করে। ইঁহার কাছে সাঁওতাল ও অন্য কোলদের চরম আবেদন উদ্দিষ্ট হয়। সিঞ্-বোঙ্গা হইতেছেন সমস্ত বিশ্বের অদৃষ্ট স্রষ্টিকর্তা, সকলের পালক, পোষক ও শাসক, সকলের চেয়ে মহান্ প্রধান দেবতা, মানুষের পাপ-পুণ্যের, সকল কাজের দ্রষ্টা ও সাক্ষী ; মানুষ দুঃখ-কষ্টে তাঁহার কাছে প্রার্থনা জানাইয়া

আরাম বা স্বস্তি পায়, এবং তিনি আপৎকালে মানুষকে প্রতীকারের উপায় জানাইয়া দেন। এই পরমেশ্বর পরমাত্মা হইতেছেন, কোলদের ভাষায়, "মারাঙ্-উতের্নি"—'সকলের চেয়ে মহান্'; তাঁহাকে "হানি" অর্থাৎ 'উনি, ঐ পুরুষ' বলিয়া অনেক সময়ে অভিহিত করা হয়। এই পরমাত্মার প্রচলিত নাম "সিঙ্-বোঙ্গা" শব্দের "সিঙ"-অর্থে দিন, বা সূর্য্য; ইঁহাকে সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা আলোকের দেব বলিয়া উল্লেখিত করা হয়। আলোর সঙ্গে ইঁহার যোগ স্মরণ করিয়া কোল-জাতীয় "সোকা" ও "দেওঁড়া" অর্থাৎ পুরোহিত ও ভবিষ্যদ্বক্তারা কখনও-কখনও সিঙ্-বোঙ্গার উদ্দেশ্যে সাদা মোরগ বা পাঁঠা বলি দিযা থাকে। সিঙ্-বোঙ্গা আর সমস্ত বোঙ্গাব স্রষ্টা। "বোঙ্গা" শব্দ আজকাল সাধারণতঃ 'দেবতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু Korwa কোর্‌বা প্রভৃতি দুই-একটি ভাষার নজীবে এবং মুণ্ডাবী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, "বোঙ্গা" শব্দের মূল অর্থ ছিল 'চাঁদ'। আজকাল সাঁওতালী মুণ্ডারী প্রভৃতিতে 'চাঁদ' ও 'সূর্য্য' উভযকেই বুঝাইবার জন্য আর্য্যভাষার শব্দ "চান্দো, চান্দুক" শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং চাঁদের জন্য "বোঙ্গা" শব্দ ব্যতিরেকে অন্য দুইটি শুদ্ধ কোল শব্দ আছে—খাডিযা ও জুয়াঙ্ "লেবাঙ", শবর "আঙাই", গদব "আঙ্গায়িতা"। "সিং" অর্থে 'দিন বা সূর্য্য', ; "ঞিন্দা, নিদা" অর্থে 'রাত্রি'; এইজন্য 'চাঁদ' অর্থে "ঞিন্দা চান্দো" বা "ঞিন্দা বোঙ্গা" শব্দও কোল-ভাষায় (সাঁওতালী ও মুণ্ডারীতে) পাওযা যায। "সিঙ্-বোঙ্গা" (অথবা "সিঙ্-চান্দো"—"চান্দো" এখানে 'সূর্য্য' অর্থে) অর্থাৎ 'দিনের বা আলোর দেবতা', যেন পরমেশ্বর বা দেবরাজ, এবং "ঞিন্দা চান্দো" অর্থাৎ 'রাত্রির দেবতা' চন্দ্রদেবী হইতেছে দেবতাদের রাণী, সিঙ্-বোঙ্গার স্ত্রী; সাঁওতালী ও অন্য কোল পুরাণে এইরূপ কল্পনা আজকাল পাওয়া যায়। "সিঞ্"='আলো, বা দিন, বা সূর্য্য', "ঞিন্দা"='আঁধার, বা রাত'; এই দুইটি প্রাচীন কোল শব্দের মূল অর্থ এখনও সাঁওতাল সমস্ত-পদ "সিঞ্-ঞিন্দা"-তেও মুণ্ডারী "ঞিন্দা-সিঙি"-তে মিলে—"সিঞ্-ঞিন্দা" ও "ঞিন্দা-সিঙি" মানে 'দিন-রাত', 'অনবরত'। মূল কোল-জাতির কল্পনায়, আমাদের 'আলো-ও-ছায়া শিব-শিবানী'র মতো ঐশী শক্তির দুইটি বিকাশ রূপেই, জ্যোতিঃ ও তমঃ অনুভূত হইয়াছিল, ইহা এই শব্দ দুইটি হইতে অনুমান করা অসংগত হইবে না। যাহা হউক, সিঙ্-বোঙ্গার কল্পনায়, যে-কোন সভ্য সমাজের উপযোগী একটি দেব-কল্পনায় কোল-

জাতি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। প্রধান দেবতা সিঙ্-বোঙ্গা এবং নানা অপ্রধান বোঙ্গা বা দেবতা ব্যতীত, কোলদের মধ্যে পিতৃপুরুষ বা প্রেতগণের সম্বন্ধেও বিশ্বাস আছে, এবং এই পিতৃপুরুষদের পূজার অনুষ্ঠানে কবিত্বময় বা কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কোলদের মধ্যে ধার্মিক ও সামাজিক জীবনে নানা হিন্দু ভাব ও অনুষ্ঠান প্রবেশ করিয়া গিয়াছে, এবং এখন ইহাদের মধ্যে খাঁটি কোল জিনিস পৃথক্ করিয়া বিশ্লেষ করা কঠিন। আবার ওদিকে লৌকিক বা গ্রাম্য হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে, কোল (বা প্রাচীন দাক্ষিণ জাতির) জগৎ হইতে লব্ধ বহু ব্যাপার যে নিজ স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

'সভ্যতা' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, অর্থাৎ পার্থিব-বস্তু-নিষ্ঠ যান্ত্রিক সভ্যতা, যাহাব ফলে বড়ো-বড়ো বাড়ি-ঘর, মন্দির-ইমারত, উচ্চ কোটির শিল্প, সাহিত্য, নাট্য,দর্শন, বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি—তাহা কোলদের নাই; কিন্তু স্বকীয় প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকেব মধ্যে শান্তিতে ও মনের সুখে বাস করিবার উপযোগী মানসিক সংস্কৃতি তাহাদের আছে, তদুপযোগী সাধনও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ভাষার সঙ্গে ও সমবেত জীবনের সঙ্গে এই সংস্কৃতি জড়িত। কোল জীবনে বিভিন্ন ঋতুতে পর্ব ও অন্য অনুষ্ঠান, তাহাদের হাট ও মেলা, তাহাদের নাচের রীতি, তাহাদের বাঁশী ও মাদল বাজানো এবং গান, তাহাদের সরল এবং আদিম মণ্ডন-শিল্প, তাহাদের ফুল ও রঙের প্রতি প্রীতি, বংশানুক্রমে প্রবাহিত তাহাদের গান কবিতা ছড়া ও রূপ-কথা এবং পুরাণ-কথার ধারা, এবং চারিদিকের আরণ্য প্রকৃতির সম্বন্ধে তাহাদের মনঃকল্পিত ভাবজগৎ ও চিত্তেব রসানুভূতি—এই-সমস্তের মাধ্যমে এই সংস্কৃতি সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই-সমস্ত জীবনধারা ও ভাবধারাই ইহাদের জীবনকে ইহাদের নিকটে শোভন ও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্তকে নষ্ট করিয়া দিয়া, যদি কেবল ভৌতিক বা পার্থিব 'সভ্যতা', যাহার এক মুখ্য আবেদন হইতেছে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি, তাহা আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সভ্যতার মধ্যেও মানুষ বর্বর হইয়া পড়ে। এরূপ 'সুসভ্য বর্বর' ইউরোপে ও আমেরিকায় দুর্লভ নহে, ভারতেও দুর্লভ নহে; এই বর্বরেরা ধন এবং ধনায়ত্ত শক্তি ব্যতীত আর

কিছু-ই বুঝে না। কিন্তু কোলদের জীবন, তাহার সেই আদিম অবস্থায় আর থাকিতে পারিতেছে না। বাহিরের জগৎ—তাহাদের দেশে অর্থগৃধ্নু হিন্দু ও মুসলমান 'দিকু'-দের দলে-দলে আগমন, এবং খ্রীষ্টান মিশনারিদের বহুস্থলে অজ্ঞ ও অন্ধ (এবং কচিৎ রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক) ধর্মপ্রচারের তাগিদ—তাহাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে।

বিশেষ ভাবে সজ্ঞান এবং দলগতস্বার্থ-প্রণোদিত সক্রিয় চেষ্টা না থাকিলেও, হিন্দু ভাবধারা সহজ ভাবে ধীরে-ধীরে কোলদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—হিন্দু প্রতিবেশীদের দেখাদেখি কোলেরা তাহাদের অনেক কিছু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে কোল-জীবনের প্রতিষ্ঠায় বা বুনিয়াদে আঘাত পড়ে নাই। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের আগমনে তাহা হয় নাই। বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে (এই শ্রেণীর সমস্ত ধর্মমতেই এটি দেখা যায়) একটি সর্বরোচিত মনোভাব বিদ্যমান—পারমার্থিক সত্য তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি, পরমেশ্বর কেবল তাহাদেরই হাতে নিজেকে ধরা দিয়াছেন; সুতরাং, অন্য কোনও প্রকার ধার্মিক অনুভূতি তাহারা বুঝিবে না, বুঝিতে চেষ্টাও করিবে না, এবং নির্মম ভাবে তাহার ধ্বংস করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা হয় (ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় তাহা কেবল তাহারাই জানে, আর কেহ নহে), পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে আছে—ইউরোপীয় পার্থিব সভ্যতার দম্ভ, কোল প্রভৃতি আদিম আরণ্য সংস্কৃতির প্রতি প্রকট অথবা চাপা ঘৃণার ভাব। ইহার ফলে, অন্য নানা পশ্চাৎপদ জাতির মতো কোলদের সমূহ হানি হইয়াছে। হয়-তো তাহারা পার্থিব জগতে কতকগুলি সুখ ও সুবিধা পাইয়াছে; কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহাদের দুরপনেয় আত্মদৈন্য ঘটিয়াছে; এবং এই আত্মদৈন্যের অর্থ-ই হইতেছে আত্মাবনতি। আদিম জাতির মনোভাব যাহারা বুঝে না, সম্পূর্ণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্য উদ্ভূত অন্য প্রকারের ভাবজগৎ বা চিন্তাজগৎ এবং জীবন-পদ্ধতির কোনও-কোনও অংশ যাহারা একটি আদিম জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের হাতে কোলদের মতো জাতিকে ছাড়িয়া দেওয়া একটি অমার্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।

আমি নর-দেব বা ব্রহ্ম-নারায়ণ রূপে পূজিত মহাপুরুষ যীশু-খ্রীষ্টের শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতেছি না। Skrefsrud স্ক্রেফ্‌স্রুড্‌,

Hoffmann হফমান্, Bodding বডিং, Nottrott নোট্রোট্ প্রভৃতি জ্ঞানী ও পণ্ডিত পাদরিরা কোলদের ভাষার চর্চায় ও তাহাদের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সংরক্ষণে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা চিরকাল কোলদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন, কোলদের বন্ধুরাও তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দিবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহাদের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, প্রথম যুগে 'খ্রীষ্টান সভ্যতার প্রসার' যে রীতিতে হইতেছিল, তাহাতে, যাহাদের মধ্যে এই সভ্যতার প্রসার ঘটিত তাহারা আত্মসম্মানজ্ঞান হারাইত, নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসহায়, ইউরোপীয়দের প্রসাদ-পুষ্ট বলিয়াই ভাবিত ; এবং তাহাদের মধ্যে এই ধারণা আসিত যে, সাহেবদের আগমনের পূর্বে তাহাদের ইতিহাস হইতেছে আত্মঘাতী অজ্ঞতার ইতিহাস। সুখের বিষয়, মিশনারিদের অনেকে এখন স্থানীয় কোল পারিপার্শ্বিকের মূল্য উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার ফলে, নিজ ভাষা ও নিজ কোল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং নিজ গ্রামীণ সরল জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন এবং গৌরবভাব-পোষণকারী খ্রীষ্টান কোল, এবং নিজধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত অখ্রীষ্টান ও অহিন্দু কোলও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আত্মদৈন্য-মুক্ত কোল পুরুষ ও স্ত্রী, সকল সমাজের মানব কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দনের পাত্র।

উচ্চ কোটির মানসিক সংস্কৃতির পথে চলা কোলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে কোনও লিপিবিদ্যার উদ্ভাবন করে নাই, এবং অতি সাম্প্রতিক কালের পূর্বে প্রতিবেশী হিন্দুদের নিকট হইতেও কোনও লিপি গ্রহণ করে নাই। সেই হেতু তাহাদের সাহিত্যের সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন ব্যাহত হইয়াই ছিল। সম্প্রতি আত্মসম্মানবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জনৈক সাঁওতাল শিক্ষিত ব্যক্তি, রোমান লিপির অনুকরণে কতকগুলি চিহ্ন উদ্ভাবিত করিয়া, একটি সম্পূর্ণ নূতন 'কোল-লিপি' তৈয়ারী করিয়াছেন, এই লিপির হরফও টাইপে ঢালা হইয়াছে, দুই একখানি বইও ইহাতে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই লিপি গৃহীত হয় নাই—হওয়া সম্ভবপরও নহে, এবং রোমান ও বাঙ্গালা লিপির পাশে এই নবীন লিপির প্রচলনের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই—ইহাতে অনাবশ্যকভাবে একটি নূতন জটিলতা আসিবে মাত্র, তাহাতে কাহারও কোনও উপকার হইবে না, বরঞ্চ কোলদের অন্য সম্প্রদায় হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া দিয়া এই নবীন লিপি তাহাদের সমূহ অপকারই করিবে।

খ্রীষ্টান মিশনারিরা প্রথমটায় বাঙ্গালা ও নাগরী এবং উড়িয়া লিপিতে ও পরে রোমান লিপিতে তাহাদের ভাষা লিখিয়া, তাহাতে সাহিত্য-সৃজন ও সাহিত্য-সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। সজ্ঞান বা সচেতন ভাবে সাহিত্য-সর্জনার পথে তাহাদের সংস্কৃতি এখনও চালিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গান-বাঁধা ও গল্প-বলার রীতি বিশেষভাবে বিদ্যমান। স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষ মাদল ("তুমাং") ও উন্মাদনাকর বাঁশের বাঁশরী বাজাইয়া নাচ ও গান ইহাদের জীবনের এক সুন্দর রীতি। পাদ্রি নোট্রোট্, পাদ্রি হফমান, এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের মুণ্ডারী গীতির সংগ্রহ ও অনুবাদের সাহায্যে বাহিরের জগতের কাছে এই আদিম ও সুমধুর প্রকৃতি-বিষয়ক এবং প্রেম-বিষয়ক কবিতার উৎসমুখ উন্মোচিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার রস আস্বাদন করা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর হইয়াছে। W. G. Archer আর্চর সাহেবের চেষ্টায়, মুণ্ডারী খাড়িয়া সাঁওতালী ও হো ভাষায় চারি খণ্ডে যে কোল জাতির কয়েকটি বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত গীতি-কবিতার সংগ্রহ বিহার প্রাদেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রাচীন ভারতের আর্য্যদের গীতি-কবিতার ও ছড়ার সংগ্রহ ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের সহিত তুলিত করা যায়; এইরূপে সংগৃহীত অভিনব সমগ্র 'কোল্ল-বেদ-সংহিতা'-র ইংরেজী অনুবাদ (মূলের সহিত) বাহির হইলে, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি মূল্যবান্ কার্য্য সাধিত হইবে। সাঁওতালীদে অনুরাগী বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দ্বারাও দুই-দশটি সাঁওতালী গান সংগৃহীত ও অনূদিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঁওতালের চিত্ত সংগীত-রস-রসিক বটে, কিন্তু সাঁওতাল নিজের মানসিক প্রকাশ গান বা কবিতা অপেক্ষা মনে হয় যেন কথা ও কাহিনীতেই বেশী-করিয়া করিয়াছে। এ হিসাবে মুণ্ডারা গীতি-কবিতার রাজা। মুণ্ডারী ভাষায় রচিত কতকগুলি গান, সরল ও আদিম কবিতার অতি মনোহর নিদর্শন রূপে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। চীনাদের ও জাপানীদের মধ্যে প্রকৃতির সম্বন্ধে যে ধরণের স্পর্শকাতরতা দেখা যায়, ইহাদের কবিতাতেও সেরূপ ভাব বিরল নহে। ভারতীয় কাব্যোদ্যানে ইহাদের কতকগুলি প্রেমের কবিতা হইতেছে কোমলবর্ণময় ও সুমধুর-সৌরভযুক্ত পুষ্প। এইগুলির মধ্যে কথোপকথন-মূলক দুই-পাঁচটি কবিতা আছে, সেগুলির মধ্যে নিহিত

বন ও পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের অশিক্ষিত কলাকৌশল এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্বভাবজাত কারুকার্য্য, ভাবের সারল্য ও শুদ্ধি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কতকগুলি কোল (মুণ্ডারী) ভাষার পদ দেওয়া হইতেছে।

১। চিকান্ বাহা বাহা-লেনা-ম্ মাইঁ ?
বাহা বাহা সোআনাম্।
চিকান্ দাণ্ডিঃদ্ দাণ্ডিঃদ্ লেনা-ম্ মাইঁ ?
দাইলি দাইলি সিরিন্‌জাম্।

২। বাহাতে চি উমেম্-তানা-ম্ ?
বাহা বাহা সোআনাম্।
দাণ্ডিঃদ্-তে চি বেআরান্-তানা-ম্ ?
দাইলি দাইলি সিরিন্‌জাম্।

(পাদরি হফমানের সংগ্রহ হইতে)

১। "কোন্ ফুলে তুমি ফুটে' উঠেছ, কন্যা ?
তুমি যে ফুলের মতন সৌরভময়।
কোন্ ফুলেব গোছায তুমি বড়ো হ'য়ে উঠেছ, কন্যা ?
ফুলের গোছার মতো তুমি সৌরভে ভ'রে উঠেছ।

২। (কি বা) তুমি কি ফুলের মধ্যে স্নান ক'রে থাকো, কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের মতন সৌরভময় ?
(কি বা) তুমি কি ফুলেব গোছার মধ্যে নেযে থাকো, কন্যা,
(যে) তুমি ফুলের গোছার মতো সৌরভে ভ'রে উঠেছ ?"

আর একটি কবিতায় মুণ্ডা প্রেমিক যুবা তার প্রেমের পাত্রী কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে (কবিতাটি স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় সংগ্রহ করেন ও ইংরেজী কবিতায় ইহার অনুবাদ করেন)—

বো তামা রিসা রিসা
সুপিদ্-কেদাম্ রাঙ্গা নাচা,
ঞিল্দা-সিণ্ডি, বাগে-ম্ গুতুতানা,
নামা নাগেন্ জিগে জিতানা॥

আন্দু তাদা-ম্, সাকোম্ তাদা-ম্,
হোতোরে দো হিসির্-মেনা,
পোলা-তা-ম্ দো চিল্কা সারিতানা,
নামা নাগেন্ জিগে লোতানা ॥

"ঢেউ-খেলানো চুলের ভারে তোমার মাথা কি সুন্দর,
লাল দড়ীতে মাথার চুল কেমন গোল খোঁপায় বাঁধা !
রাত-দিন, তুমি ফুলের মালা গাঁথো—
তোমার তরে আমার মন পোড়ে, আমার হৃদয় কাঁপে ॥
তোমার হাতে কাঁকন আর তাড় কেমন সুন্দর দেখায়,
তোমার গলা বেড়ে আছে কি সুন্দর হাঁসুলি !
তোমার পায়ে 'পোলা' কি সুন্দর ঝুমঝুম করে,
তোমারে তরে আমার মন দহে, ভয়ে কাঁপে ॥"

নীচের মুণ্ডারী কবিতাটিতে প্রথম অংশ কুমারীকন্যা তাহার প্রেমাস্পদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, এবং দ্বিতীয় অংশ হইতেছে যুবকের উত্তর—

(কুড়ি) নাতা-মাতা বির্-কো তালারে, নালোহোম্ নিরূজা বাগিঙ্গা,
রামেকান্ মারেচারে, নালোহোম্ নজর রারাইঙ্গা।
কাচিহোম্ এেলে লেদিঙ্গা, সেঙ্গেল্-লে কাইঙ্ [illegible]লেতান্‌রে?
কাচিহোম্ চিনা লেদিঙ্গা, দাঃক্-লে কাইঙ্ লিঙ্গিতান্‌রে?
(কোড়া) কাগে চোআইঙ্ এেলেজাদ্‌মে, নোতে-রে দো নোতে হুদ্‌গার্
কাগে চোআইঙ্ চিনাজাদ্‌মে—সিঙ্-মা-রে দো সিঙ্-মা
কোআঁসি।

"(কুমারী) গহন বনের মধ্যে, কুমার, তুমি পালিয়ে যেও না,
আমাকে ফেলে যেও না।
এই বিশাল তেপান্তর মাঠের মাঝে, কুমার,
আমাকে ফেলে পালিয়ে যেও না।
আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার,
যখন আমি আগুনের মতো জ্ব'লে উঠি?

আমাকে কি তুমি দেখ নাই, কুমার,
যখন আমি জলের মতো গ'লে যাই ?
(কুমার) সত্যই আমি তোমায় দেখি নি,
কারণ তখন পৃথিবী জুড়ে' ছিল ধুলা আর আঁধি ;
সত্যই আমি তোমায় দেখি নি,
কারণ আকাশে তখন ছিল মেঘের মতো কোয়াসা ॥"

শিকারের আনন্দ নীচের কবিতাটিতে সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে (শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদ হইতে)—

"ঐ মহুয়া গাছের তলায় ঐ রে ঐ হরিণ-শিশু চরে ;
বন-পথ দিয়ে নীচু হ'যে ব্যাধ যুবক চলে, হেঁট হ'য়ে চলে।
মহুয়ার মিষ্টি ফলেব লোভে হরিণ হোথায় আসে, হরিণ ঘোরে ;
হরিণের গায়ে বাণ বিঁধ্বার তবে ব্যাধ হঠাৎ দাঁড়ায় খাড়া হ'য়ে,
হাতে ধনুক নিযে ;
মহুয়ার ছায়ার তলে যায প'ড়ে হরিণ-শিশু. হঠাৎ পড়ে ;
ঐ শোনো, ব্যাধ খুশী গলায আনন্দেব ধ্বনি কবে,
খুশীর রা ক্বাড়ে ॥"

আনন্দের মধ্যেও যে দুঃখেব বীজ আছে, হরিষে বিষাদের ভাব এই রূপে মুণ্ডা কবি প্রকাশ করিতেছে—

একাসি-কো পিরি-রে দো রুতু-তেকো সেসেন্-তানা,
রুতু-তেকো সেসেন্-তানা,
তেরাসি-কো বাদিরে দো বানাম্-তেকো তুদাঙ্-তানা,
বানাম্-তেকো তুদাঙ্-তানা।
রুতু-তেকো সেসেন্-তানা, রুতু চুটিহুলাঃক্-জানা,
বানাম্-তেকো তুদাঙ্-তানা—বানাম্-দাণ্ডি দোরাঙ্-জানা
বানাম্-দাণ্ডি দোরাঙ্-জানা।

"একাশির টিলা-ভুঁইয়ে পথিকেরা যায় বাঁশীর সুরে, বাঁশীর সুরে ;
তিরাশির নামাল-ভুঁইয়ে পথিকেরা যায় দোতারার তালে,
দোতারার তালে।

বাঁশীর সুরে চলে তারা, হায়, বাঁশীর মুখ গেছে ভেঙে,
বাঁশীর মুখ গেছে ভেঙে ;
দোতারার তালে যায় গো তারা, হায়, দাণ্ডী তার হ'য়েছে চুর,
হ'য়েছে চুর ॥"

বিবাহের কন্যার মুখ দিয়া মুণ্ডা কবি ব'লিতেছে—

বা-তৈঙ্-মে গা নেআঙ্ বা-তৈঙ্-মে হো।
ডালি-তৈঙ্-মে গা নাপাঙ, ডালি-তৈঙ্-মে।
সারজোম্-বা-তে নে-আঙ্. বা-তৈঙ্-মে হো।
সুডা-সাংগেন্-তে গা নাপাঙ্ ডালি-তৈঙ্-মে ॥

"ওগো মা, ফুল দিয়ে আমায় সাজাও, ফুল দিয়ে সাজাও ;
বাবা গো, দাও মাথায় ফুলের মুকুট, মাথায় ফুলের মুকুট।
শালের ফুলে, মা গো, আমায় দাও সাজিয়ে ;
শালের কচি ডালে, বাবা গো, মুকুট বানাও আমার তরে,
মুকুট আমার তরে ॥"

নাচের আহ্বান করিয়া যখন মাদলে ঘা পড়ে, তখন কোল যুবক-যুবতীদের দেহে মনে যে সাড়া পড়িয়া যায়, বহু পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "পালামৌ"-তে তাহাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাটি এই নাচের রসে পরিপূর্ণ—

"কোট-কারাম্বুতে মাদল বাজে ;
আমার হৃদয় নাচে, ঐ আওয়াজে—ঐ আওয়াজে।
বারিগারায় করতাল ঝম্ঝম্ করে—
আনন্দে আমার হৃদয় যেন লাফ দেয়, যেন লাফ দেয়।
কোট-কারাম্বুতে মাদল বাজে—
ত্বরা করো, প্রিয়া আমার, চলো যাই নাচে, চলো যাই নাচে।
বারিগারায় খরতাল খন্খন্ করে—
ওঠো, প্রিয়া আমার, ছাড়ো উদাস ভাব, চলো যাই নাচে ॥"

সাঁওতাল যুবকও অনুরূপ ভাবে গায়—

"(মাদলের) বাজনা শুনে,
মন আমার যেন তাওয়ার তাপে তাতে ॥"

মুণ্ডারী ভাষার মতো সুন্দর-সুন্দর কবিতা সাঁওতালীতে তত বেশী পাওয়া যায় না। ছয়-সাত ছত্রের কবিতা মুণ্ডারীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সাঁওতালী কবিতা বেশীর ভাগ দুই ছত্রের, বড়ো জোর চারি ছত্রের; পাঁচ-ছয় ছত্রেরও অবশ্য দুর্লভ নয়। আজকাল মুণ্ডা ও সাঁওতাল কবিরা বড়ো-বড়ো কবিতা ও গান লিখিতেছেন। মালাই জাতির Pantum "পান্তুম্" কবিতার মতো, জাপানী Tanka "তান্কা" আর Uta "উতা"-র মতো, সাঁওতালীদের সাহিত্যিক বোধ বা অনুভূতি, এই-রূপ ছোট কবিতার মধ্যেই সীমিত। শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই-রূপ সাঁওতালী কতগুলি কবিতার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলির বাঙ্গালা অনুবাদও করিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি নিয়ে মুদ্রিত হইল। এইরূপ কবিতার সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথকেও খুশী করিয়াছিল, এবং Visvabharati Quarterly-র ১৯২৫ এপ্রিল সংখ্যায় সন্তোষ-বাবুর সংগ্রহ হইতে কতকগুলি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চারুলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ বি-এল্ মহাশয় "দেশ" পত্রিকাতে কতকগুলি সুন্দর সাঁওতালী কবিতার বঙ্গানুবাদ মূলের সহিত প্রকাশিত করেন। W. G. Archer আর্চর সাহেবের প্রকাশিত সংগ্রহও ইংরেজী অনুবাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এরূপ কয়েকটি সাঁওতালী কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে; এগুলিতে ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখের কথা বিশেষ অকপট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী বলিতেছে—

"আমি ভাত রাঁধি, আমি বেন্নন বাঁধি, ওর পাতে
খুব ঢেলে ঢেলে দিই।
তবুও বলে, এ বউ আমি ঘরে রাখ্‌বো না॥"

মাতৃহারা পুত্র মায়ের জন্য খেদ করিতেছে—

"হায় হায়, আগেকার দিনে
কোথাও থেকে আমরা ঘরে ফিরে আসার সময়ে
দোয়ারের ধারে মা থাকৃত ব'সে—
বাচ্ছা ময়নার মতো আমাদের পেয়ে আদর ক'রৃত॥"

শ্রীযুক্ত চারু-বাবুর সংগ্রহ হইতে দুইটি সাঁওতালী গান—

বুরুরে নাতাল্-বাহা, দলপ্-দলপ্ নাতাল্-বাহা।

জাহা লেকাতেইঞ্ তিয়কৃগিয়া হরিঞ্ চিপিরেঃ স্নুতদ কচেরেঃ
জাহা লেকারেইঞ্ বাহাইগিয়া।

"পাহাড়ের উপরে নাতাল ফুল, দুল্‌ছে নাচ্‌ছে নাতাল ফুল।
আমি সুন্দরী নই, খোঁপার দুই ধারে ফুল দোলে—
আমি সুন্দরী নই, কিন্তু ঐ ফুল চুলে আমি গুঁজ্‌বো॥"

নাদ্-দ কিসাঁড়্-হপন্ নিঞ্-দ রেঙ্গেঃচ্
হপন্ চেকা লেকাতে-ম্ বুলাও।
কিদিঞ্ নালো সারিম্ রাগ, সারিনালো,
সারিম হমরা, বানা হড্-গে চংলাং সমান্‌গিয়॥

"(কন্যা) ধনীর ছেলে তুমি, গরীবের মেয়ে আমি,
কি ক'রে আমায় ভোলালে?
(তরুণ) কেঁদো না, মনে ব্যথা পেয়ো না,
আমরা দুজনে দুজনার সাথী॥"

মনে হয়, জীবনের সব দিক্ লইয়া টুকরা-টাকরা অভিজ্ঞতা বা চিত্রাঙ্কন সাঁওতালদের কবিতায় অধিক করিযা পাওয়া যায়। অনুষ্টুপ্ বা গাথা ছন্দে রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতায়, প্রাচীন তমিল পদে, হিন্দীর দোহায়, অনেক সময়ে বাচংযমতার সঙ্গে প্রেম বা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা জীবনের কোনও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কবির দর্শন বা উপলব্ধির যে প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, সাঁওতালী, মুণ্ডারী প্রভৃতি কোল-ভাষার ছোট-ছোট কবিতা যেন সেই পর্য্যায়ের।

আজকালকার বিভিন্ন গণের কোল ছেলেমেয়েরা (কি মুণ্ডারী, কি সাঁওতাল, কি হো) তাহাদের প্রাচীন গানগুলি ভুলিতে বসিয়াছে। তবে কোল-সমাজের বাহিরের—ভারতীয় ও ইউরোপীয়—সাহিত্য-রসিকদের আলোচনার ফলে, শিক্ষিত কোল দুই-চারিজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে দরদ আসিতেছে। কিন্তু ইহার চেয়ে আবশ্যক বা প্রার্থিত হইতেছে এমন ব্যবস্থা, যাহাতে অশিক্ষিত কোল জনসাধারণ নিজেদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত এই রিক্থ হেলায় হারাইয়া না ফেলে। এজন্য আবশ্যক, তাহাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং শান্তিময় জীবনযাত্রা। কিন্তু এই দুইটি বস্তু এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

কোল জাতির পুরাণ-কথা ও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত গল্প ও কাহিনী আংশিক ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। সাঁওতালদের মধ্য হইতেই বেশী করিয়া এই-সব কথা ও কাহিনী পাওয়া গিয়াছে, এবং দুমকার স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারিদের চেষ্টাতেই কয়েক খণ্ডে এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০-৭১ সালে স্কাণ্ডিনেভীয় মিশনারি Rev. L. O. Skrefsrud স্ক্রেফ্‌সৃরুড সাহেব, কলেয়ান (কল্যাণ) নামে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল 'গুরু' অর্থাৎ পুরোহিতকে পান, এবং তাহার নিকট হইতে সাঁওতালদের পুরাণ-কথা ও জীবন-যাত্রার পদ্ধতি এবং সামাজিক রীতিনীতির কথা যাহা শুনেন তাহা লিখিয়া লন, ও ১৮৮৭ সালে মূল সাঁওতালী ভাষায় রোমান অক্ষরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন—এই বইয়ের নাম দেন "হড্‌কো-রেন্‌ মারে-হাপ্‌ড়াম্‌-কো-রেআঃক্‌ কথা" অর্থাৎ 'সাঁওতালদের পূর্বপুরুষদের কথা'। এই বইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, ইহা শুদ্ধ সাঁওতালীর মূল্যবান্‌ নিদর্শন, এবং ইহা একাধারে সাঁওতাল পুরাণ ও স্মৃতি-গ্রন্থ। ১৯৬১ সালের ভারতের জন-গণনার অধিকর্তা শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র আই. সী. এস-এর চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হাঁসদাঃক্‌ কর্তৃক এই বইয়ের এক সুন্দর বাঙ্গালা অনুবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঁওতাল জাতির পুরাণ-কথা ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুরূপ আর একখানি মূল্যবান্‌ সংগ্রহ-গ্রন্থ ("খেরওয়াল-বংশ-ধরম-পুথি") বাঙ্গালা অক্ষরে সাঁওতালী ভাষায় প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে সিংহভূম জেলার ঘাটশিলার অন্তর্গত আড়ু-কাড়ুয়াকাটা গ্রামের স্বর্গীয় রামদাস টুডু রেস্কা কর্তৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে রামদাস টুডুর আঁকা কতকগুলি ছবি কাঠ-খোদাইয়ে ছাপা হয়। বইটি এখন প্রায় অপ্রাপ্য। ধলভূম-রাজের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তীর আগ্রহে ১৯৫১ সালে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ, আমার একটি ক্ষুদ্র ভূমিকার সহিত, পূর্ববৎ বাঙ্গালা অক্ষরে ঘাটশিলা হইতে প্রকাশিত হয়। রামদাস টুডু প্রায় একশত বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। দ্বিতীয় সংস্করণেও তাহার আঁকা কতকগুলি ছবি ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই বইয়ের তেমন প্রচার হইল না, ইহার বাঙ্গালা বা ইংরেজী অনুবাদও বাহির হইল না।

এই দুইখানি বই ছাড়া, নরওয়ের মিশনারি পরলোকগত Rev. P. O. Bodding বডিং সাহেব, Kristiania ক্রিস্তিয়ানিয়া (পরে Oslo অস্‌লো) নগর হইতে কয়েক খণ্ডে সাঁওতালী উপাখ্যান, ইংরেজী অনুবাদ সমেত রোমান অক্ষরে মূল সাঁওতালীতে প্রকাশিত করিয়াছেন। বডিং সাহেব সাঁওতালদেব জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধও লিখেন। মুণ্ডাদের কথা লইয়া রোমান-কাথলিক পাদরি Hoffmann হফ্‌মান সাহেব ১৪ খণ্ডে বিরাট্ এক মুণ্ডারী বিশ্বকোষ Encyclopaedia Mundarica পাটনা হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯৩০-৩২ সাল)।

বডিং সাহেবের সাঁওতালী গল্পের সংগ্রহের কতক অংশের ইংরেজী অনুবাদ ১৯০৯ সালে সিভিলিয়ান Cecil Henry Bompas বম্পাস কর্তৃক Folklore of the Santals নামে লণ্ডন হইতে প্রকাশিতহইযাছিল। Rev. Dr.A. Campbel ক্যাম্প্‌বেল নামে আর একজন মিশনাবি ১৮৯১ সালে কতকগুলি সাঁওতালী কাহিনী প্রকাশ করেন। এই-সমস্ত সংগ্রহের সব গল্পগুলিই কিছু লক্ষণীয় নহে। কতকগুলি গল্প ভারতের সাধারণ সম্পত্তি—জাতক, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের মতো পশুপক্ষীকে অবলম্বন করিয়া নীতিকথা; কতকগুলি আবার সাধারণ রূপকথা,যাহা বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি আর্য্য-ভাষাতেও পাওয়া যায়। কতকগুলি গল্প বিশেষ ভাবে সাঁওতালদেব জীবন লইয়া। এই-সমস্ত গল্পের মধ্যে সব-চেয়ে লক্ষণীয় এবং চিত্তগ্রাহী হইতেছে বোঙ্গাদের লইয়া কতকগুলি গল্প, যেগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক। এই ধরণের গল্পই বেশী সংখ্যায় মিলে—একদিকে মানব তরুণ তরুণী, অন্যদিকে "বোঙ্গা-কুড়ি" বা "বোঙ্গা-কোড়া" অর্থাৎ দেবকন্যা বা দেবকুমার—এবং ইহাদের মধ্যে ভালোবাসার কথা লইয়া গল্প। এইরূপ গল্পের কাঠামো বা মূল কথাবস্তু মাত্র দুই-চারি প্রকারের পাওয়া যায়। একটি সাধারণ কথাবস্তু হইতেছে এই ধরণের—সখীদের সঙ্গে সাঁওতাল-কন্যা বনে গিয়াছে শাক-পাতা তুলিতে। সেখানে এক তরুণ বোঙ্গার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ। এই বোঙ্গা-কোড়া বাস করে পাহাড়ের গুহায়। কন্যা তাহার পত্নীরূপে সেখানে গিয়া তাহার সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে থাকে। কিন্তু তাহার আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে এই বোঙ্গা-সঙ্গ প্রীতিকর না লাগায় তাহাদের চেষ্টা হয়, যাহাতে বোঙ্গাকে মারিয়া ফেলিয়া বা তাহাকে ঠকাইয়া, কন্যাটিকে আবার ঘরে ফিরাইয়া

আনিতে পারে। কখনও-কখনও তাহারা কৃতকার্য্যও হয়। কিন্তু বোঙ্গা তাহার মানবী স্ত্রীকে ছাড়িবে না—কন্যা বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত হয় ও প্রাণত্যাগ করে, এবং এইরূপে মৃত্যুর পরে বোঙ্গা-লোকে গিযা তাহার বোঙ্গা-পতির সহিত মিলিত হয়। আবার এই ধরণের গল্পও কতকগুলি পাওয়া যায়—তরুণ সাঁওতাল রাখাল, পাহাড়ের কোলে বনে গোরু মহিষ চরাইতেছে। জ্যোৎস্নার রাত্রে বনের মধ্যে সে বাঁশী বাজাইতেছে। বোঙ্গা-কন্যা তাহাকে দেখিয়া, তাহার প্রেমে পড়ে, সুন্দরী মানব-কন্যার রূপে আসিয়া তাহাকে দেখা দেয়। ইহা যেন প্রাচীন বৈদিক উর্বশী ও পুরূরবাঃ, গ্রীক পুরাণ-কথার দেবী Aphrodite আফ্রোদিতে ও রাখাল রাজপুত্র Ankhises আঙ্খিসেস্, এবং টিউটনিক জাতির Valkyrie বা রণদেবী Alvit আল্‌ভিট্ ও তরুণ কারু-শিল্পী Weland রেলাণ্ড-এর কাহিনীর অনুরূপ সুন্দর ও কাব্যময কাহিনী। সাঁওতালী উপাখ্যানের বোঙ্গা-কন্যা একটি পাহাড়িয়া নদীর উৎসের মধ্যে বাস করে। সাঁওতালী কথাকার, উৎসটির ছোট একটুখানি বর্ণনাময় চিত্র দিয়াছেন—'বোঙ্গা-কন্যার বাসস্থান উৎস-মুখের তীরে, গাছে প্রচুর লালরঙ্গের সুগন্ধময় আকাড ফুল ফুটিযা আছে।' বাখাল তরুণ জলে নামে, গাছ হইতে কন্যার জন্য ফুল তুলিবার উদ্দেশ্যে। জলে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই রাখাল বোঙ্গা-কন্যার শক্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে—কন্যা যেন কোনও জাদুমন্ত্রে তাহার প্রেমিককে সম্মোহিত করিয়া, জলের ভিতরে লইয়া যায়, ও নিজেদের বোঙ্গা-লোকে আনিয়া উপস্থিত করে। সেখানে বোঙ্গাদের বসিবার আসন হইতেছে কুণ্ডলী-পাকানো বড়ো বড়ো সাপ, এবং থাবা পাতিয়া বসা বাঘ আর চিতা হইতেছে বোঙ্গাদের শিকারের কুকুর। বোঙ্গারা মাঝে-মাঝে এই-সব কুকুর লইয়া বনে শিকার করিতে যায়, তাহাদের শিকারের পশু হইতেছে বনের ভিতরের কাঠুরিয়া মানুষ। কচিৎ সাঁওতাল তরুণ বোঙ্গা-লোক হইতে মানব-লোকে ফিরিয়া আসে, এবং সাধারণ মানুষের মতো আর পাঁচজনের সঙ্গে বাস করে, বিবাহও করে, কিন্তু তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর সহিত মাঝে-মাঝে সে বনের ভিতরে অথবা পাহাড়িয়া নদী বা পুষ্করিণীর তলে গিয়া মিলিত হয়। তাহার বোঙ্গা-স্ত্রীর অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির প্রভাবে সেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ হয়, এবং সে

জনসমাজে সম্মানিত "জ্ঞান-গুরু" বা ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া দাঁড়ায়, ও সকলের সম্মানের পাত্র হয়, অর্থশালী হয়। প্রাচীন রোমের পুরাণ-কথায় উৎস-বাসিনী দেবী Egeria এগেরিয়ার উপাখ্যান আছে, ইনি রোমের রাজা Numa নুমার পত্নী হন, এবং ইঁহারই প্রসাদে নুমা ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন—এই সাঁওতালী উপাখ্যানও ঐ ধরণের।

বোঙ্গাদের কখনও-কখনও দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে-ছোকরার ভাবে দেখা হয় —ইহারা নানাভাবে মানুষকে বিপদে ফেলিয়া বা অপদস্থ করিয়া আনন্দ পায়। কিন্তু মানুষও কখনও-কখনও ইহাদিগকে নিজ বুদ্ধিবলে কায়দায় আনিতে পারে। মধ্য-যুগের উত্তর-ইউরোপে বামন দেবযোনির সম্বন্ধে যে-সমস্ত গল্প আছে, এই সাঁওতালী গল্পগুলি তদনুরূপ। বোঙ্গাদের এই প্রকারের চরিত্র-কল্পনার পিছনে, হয়-তো সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন Austric বা দাক্ষিণ জাতির আগমনের পূর্বে ভারতে যে বামনাকার Negroid নিগ্রোবটু জাতি বাস করিত, তাহাদেব স্মৃতি বিদ্যমান আছে। ভারতে বৈদিকযুগে আর্য্যগণ বনের অধিষ্ঠাত্রী "অরণ্যানী দেবী"-কে দেখিয়াছিলেন; এখন সুন্দরবন অঞ্চলের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কাঠুরিয়া ও কৃষক, "বন-বিবি"র কল্পনা করে। বৈদিক আর্য্যের কল্পনায়, বন, পর্বত, হ্রদ সমস্ত ছিল দেবতাদের অধ্যুষিত, অপ্সরা ও গন্ধর্বদের বিচরণভূমি। প্রাচীন গ্রীকেরা Dryad বা বৃক্ষকাদেবী, Naiad অর্থাৎ অপ্সরা বা জলদেবী, এবং Nereid বা সাগরদেবীদের অধিষ্ঠান সর্বত্র দেখিত; তাহাদের চোখে, বনের মধ্যে Pan পান্-দেব এবং Dionusos দিওনুসস্ ও তাঁহার গণ, Satyr "সাতিব" নামে আরণ্য অর্ধ-পশু-অর্ধ-মানব-দেবযোনি ও Bacchante অর্থাৎ দিব্যোন্মাদযুক্ত রমণীবৃন্দ বিচরণ করিত। কোল-জাতীয় লোকেরা তেমনি বনে, পাহাড়ে,নদীতে, জলাশয়ে,বোঙ্গা-কোড়া ও বোঙ্গা-কুড়িদের দেখিত, এখনও দেখিয়া থাকে। তাহাদের ছোট-ছোট গ্রাম ঘিরিয়া, মধ্য- ও পূর্ব-ভারতের অনাদিকালের অরণ্যে, এখনও এই-সব দেবযোনির বাস তাহাবা দেখে। মুণ্ডা দেবলোকের এই-সমস্ত দেবতার খবর শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় দিয়াছেন;—"বুরু-বোঙ্গা", ইনি পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা বোঙ্গা (ইঁহার এক সাধারণ নাম "মারাঙ্-বুরু" অর্থাৎ 'মহাগিরি'—আজকাল কোনও-কোনও অঞ্চলে সাঁওতালেরা "মারাঙ্-বুরু"-কে শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে); "ইকির্-বোঙ্গা"—গভীর জলের মধ্যে ইঁহার বাস, "নাগা-

বোঙ্গা"—টিলা-ভূমি ও পাহাড়ের খদ ইঁহার বিচরণ-স্থান, "দেসৌলি-বোঙ্গা"—ছায়াশীতল তরুবহুল সুন্দর বনভূমি ইঁহার বাস-স্থান; "চন্দর-ইকির-বোঙ্গা"—ইঁহার নিবাস স্ফটিকোজ্জ্বল-জল-ময় ঝরণার তীরে, এবং "চান্দি-বোঙ্গা"—ইঁহার বেদি হইতেছে কুঞ্জবনে, খোলা মাঠে ও পাহাড়ের মাথায়।

সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনার উপযোগী করিয়া, কোল ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে একটি discipline অর্থাৎ বিশেষ ধরণের মানসিক ব্যায়াম বা পরিপাটী বা কসরৎ অথবা শ্রমসাপেক্ষ শিক্ষা রূপে ধরা যায়। নূতন মানবিকতার বা মানব-প্রীতির দৃষ্টি লইয়া আমাদের দেশের Aborigines অর্থাৎ আদিবাসী বা ভূমিপুত্রদেব জীবনেব প্রতি অবলোকন করা আরম্ভ হইয়াছে—ইহা এই যুগের নৃতত্ত্ববিদ্যার আলোচনার একটি লক্ষণীয় সুফল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, Verrier·Elwin ভেরিযার এল্‌উইন, শ্যামরাও হিবলে, W. G. Archer আর্চর, ইঁহারা এই কাজে পদপ্রদর্শক বা পথিকৃৎ। ভারতের আদিম জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনও অংশ এই অবলোকন এবং আলোচনা হইতে বাদ দিলে চলিবে না। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী—ইহাদের ভাষার মাধ্যমেই প্রধান বা মুখ্য প্রকাশ লাভ করে। কোল-জাতিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তাহাদের ভাষায়; মানুষের চিন্তার ধারা এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে ইহাতে প্রবাহিত দেখা যায—কোল-ভাষার গতি বা ধারা, আর্য্য বা দ্রাবিড় ভাষার ধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের একটি আদিম বা প্রাচীন জাতির মনোভাবের পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। কোল-ভাষার কতকগুলি রীতি মৈথিলী, মগহী, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষাতেও সংক্রামিত হইয়াছে। তাহার বিচার করিতে গেলে, এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাশ্রয়ী সংস্কৃতির পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, কোল-জগতের খবর লওয়া অপরিহার্য্য ॥

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৩]

তাও

ঋষি Lao Tsi লাও-ৎসি* চীনদেশে খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের কিছু পূর্বে আবির্ভূত হন। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতক মানব-চিন্তার ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় যুগ। এই সময়ে ভারতে উপনিষদের যুগের প্রসার ও অবসান; ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের দর্শন লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। বুদ্ধ ও মহাবীর এই সময়ে ও ইহার অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হন; পারস্যে ঋষি Zarathushtra জরথুশ্ত্র (জরথুষ্ট্র) বা Zoroaster জোরোআস্তের্ দেখা দিয়াছেন; য়িহুদী ভাববাদীদের কেহ কেহ এই সময়ে আবির্ভূত হন; এবং প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরাও এই সময় হইতেই প্রকট হইতে আরম্ভ করেন। ৬০৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে উত্তর-চীনে লাও-ৎসির জন্ম হয়—তখন চীনা জাতি ও চীনা সভ্যতা উত্তর-চীনে Hwang-ho হ্বাঙ্-হো বা পীত-নদীর উপকূল আশ্রয় করিয়া ছিল, মধ্য বা দক্ষিণ-চীনে, Yang-tsze-kiang য়াঙ্-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীর কূলে ও তাহার আরও দক্ষিণে Si-kiang সী-কিয়াঙ্ নদীর তীরে প্রসৃত হয় নাই। ইঁহার তিরোভাবের সময় জানা যায় না; জীবনের কথাও বেশী সংরক্ষিত হয় নাই। চীন-দেশ অর্থাৎ উত্তর-চীন ঐ সময়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। লাও-ৎসি এইরূপ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজকীয় ঐতিহাসিক স্বরূপ, রাজ্যের গোপন বা রাজকীয় কাগজ-পত্রের অধিকারী ছিলেন; প্রাচীন ভারতের ভাষায়, 'পুস্তপাল' ছিলেন। 'কাগজ-পত্র' না বলিয়া, 'বংশ-ফলক'-সমূহের অধিকারী বলা উচিত, কারণ তখন কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদিও উত্তরকালে চীনারাই এই অত্যাবশ্যক বস্তুর আবিষ্কার করে; এবং চীনারা লিখন-কার্য্যে ভারতবাসীদের মতো ভূর্জত্বক্ বা তালপত্র বা অন্য কোনও 'পত্র' ব্যবহার করিত না, গ্রীক ও পারসীকদের মতো 'পুস্ত্' বা মেষচর্মও ব্যবহার করিত না, মিসরীয়দের মতো papyrus 'পাপিরস্' অর্থাৎ জলজ উদ্ভিদ্-বিশেষের বল্কলও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল; তাহারা বাঁশের পাতলা বাঁখারি বানাইয়া লোহার লেখন দিয়া তাহাতে আঁচড় কাটিয়া

* নামটি নানাভাবে ইংরেজীতে লেখা হয়—Lau Tzu Lao Tse, Lao Tsze ইত্যাদি। প্রাচীন উচ্চারণ ধরিয়া আমি এই নামটি বাঙ্গালায় লাও-ৎসি রূপে লিখিলাম।

লিখন-কার্য্য সমাধা করিত, বাঁখারি বা বংশ-ফলকে উপর হইতে নীচে লেখা নামিত। লাও-ৎসি যে পণ্ডিত ছিলেন, তখনকার দিনের চৈনিক বিদ্যা বা শাস্ত্রে তাঁহার পূরা অধিকার ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীনকালের, তাঁহার পূর্ববর্তী চীনা দার্শনিকদের চিন্তাধারার অধিকারী তিনি ছিলেন, এবং তাঁহার নামের সহিত জড়িত 'তাও'-বাদ অন্ততঃ আংশিক ভাবে তিনি তাঁহার পূর্বজ পথিকৃৎদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত।

দার্শনিক পণ্ডিত অথবা চিন্তানেতা ঋষি বলিয়া জীবৎকালেই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। চীনদেশের সর্বপ্রধান ও সর্বজন-পূজিত চিন্তানেতা, ঋষিকল্প পণ্ডিত ও জ্ঞানী খুঙ্-ফু-ৎসি (Khung Fu-tsze, Confucius রূপে ইঁহার নাম ইতালীয় খ্রীষ্টান মিশনারিগণ কর্তৃক সপ্তদশ শতকে লাতীন ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে); তিনি ছিলেন লাও-ৎসির সমসাময়িক, লাও-ৎসি অপেক্ষা বয়সে তিনি বিশেষ নবীন ছিলেন। খুঙ্-ফু-ৎসির দার্শনিক চিন্তা, অন্তর্মুখিতা অপেক্ষা ব্যাবহারিকতার পরিপোষক ছিল। খুঙ্-ফু-ৎসি ছিলেন নীতিবিৎ সমাজ-সংস্কারক, শাশ্বত সত্তা বা সত্যের উপলব্ধি তাঁহার বিচার-পদ্ধতির বা আলোচ্য বস্তুর বাহিরে ছিল। লাও-ৎসি ঠিক ইহার বিপরীত ছিলেন; ব্যস্তবাগীশ সমাজ-সংস্কারক, যাঁহারা মানুষকে ভালো করিবার ভার নিজের কাঁধে লইয়া জগতে চলেন, লাও-ৎসি তাঁহাদের পথের পথিক ছিলেন না; সার সত্যের উপলব্ধিই মানুষের পরমার্থ, এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, রাজ্যের বা সংসারের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি পণ্ডিত এবং ধীর স্থির আত্মসমাহিত ব্যক্তি, একথা শুনিয়া খুঙ্-ফু-ৎসি একবার তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। লাও-ৎসি খুঙ্-ফু-ৎসির এই আগ-বাড়া হইয়া সমাজ-সংস্কারকের বৃত্তি ও উপদেষ্টার পদ গ্রহণ পছন্দ করেন নাই; অপরকে ভালো করিয়া বেড়াইবার চেষ্টা অপেক্ষা নিজের আত্মার সংস্কৃতি, শাশ্বত সত্যের জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ঈপ্সিত পন্থা ছিল। সেই জন্য তিনি নীতিবাগীশ খুঙ্-ফু-ৎসিকে একটু অসহিষ্ণুতার সহিত ধমকাইয়া দিয়াছিলেন; সংস্কারকের পদ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর মধ্যে যে যথার্থ সত্যের সাধনার পথে অন্তরায় স্বরূপ অনুচিত একটু আত্মশ্লাঘা আসিতে পারে, তাহা লাও-ৎসি ধরিয়াছিলেন,

হয়-তো খুঙ্-ফু-ৎসির মধ্যে তাহা লক্ষ্যও করিয়াছিলেন। সংস্কারক ও রাজনৈতিক খুঙ্-ফু-ৎসি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি লাও-ৎসিকে ঠিক-মতো বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; বাহ্য সাংসারিক জগৎ লইয়া ব্যস্ত সমাজ-রক্ষককে মুহূর্তের জন্য যেন অদৃশ্য জগতের একটা ঝলক আসিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল। খুঙ্-ফু-ৎসি বিচলিত হইয়া, তাঁহার নিজের সযত্ন-পোষিত মতের বিপরীত লাও-ৎসির মতবাদটিকে ঠিক ধরিতে না পারিয়া, অথচ তাহার মধ্যে একটা বড়ো কিছু আছে তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়া, লাও-ৎসির নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিমূঢ় ভাবে নিজের অনুগামী শিষ্যদের বলিলেন—"পাখিরা উড়ে, মাছ সাঁতার কাটে, বন্য পশু দৌড়াইয়া বেড়ায়। যাহারা দৌড়াইয়া বেড়ায়, ফাঁদ পাতিয়া তাহাদের ধরা যায়; যাহারা সাঁতার কাটে, তাহাদের জন্য জাল বোনা যায়; উড়ন্ত পাখির জন্য বাণ ছোঁড়া যায়। কিন্তু গগনবিহারী Dragon বা মহানাগ—সে যে কি করিয়া আকাশ-মার্গী হইয়া বায়ু-মণ্ডলে ও মেঘ-মণ্ডলে সঞ্চরণ করে, তাহা তো জানি না। আজ লাও-ৎসি-কে দেখিলাম। তিনি কি এই মহানাগের মতো?"

খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের বিখ্যাত চীনা ঐতিহাসিক Sze-ma Tsien স্‌স়্য-মা-ৎসিয়েন্ এই লাও-ৎসি-খুঙ্-ফু-ৎসি-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক অল্প কয়েকটি কথায় লাও-ৎসির যে জীবন-কথা লিখিয়া যান, তাহা ই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার সম্বন্ধে উত্তরকালে তাঁহার মতানুসারী দুই চারি জন অন্য দার্শনিক পরোক্ষ ভাবে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য ততটা নাই। যাহা হউক, স্‌স়্য-মা-ৎসিয়েন্-এর বৃত্তান্ত হইতে আমরা এই তথ্যটুকু পাই যে, লাও-ৎসি যখন অতি বৃদ্ধ হন, তখন স্বদেশের অবশ্যম্ভাবী নৈতিক অবনতি দেখিয়া, তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য চীনদেশের পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন Yin Hi য়িন্-হী নামে এক শুল্ক-গুল্ম বা চুঙ্গীর কর্মচারী তাঁহাকে বলেন—"মহাশয়, আপনি তো কোথায় চলিলেন ঠিক নাই; দয়া করিয়া আপনার শিক্ষা আমার জন্য পুস্তকাকারে লিখিয়া যান।" লাও-ৎসি তদনুসারে একখানি ছোট পুস্তিকা লিখিয়া অজ্ঞাত কোন স্থানে চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর কাল ও স্থান কেহ জানে না।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদে, অর্থাৎ ৫২৫-৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব বৎসরের মধ্যে কোনও সময়ে, তাঁহার পরলোকগমন ঘটে। তখন খুঙ্-ফু-ৎসির খুব প্রতিষ্ঠা—খুঙ্-ফু-ৎসির জীবৎকাল ছিল ৫৫৪-৪৭৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। চীনা জাতি ছিল মুখ্যতঃ ইহলোক-সর্বস্ব, আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা সমাজ-পরায়ণতা এই জাতির কাছে বেশী রোচক ছিল, অন্ততঃ বেশীর ভাগ লোকের কাছে; সুতরাং ঋষি লাও-ৎসির গভীর দার্শনিক চিন্তা চীনা জাতিকে ততটা প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই, যতটা খুঙ্-ফু-ৎসির সমাজ-সংরক্ষণ-বাদ করিয়াছিল। তথাপি, লাও-ৎসি যে পুস্তকখানি দিয়া গিয়াছেন,—অথবা যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি এখন লাও-ৎসির নামে চলিতেছে, তাহাকে চীনা জাতির শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্ জ্ঞানে বহু ভাবুক ও পণ্ডিত, চীনা জীবনের প্রধান আশ্রয় বলিয়া, অবলম্বন করিয়া ছিলেন ও আছেন; এবং নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে চীনা-দেশের বাহিরে ইহার প্রচারের ফলে, লাও-ৎসির নামেব সহিত জড়িত Tao-Teh-King "তাও-তেঃ-কিঙ্" বইখানি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুস্তক রূপে বিশ্বসাহিত্যে নিজ গৌরবময় আসন করিয়া লইযাছে, ও তৎসঙ্গে চীনা জাতির সংস্কৃতিব গৌরবকেও বাড়াইযাছে। সহৃদয হিন্দু পাঠক অকুণ্ঠিত চিত্তে এই বইকে আমাদের প্রধান বারোখানি উপনিষদের পাশে স্থান দিবেন, নিজ আধ্যাত্মিক সাধনায় অথবা আধ্যাত্মিক রস-আস্বাদনে এই বইয়ের উপযোগিতা স্বীকার করিবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য জাতিব ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। এক ইংরেজীতেই ইহার দশ বারোটি অনুবাদ মিলিবে। তন্মধ্যে এই বইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিবার জন্য সব-চেয়ে উপযোগী হইতেছে Lionel Giles-এর অনুবাদ—ইহা ক্ষুদ্রাকার পুস্তক, লাও-ৎসিব মূল বইয়ের অধ্যায়গুলি ইহাতে নূতন ভাবে বিষয়বস্তু ধরিযা সাজানো হইয়াছে, সুপরিচিত Wisdom of the East গ্রন্থমালায় উহা প্রকাশিত হইযাছে। এতদ্ভিন্ন, Paul Carus-এর অনুবাদ আছে, উহাতে চীনা মূল, আধুনিক চীনা উচ্চারণ ধরিয়া মূলের রোমান প্রত্যক্ষরীকরণ ও আক্ষরিক অনুবাদও মিলিবে—এই বইখানি বিশেষ উপযোগী সংস্করণ। সম্প্রতি জনৈক চীনা পণ্ডিত কর্তৃক প্রস্তুত ইহার এক অনুবাদ মূলের সহিত বাহির হইয়াছে; এবং চীনা গ্রন্থের বিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদক Arthur Waley-কৃত ইহার অনুবাদ,

ইংরেজী সাহিত্যেরও একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে বিদ্যমান। আমাদের কোনও ভারতীয় ভাষায় মূল চীনা ধরিয়া অনুবাদ এ যুগে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে—শ্রীযুক্ত অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ, নয়া-দিল্লীর "সাহিত্য আকাদেমী" হইতে ১৯৬০ সালে বাহির হইয়াছে। এই অনুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাবের পূরণ হইয়াছে। ইহার পূর্বে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত Lionel Giles-এর অনুবাদ অবলম্বনে বাঙ্গালায় "চীনের ধূপ" নাম দিয়া একখানি পরিচয়-পুস্তক লিখেন; সেখানিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে লাও-ৎসির বইয়ের অনুবাদ হইয়াছিল সংস্কৃত ভাষায়; এই সংস্কৃত অনুবাদের কথা পরে বলিতেছি।

লাও-ৎসির নামে প্রচলিত Tao-Teh-King "তাও-তেঃ-কিঙ্" (বা "চিঙ্") বইখানি যে তাঁহার লেখা নহে, এইরূপ মত কোনও-কোনও চীনা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য বহু পণ্ডিতের অভিমত এই যে, উহাতে আমরা হয়-তো ঠিক লাও-ৎসি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা না পাইতে পারি, কিন্তু উহাতে তাঁহার দার্শনিক মত ও শিক্ষা অনেকটা-ই সংরক্ষিত আছে; এবং অন্ততঃ পক্ষে দুই হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরিয়া এই বই লাওৎসির বলিযা প্রচলিত রহিযাছে।

"তাও-তেঃ-কিঙ্"-এ প্রতিপাদ্য লাও-ৎসির মতবাদের সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসিবার মতো শক্তি ও সাহস আমার নাই। সাধারণ পাঠকের চোখে, উপনিষদের অনুরাগী হিন্দুর চোখে আমার এই বই দেখা; ইহার মূল ভাবগুলি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, এই বই চিরকালের সাথী হইয়া আমার কাছে আছে। কেহ-কেহ লাও-ৎসির বইয়ে ভারতেব উপনিষদের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন। চীন ও ভারতের প্রাচীন সংযোগের ঐতিহাসিক বিচার করিয়া এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে করি না। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে আর্য্য-ভাষী ভারত এবং চীনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে নাই বলিয়াই মনে হয়; বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে, অথবা পঞ্চম শতকে, মধ্য-এশিয়া অথবা Yun-nan য়ুন্-নান্ বা দক্ষিণ-পূর্ব চীনের পথ দিয়া ভারত ও চীনের মধ্য বাণিজ্য-সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়া থাকিতে পারে মাত্র। আমার মনে হয়, লাও-ৎসির প্রতিপাদিত 'তাও'-বাদ

ও আমাদের ব্রহ্মবাদ বা ঋতবাদ, দুইটি বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত এক-ই প্রকারের চিন্তার ফল। এই এক ধরনের উপলব্ধির দ্বারা বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে ভাব-সাম্য প্রকটিত হয়; এবং এই প্রকার ভাব-সাম্যের মধ্যে, হয়-তো আমরা এই উপলব্ধির সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা সম্ভাব্যতা দেখিতে আদিষ্ট হইতেছি।

লাও-ৎসির দর্শনের মূল কথা হইতেছে Tao 'তাও'; 'তাও' আধুনিক উচ্চারণ, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে শব্দটির প্রাচীন উচ্চারণ 'ধাউ' Dhau ছিল বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্থির করিয়াছেন। চীনা ভাষায় 'ধাউ' বা 'তাও' শব্দের মৌলিক অর্থ হইতেছে 'পথ'। ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালার সাহায্যে চীনা ভাষা লিখিত হয় না—চিত্রদ্যোতক অথবা ভাবদ্যোতক বিভিন্ন অক্ষর বা বর্ণ, যাহা ধ্বনির অপেক্ষা রাখে না, তদ্দ্বারাই প্রধানতঃ চীনা শব্দ লিখিত হয়। ধ্বনিদ্যোতক কতকগুলি চিহ্ন অবশ্য চীনা লিপিতে আছে। কিন্তু মুখ্যতঃ Pictogram বা চিত্রলিখন, Ideogram বা ভাবলিখন এবং আংশিক ভাবে Phonogram বা ধ্বনি-নির্দেশন, ইহার আধারে চীনা লিখন-রীতি। চানা ভাষার তাবৎ শব্দ monosyllabic বা একাক্ষর। Dhau বা Tao শব্দটি যে অক্ষরের সাহায্যে চীনা ভাষায় লিখিত হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ এই—"যাহার সাহায্যে কোনও পদার্থের মুখ বা আরম্ভে পহুঁছানো যায়"। নিম্নে এই অক্ষরের প্রাচীন ও আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল। প্রাচীন রূপে অক্ষরের মধ্যে মূল ভাব-

চিত্রের প্রকৃতি অনেকটা সংরক্ষিত আছে; পূর্বোল্লিখিত বংশ-ফলকের উপরে লোহার লেখনীর আঁচড়ে লেখা অক্ষর এইরূপ। পরবর্তী রূপটির উদ্ভব হইল খ্রীষ্ট-জন্মের আশেপাশে, তখন চীনারা পুরাতন বংশ-ফলকের ও লোহার লেখনীর পরিবর্তে, রেশমের কাপড় বা পটের উপর তুলির সাহায্যে কালি দিয়া লিখিবার রীতি আবিষ্কার করে। যাহা হউক, মৌলিক অর্থ 'পথ', তাহার প্রসারে 'চলা', তদনন্তর 'বিচার করা', এবং তাহা হইতে ভাবার্থ

দাঁড়ায় Reason 'বিচার-শক্তি' ; কিন্তু Reason বা 'বিচার-শক্তি' বলিলে যাহা বুঝিব, লাও-ৎসির 'তাও' তদপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক বস্তু। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার অনুরূপ ভাবের কল্পনা বা প্রকাশ আমরা ভারতের উপনিষদে 'ব্রহ্ম' শব্দের মধ্যেই পাই ; এবং 'তাও' শব্দের 'পথ' এই অর্থের প্রতিরূপ, আমাদের প্রাচীন বৈদিক চিন্তায়, 'ঋত' ('ঋ'-ধাতু হইতে, 'চলা' অর্থে) শব্দের মধ্যেই নিহিত আছে ; 'ঋত'—'যাহার মধ্যে সব কিছু বাহিত বা চালিত হইতেছে'। উপনিষদে ব্রহ্মের যেমন নির্গুণ ও সগুণ এই দুই অবস্থার বিচার বিদ্যমান, লাও-ৎসি-ও তদ্রূপ 'তাও'-কে আপন সত্তায় বিরাজমান নির্গুণ রূপে দেখিয়াছেন, এবং তাহাকে সগুণ, বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রকাশমান ও ক্রিয়াশীল রূপেও দেখিযাছেন।

'তাও' শব্দের প্রকৃষ্ট সংস্কৃত প্রতিশব্দ লইয়া চীনা ও ভারতীয় পণ্ডিতেরা বহু পূর্বে চিন্তা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউএন্-ৎসাঙ্ যখন ভারতে আসেন, তখন ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংযোগ ও সহযোগিতার মধ্যাহ্নকাল। চীনদেশীয় বিদ্যার্থীরা ভারতে আসিতেন, ভারতীয় বৌদ্ধ গুরু ও উপদেশকেরা চীনে যাইতেন ; চীনারা সংস্কৃত শিখিতেন, ভারতীয়েরা চীনে গিয়া চীনা ভাষা শিখিতেন, এবং উভয়-জাতীয় পণ্ডিতের সহযোগিতায় প্রায় সমগ্র ভারতায় বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা-ভাষায় অনূদিত হয়। হিউএন্-ৎসাঙ্ ভারতের নানাপ্রদেশে পর্য্যটন করিযা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপে গিয়াছিলেন। তখন সেখানকার রাজা ছিলেন ভাস্করবর্মা ; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৌদ্ধ চীনা পণ্ডিতকে তিনি সমাদর করিয়া নিজ রাজ্যে আহ্বান করেন। চীনদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভাস্করবর্মা কৌতূহল প্রকাশ করেন, এবং চীনা সাহিত্যের কোনও শ্রেষ্ঠ বই ভারতীয় পাঠকদের জন্য যাহাতে সংস্কৃতে অনূদিত হয়, তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। হিউএন্-ৎসাঙ্ রাজার ঔৎসুক্যের কথা স্মরণে রাখেন ; কিন্তু চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া এবিষয়ে কিছু করিতে পারেন নাই। ভারতের পণ্ডিতদের উপযোগী একমাত্র পুস্তক হিসাবে লাও-ৎসির "তাও-তেঃ-কিঙ্"-এর সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া ভাস্করবর্মার সভায় প্রেরণ করিবার কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে, ওয়াঙ্ হিউএন্-ৎসি ও লী য়ী পিয়াও-নামে দুইজন

চীনা রাজপুরুষ ভারতে আসেন। ইঁহাদের একজন রাজা ভাস্করবর্মার সহিত সাক্ষাৎ করেন, ও এবিষয়ে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া চীন দেশ ফিরিয়া গিয়া চীন-সম্রাট্‌কে সমস্ত কথা নিবেদন করেন। সম্রাট্ তখন হিউএন্-ৎসাঙ্ প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত, এবং তাও-ধর্মের প্রধান কয়েক জনকে ডাকিয়া, সম্মিলিত চেষ্টায় এই পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করান। নানা মতান্তরের মধ্য দিয়া শেষটায় সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়, এবং যথাকালে রাজা ভাস্করবর্মার নিকট প্রেরিত হয়। এ-সব কথা আমরা চীনা ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ হইতে পাই। ফরাসী চীনবিৎ পণ্ডিত Paul Pelliot পোল্ পেলিও চীনা বইয়ে এই-সব খবর পাইয়া ভারতে—আসাম-অঞ্চলে—এই বইয়ের জন্য আগ্রহ-সহকারে অনুসন্ধান করান; কিন্তু "তাও-তেঃ-কিঙ্"-এর এই প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ হয়-তো এখনও মিলে নাই; তাহা চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে এই অনুবাদ কখনও পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা এক অপূর্ব বস্তু হইবে—"তাও-তেঃ-কিঙ্"-এর প্রাচীন পাঠ-নির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া এই সংস্কৃত অনুবাদ চীনা সাহিত্যেও আদরণীয় হইবে। যাহা হউক, "তাও-তেঃ-কিঙ"-এর অনুবাদ-কালে, 'তাও' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে যে আলোচনা চলিয়াছিল, চীনা গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ আছে; হিউএন্-ৎসাঙ্ এই চীন শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ হিসাবে 'মার্গ' শব্দটি ব্যবহার করিতে চাহেন, তাও-ধর্মের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রস্তাবিত 'বোধি' শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। (এই সংস্কৃত অনুবাদ সম্বন্ধে সংবাদ আমি সর্বপ্রথম পাইয়াছি আমার বন্ধু, বিশ্বভারতীর চীন-ভবনের সংস্কৃতাধ্যায়ী গবেষক ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Ta-fu Chou তা-ফ চোউ-এর নিকট হইতে)।

আমি নিজে কিন্তু আমাদের সংস্কৃত 'ঋত' শব্দের দ্বারা 'তাও' শব্দের অনুবাদ করিতে চাই। 'ঋত' বৈদিক শব্দ; হিউএন্-ৎসাঙ্ ভারতে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি এই শব্দ কেন তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল, জানি না। 'ঋত' শব্দের উৎপত্তি গমনার্থক 'ঋ'-ধাতু হইতে; 'ঋ'-ধাতুর উত্তর 'ত'(ক্ত) প্রত্যয় করিয়া 'ঋত' শব্দ। বিশেষণ-রূপে ইহার অর্থ, 'সংগত, প্রভাবিত; উচিত, সত্য, সাধু'; এবং 'পূজিত, প্রবুদ্ধ, প্রোজ্জ্বল'; বিশেষ্য-রূপে ইহার

অর্থ, 'নির্ধারিত ক্রম, ধর্ম, রীতি, দৈবধর্ম, দেব-নির্দিষ্ট পথ বা ধর্ম, দিব্য সত্য; ব্রত, প্রতিজ্ঞা; সূর্য্য; যজ্ঞ'; ইত্যাদি। 'ঋ'-ধাতু ধরিয়া, ইহার মূল অর্থ হইবে 'গত'; তাহা হইতে, করণাত্মক 'গতি', 'গতিপথ, পথ,' এবং তদনন্তর 'দেবদিষ্ট পথ, শাশ্বত ধর্ম' ইত্যাদি অর্থের বিকাশ। যে পথের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সব কিছু, চালিত বা বাহিত হইতেছে বা গমন করিতেছে, সেই পথ-ই 'ঋত', তাহা-ই সত্য। বৈদিক 'ঋত' শব্দের প্রাচীন-পারসীক প্রতিরূপ 'অর্ত' ও অবেস্তা-ভাষায় প্রতিরূপ 'অষ', 'সত্য'-অর্থে ঈরান দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ঋ'-ধাতু হইতে 'ঋত' শব্দ, অর্থ-বিষয়ে স্থূল বা ভৌতিক স্তর হইতে মানসিক বা আত্মিক স্তরে উন্নীত হইয়াছে; কিন্তু গত্যর্থক অনুরূপ 'সৃ'-ধাতু হইতে কৃৎ-'ত'-প্রত্যয়ের-যোগে গঠিত আর একটি শব্দ, অর্থ-বিষয়ে স্থূল বা পার্থিব স্তরেই পড়িয়া রহিয়াছে; 'সৃ'—'সৃত', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'সট', তদনন্তর 'সড', ও এই 'সড' পদে প্রাকৃতে স্বার্থে তদ্ধিত 'ক' বা 'ক্ক' প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া হইল 'সডক' বা 'সডক্ক', এবং ইহা হইতেই আধুনিক বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতিতে পথ-বাচক 'সডক' শব্দের উৎপত্তি। আধ্যাত্মিক অর্থে উন্নয়ন, পথ-বাচক চীনা শব্দ 'তাও' (বা 'ধাউ') এবং সংস্কৃত শব্দ 'ঋত', উভয়েই বিদ্যমান; ব্রহ্ম-নির্দিষ্ট এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সত্য পথ অর্থে 'ঋত' শব্দকে অতএব ব্রহ্ম-বাচক 'তাও'-শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সুধীগণ এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন।

'তাও' হইতেছে জগতের এবং জাগতিক তাবৎ চেষ্টার অন্তর্নিহিত এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি। 'তাও' নিজ অব্যক্ত স্বরূপে অনাদি ও অনন্ত, অপরিবর্তনীয়। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষদের উক্তি—"তদেজতি, তন্নৈজতি, তদ্দূরে, তদ্বন্তিকে; তদন্তরস্য সর্বস্য, তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ",—'তাও'-সম্বন্ধে চীনা ঋষির উক্তি দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়। 'তাও' অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ, অপার্থিব, শাশ্বত, ভূমা, অবাঙ্‌মনোগোচর। অব্যক্ত 'তাও' হইতেছে বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিচালক চিৎ-শক্তি, ইহা বিশ্বপ্রপঞ্চের নামরূপহীন রহস্যময় আদিকারণ, বিশ্বের মূলাধার। আবার 'তাও' মানুষের চিত্তে ব্যক্তরূপ, ব্যক্তগুণ, মানুষী চিৎ বা বোধ বা বিচার-শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল; 'তাও'-ই জগতে কার্য্যকর শক্তিরূপে বিচরণ করে। 'তাও' জগতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেও, ইহা জগৎ-নিরপেক্ষ ধর্ম বা 'ঋত'।

ব্যক্ত হইলে, 'তাও' মানবের মধ্যে 'তেঃ' অর্থাৎ সদ্‌গুণরূপে দেখা দেয়। যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপে ভূমা 'তাও'-কে জানেন, জগতের সব-কিছু 'তাও' দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এই বোধ বা উপলব্ধি বা অনুভূতি যাঁহার হইয়াছে, তিনি সংসারের কোনও কিছুর দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না; ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের সঙ্গে-সঙ্গে যেমন মানুষের কর্মফল-স্পৃহা বিদূরিত হয়, তেমনি নিজ চিত্তে 'তাও'-এর স্বরূপের উপলব্ধি অন্তে, মানুষ নিজজীবনে নৈষ্কর্ম্য-সাধন করে। 'তাও'-গত-চিত্ত এবং 'তাও'-গত-কর্মা মহাপুরুষ নিরর্থক কর্ম-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত না হইয়া, জগতের উদ্বেগাকুল কর্ম-স্রোত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্ম-সমাহিত থাকেন। এই নৈষ্কর্ম্য-সাধন কেবল negative বা অভাবাত্মক নহে, ইহার মধ্যে positive বা ভাবাত্মক অথবা স্থিতি-ময় অবস্থা বা গুণও আছে। মানুষকে যখন তাহার প্রত্যেক চিন্তায় ও আচরণে in tune with the Infinite অর্থাৎ অসীমের সঙ্গে, শাশ্বতের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হয়, যখন মানুষ rest in God অর্থাৎ ব্রহ্ম-ধামের অধিকারী হয়, তখন-ই সে এই নৈষ্কর্ম্য-সাধন করিতে পারে। তখন মানুষের পক্ষে জীবনের সব কাজ সরল ও সহজ হইয়া উঠে; 'তাও'-এর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলিতে পারা যেন তাহার পক্ষে প্রবাসের পরে গৃহে প্রত্যাগমন-স্বরূপ হয়—সারল্য, অকপটতা, শুচিতা, সাধুতা, সত্য প্রভৃতি গুণ তাহার জীবনের স্বাভাবিক অলংকাব হয়। জীবনের প্রত্যেক কাজ, বল-প্রয়োগ না করিয়া সে সমাধা করিতে পারে;—বুদ্ধদেবের উপদেশ, "অসাধুং সাধুনা জিনে" অর্থাৎ 'অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে', তাহার প্রাক্‌কথন লাও-ৎসি এই ভাবে করিয়া গিয়াছেন—'ঘৃণার পরিবর্তে প্রীতি দাও।' আমেরিকার এক নিরক্ষর নিগ্রো জ্ঞানী নিজের নিরুদ্বেগ আনন্দময় জীবনের রহস্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—Ah just tries to co-operate wid de Inevitable 'আমি অবশ্যম্ভাবীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চলিবার চেষ্টা করি'; এই মনোভার, 'তাও'-বাদীর-ই মনোভাব।

পৃথিবীর সমস্ত জাতির শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে কেবল ভারতের ব্রহ্ম-বাদ ও চীনের এই 'তাও'-বাদ নিজেকে মিলাইয়া লইতে বা তাহাদের সম্পূর্ণতা দিতে পারে। উপনিষৎ, তথা গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি-ও উপলব্ধি-মূলক ভারতের অন্য শাস্ত্রের মতো, ঋষি লাও-ৎসির "তাও-তেঃ-কিঙ্" সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক অমূল্য রিকৃথ। ইহার এক প্রামাণিক

মূলানুসারী অনুবাদ ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ রূপে অপেক্ষিত। উপস্থিত শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদে বাঙ্গালা ভাষার অভাব এ বিষয়ে মিটিবে। অধুনালুপ্ত সংস্কৃত অনুবাদটির জন্য আমাদের মনে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা জাগে—কিন্তু মহাকালের বিধানে এ বিষয়ে আমরা এখন নিরুপায়।

নিম্নে 'তাও'-এর সম্বন্ধে লাও-ৎসির একটি শিক্ষা-পদের (ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করিয়া ও মূল চীনা ধরিয়া) বাঙ্গালা অনুবাদ দিয়া আমার প্রবন্ধের সমাপ্তি করিতেছি। ৮১টি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে 'তাও-তেঃ-কিঙ্' বিভক্ত; ২৫-এর অধ্যায়ের ভাবানুবাদ এই :—

২৫-এর অধ্যায় ॥ (অজ্ঞাত) রহস্যের চিত্রণ ॥

নিখিল পদার্থকে পূর্ণরূপে ধারণ করিয়া একটি সত্তা বিদ্যমান।
দ্যৌঃ এবং পৃথিবীর পূর্ব হইতেই ইহা আছে।
শান্ত, আহা! অশরীরী, আহা! (অর্থাৎ কি আশ্চর্য্য ভাবে ইহা শান্ত এবং অরূপ!)
ইহা একা স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ইহা পরিবর্তিত হয় না॥১॥

ইহা সর্বত্র যায় এবং (কোথাও) বাধা পায় না।
এই হেতু ইহা স্বর্গ-মর্তের মাতা (অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি কারণ)।
আমি ইহার নাম (নাম-রূপ) জানি না।
(যদি) ইহার বর্ণনা করি, বলি 'তাও' ('ঋত') ॥২॥

যদি ইহার নাম দিতে হয়, বলি 'মহান্' (বা 'ভূমা')।
এই ভূমাকে বলি, এড়াইয়া-যাওয়া (বা পলায়ন-শীল)।
এই এড়াইয়া-যাওয়াকে বলি 'সুদূর'।
এই সুদূরকে বলি 'ফিরিয়া-আসা' (বা প্রত্যাবর্তন)॥৩॥

কারণ, ঋত মহৎ।
দ্যৌঃ মহান্।
পৃথিবী মহতী।
রাজশক্তি (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ- বা পরিচালন-শক্তি)-ও মহতী।
জগতে এই চারি মহৎ বস্তু বিদ্যমান।

এবং রাজশক্তি (বা নিয়ামক অথবা পরিচালক শক্তি) এক অখণ্ড বস্তু রূপে এগুলিতে বাস করে ॥৪॥

মানুষ পৃথিবীকে অনুসরণ করে (অর্থাৎ মানুষ বিশ্বদ্বারা নিযন্ত্রিত হয়) ।
পৃথিবী দ্যৌঃকে অনুসরণ করে ।
দ্যৌঃ 'তাও'-কে (ঋতকে) অনুসরণ করে ।
'তাও' (ঋত) কিন্তু আপনাকেই অনুসরণ করে ॥৫॥

মন্তব্য। এই প্রবন্ধে ঋষি লাও-ৎসির যে চিত্র দেওয়া গেল, তাহা জাপানী চিত্রকর Keichyu Yamada কেইচ্যু য়ামাদা কর্তৃক অঙ্কিত ; কেবল কল্পনার সাহায্যে এই চিত্র অঙ্কিত, ঐতিহাসিকতা ইহাতে নাই। Paul Carus কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত 'তাও-নীতি' সম্বন্ধে চীনদেশে লোকপ্রিয় একখানি আধুনিক বই Thai Shang Kan-Ying Phien-এর মুখপত্র হইতে গৃহীত। চীন ও জাপানের লোকেরা কিভাবে লাও-ৎসির মূর্তির কল্পনা করে, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে। তলায় চীনা অক্ষরে লেখা, ডাহিন হইতে বামে পড়িতে হইবে—Thai Shang Lao Chun 'থাই শাঙ লাও চ্যুন্' অর্থাৎ 'মহান্ উচ্চ প্রভুপাদ লাও' ॥

[বঙ্গাব্দ ১৩৪৯]

সূফী অনুভূতি ও দর্শন

নবী মুহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ইস্‌লাম অর্থাৎ মুসলমান-ধর্ম গত ১৩০০ বৎসর ধরিয়া মানব-জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে কার্য্যকর শক্তির ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি প্রধান উৎস হইয়া আছে। "তৌহীদ" অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর আল্লাহের প্রতি অনন্যনিষ্ঠ এবং অনন্যদৃষ্টি আস্থার উপরে ইস্‌লামের প্রতিষ্ঠা ; নবী মুহম্মদের অনুভূতি, উপদেশ ও জীবনী ইহার মুখ্য আধ্যাত্মিক আদর্শ ; এবং খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মানব-জাতিকে একটি-মাত্র বিশিষ্ট ধর্মের পাশে একত্র বাঁধিয়া রাখিবার উচ্চাশাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় ইহার প্রবলতম মানসিক প্রেরণা। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মুহম্মদ, ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের ফলে শক্তিমান্ ও বিভূতিমান্ পুরুষ ছিলেন, এবং নিজের সত্য আগ্রহ ও মানসিক বলের দ্বারা দুর্ধর্ষ আরব-জাতিকে তাঁহার অনুরাগী ও ভক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত কোরান-গ্রন্থে, শাণিত তরবারির মতো সংশয়-চ্ছেদী তাঁহার সুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস, শক্তিময়, ঐশ্বর্য্যময় ও করুণাময় ঈশ্বরের সত্তায় ও নিয়ন্তৃত্বে মানুষের আস্থা ও নির্ভরতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহার তূর্য্য-স্বন আহ্বান-বাণী, ও যাহারা তাঁহার মতো আস্থাশীল নহে তাহাদের অবশ্যম্ভাবী ঐহিক ও পারত্রিক বিনাশ বিষয়ে সতর্কতা-বাণী—এইগুলি-ই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অভিভূত করে। প্রধানতঃ আরব-জাতির সমাজের পরিধির মধ্যে মানুষের কর্তব্য লইয়াই বেশী ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া, এবং বিদ্যা ও বিচার-শীলতার আব-হাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হন নাই বলিয়া, হজরৎ মুহম্মদ দার্শনিক চিন্তা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ পান নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া, কোরান গ্রন্থে, এবং কোরান-বহির্ভূত হদীস্ বা তাঁহার বচন-সমূহে ও তাঁহার আচরণে, গভীর অধ্যাত্মিক দৃষ্টির ও পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধির পরিচায়ক উক্তির অভাব নাই।

জগতে সমস্ত-ই গতি-শীল, কিছু-ই স্থিতি-শীল নহে ; অন্য সমস্ত ব্যাপারের মতো ইস্‌লামের মধ্যেও আমরা গতি বা ক্রম-বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু

পরবর্তী যুগে বিভিন্ন জাতির সংঘাত ও মিলনের ফলে যখন নূতন-নূতন ভাব-ধারা আসিয়া ইস্‌লামীয় জনগণকে উন্মুখ করিল, অভিভূত করিল তখন কোরানের ও হদীসের বচনের মধ্যে এই সব নবীন ভাব-ধারার মূল খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইল ; এবং মূল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় এরূপ বচন-সমূহের অভাবও হইল না। প্রাচীন-পন্থী মুসলমান যাঁহারা কোরান-নির্দিষ্ট সংকীর্ণ কিন্তু সরল পথকেই মুহম্মদ-প্রোক্ত মূল ইস্‌লামের পথ (শরিয়ৎ) বলিয়া মানিতেন, তাঁহারা এই সমস্ত নবীন মত ও নবীন ব্যাখ্যা অস্বীকার করিতেন ; নূতন মতের ন্যায়-সংগত পর্য্যবসান, ইস্‌লামের মৌলিক তত্ত্বসমূহ হইতে দূরে লইযা গিয়া তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিযা ফেলিবে, এই আশঙ্কা তাঁহাদের মনে সদা-জাগ্রত ছিল। সেই জন্য, যখন ইস্‌লামের প্রথম প্রসার এবং আরব-জাতির সঙ্গে সুসভ্য ঈরানী, সিরীয়, বিজাতীয় গ্রীক, মিসরীয় প্রভৃতি জাতির প্রথম সংঘর্ষ ও সংঘাত ঘটিল, ও পরে অর্থনৈতিক মানসিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে যখন প্রথম বোঝা-পড়া আবস্ত হইল, এবং ইহার ফলে নানা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও মত-বাদ ধর্মের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করিল, তখন কোরান ও শরিয়ৎ আশ্রয় করিযা প্রাচীন-পন্থী আরব ও অন্য মুসলমান, যাহাদের নিষ্ঠা বিচার অপেক্ষা কর্মকেই আশ্রয় করিতে চাহিত, তাহারা এই সকল মত্-বাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল।

এই-সকল নূতন দৃষ্টি এবং মত-বাদ বা বিচারের মধ্যে, ধীরে-ধীরে সূফী মত-বাদও গড়িয়া উঠিল। মুসলমান সাধকগণের অনুভূতি ও সাধনা, দর্শন ও আচরণ, ক্রমে মুহম্মদ-প্রচারিত ইস্‌লামের পরিধির বাহিরে, প্রসারিত হইল। ইহাকে ইস্‌লামের স্বাভাবিক গতি বা বিকাশ বা পরিণতি বলিযা লইবার মতো বিচারশক্তি বা ধৈর্য্য অনেকের ছিল না ; বিশেষতঃ যখন আপাত-দৃষ্টিতে এই সমস্ত নূতন অনুভূতি ও দর্শনের কথা, কোরানের শরিয়ৎ অপেক্ষা কল্পনায় ও ভাবুকতায় আরও ভরপুর, আরও জটিল ও বিচিত্র হইয়া দেখা দিল। সূফী অনুভূতি ও দর্শন যাঁহাদের মধ্যে উদ্ভূত হইতেছিল, তাঁহারা কেবল কোরান লইয়া-ই সন্তুষ্ট ছিলেন না—গ্রীক, ঈরানীয় ও ভারতীয় চিন্তার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ অথবা ভাসা-ভাসা পরিচয় ঘটিয়াছিল। শরিয়তী ইস্‌লাম, সহজ ও সরল বুদ্ধির মানুষের পক্ষে, কর্মী মানুষের পক্ষে, সোজা পথ ধরাইয়া দিবার জন্য, এবং সমাজের মধ্যে ঈশ্বর-

ভীরু ও কর্তব্য-পরায়ণ, জন-হিতৈষী ও আচার-নিষ্ঠ গৃহস্থ সজ্জন তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য, যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইস্‌লামী জগতের বাহিরেকার সাধারণ বিশ্বমানব, চিত্তকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য, আত্মাকে অনুভূতির রঙ্গে ও রসে রঙ্গাইয়া দিবার ও রসাইয়া দিবার মতো বিশিষ্ট ও স্বকীয় কিছু, ইহার মধ্যে সহজে পাইবে না। যিহুদী নবী বা ভাববাদীদের দ্বারা প্রচারিত, যিহুদী পুরাণে (Thorah "থোরাহ্" অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র বা মোশেহ্-লিখিত পঞ্চ-গ্রন্থ, Nebhiim 'নেভীইম্" অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও ভাববাদীদের রচিত ২১ খানি গ্রন্থ, এবং Kethubhim "কেথুভিম্" অর্থাৎ প্রার্থনা, স্তোত্র, উপাখ্যান, ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত কতকগুলি গ্রন্থ—এই-সমস্ত মিলাইয়া, ইংরেজীতে Old Testament নামে পরিচিত যিহুদী শাস্ত্রে) ও যিহুদী ব্যবহার এবং শাস্ত্রার্থে (Talmud "তাল্‌মুদ"-গ্রন্থে) বিশেষ দৃঢ়-প্রত্যয় সহকারে প্রস্থাপিত একেশ্বরবাদ, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মুহম্মদ-প্রচারিত ইস্‌লাম-ধর্মেও অনুরূপ, এমন কি, অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ়তার সহিত গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ এক ঈশ্বরে আস্থা, জগতে কিছু নূতন বস্তু ছিল না। কিন্তু অন্তরঙ্গ ও গভীর ঈশ্বরানুভূতি, জীব ও ঈশ্বরের অভেদত্ব ও সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বর অথবা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রেমের সম্বন্ধ—মানবাত্মাকে প্রেমিক ও ঈশ্বরকে প্রেমিকা বা প্রেমাস্পদের রূপকের দ্বারা বর্ণনা,—এইরূপ বোধ ও কল্পনা, ধ্যান ও ধারণা, এবং সাধনা ও আরাধনা লইয়া, যখন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্যেই স্ফী মত নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিল, তখন জগতের ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে একটি নূতন জিনিস দেখা দিল। এই মত-বাদের গঠনে ও ক্রম-বিকাশে নানা জাতির আহরিত উপাদান আসিয়াছিল—সজ্ঞানে, অথবা অজ্ঞানে। আরব্য ইসলামের অদ্বিতীয়-ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস; গ্রীক দার্শনিক প্লাতোন্ ও তদনুবর্তী নব্য-প্লাতোনিক দার্শনিকদের ঐশ্বরিক সত্তা ও কার্য্য বিষয়ে চিন্তা ও বিচার; এবং ভারতের বেদান্তের 'সর্বভূতে-ব্রহ্মাধিষ্ঠান'-বাদ, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অভেদ কল্পনা ও 'অহং-ব্রহ্মাস্মি'-বাদ; তথা খ্রীষ্টানদের ও বৌদ্ধদের পরিব্রাজক-জীবন; ঈরানের জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের সত্য-বস্তুর প্রতি নিষ্ঠা ও তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা, মিথ্যার পরিহার ও নৈতিক একাগ্রতা; এবং পরবর্তী কালের মধ্য-যুগের পারস্যের নাগরিকতা, ভাবুকতা, সৌন্দর্য্য-প্রীতি ও রোমান্স্ বা রমন্যাস; —এ-সবে মিলিয়া একটি অতি মনোহর emotional অর্থাৎ অন্তর্বেগময়

অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল, বিশ্বমানবের সমক্ষে তাহা একটি অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল ; ইস্‌লাম-সম্পৃক্ত ভাব-রাজির মধ্যে সূফীদের সৃষ্ট এই কল্পলোক, বিশ্বমানবের পক্ষে সাগ্রহে গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল। আরব-জাতির নিজ মৌলিক প্রকৃতিতে অতীন্দ্রিয়তার প্রতি তাদৃশ আকর্ষণ না থাকায়, কর্মপ্রবণ আরব-জাতি সাধারণ-ভাবে বা ব্যাপক-ভাবে এই জিনিস গ্রহণ করিতে পারে নাই ; কিন্তু সূফী অনুভূতির ও দর্শনের ধারার আরম্ভ আরব মুসলমান সাধকদের মধ্য হইতেই ক্ষীণ স্রোতে দেখা দিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শরফুদ্দীন ওমর ইব্‌ন্‌-অল্‌-ফরীদ (১১৮১—১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও মুহ্‌য়িউদ্দীন্‌ মুহম্মদ বিন্‌ আলী ইব্‌ন্‌-'আরবী (১১৬৫—১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ), ইঁহারা সূফীমতের দুইজন প্রধান সাধক ও উপদেষ্টা, কবি ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন ; ইঁহাদের দুইজনেরই মাতৃভাষা ছিল আরবী। তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, ঈরানীদের মধ্য হইতেই সূফী মতের শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিকদের উদ্ভব হয়, এবং সেইজন্য কেহ-কেহ Tasawwuf "তসব্‌বুফ্‌"-কে, অর্থাৎ সূফী অনুভূতি ও দর্শনকে, আবব বা শেমীয় ধর্ম ইস্‌লামের বিরুদ্ধে ঈরানের আর্য্য মনের প্রতিক্রিয়ার ফল বলিযা মনে করেন। সূফী সাধক আবু য়জীদ বিস্তামী, জুনয়্‌দ্‌ বগ্‌দাদী, হুসয়্‌ন্‌ বিন্‌ মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজ, সূফী কবি ও দার্শনিক আবু সঈদ ইব্‌ন্‌ আবী-ল্‌-খয়্‌র্‌, আবু-ল্‌ মজ্‌দ্‌ মজদূদ সনাঈ, ফরীদুদ্দীন অত্তার, জলালুদ্দীন রূমী ও তাঁহার গুরু শম্‌স্‌-ই-তব্রীজী, দার্শনিক আবু হমীদ মুহম্মদ অল্‌-ঘজ্জালী, কাব মুহম্মদ শম্‌সুদ্দীন হাফেজ়, কবি নূরুদ্দীন আব্‌দুর-রহ্‌মান জামী—ইঁহারা সকলেই ঈরানী ছিলেন।

যাহা হউক, তুর্কী ও ঈরানীদের দ্বারায় উত্তর-ভারত-বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ইস্‌লামের অন্তরঙ্গ সাধনার একটি লক্ষণীয় পথ হিসাবে, তসব্‌বুফ্‌ ভারতবর্ষেও আসিয়া পহুঁছায়। সূফী ফকীর বা যাযাবর পরিব্রাজক, ভারতের নানা স্থানে সূফী-মতের ইস্‌লাম প্রচার করেন, এবং ইহার ফলেই ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধেরা অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম-ধর্ম গ্রহণ করে। ভারতের ধর্ম-চিন্তা ও সাধনা, আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশক কবিতায় সূফী-মতবাদ নিজ প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়ে এখনও বিশেষ কিছু অনুসন্ধান হয় নাই ; কিন্তু ভারতের মধ্য-যুগের ভক্তি-মূলক সাধনায়, সন্ত-মার্গীয় বৈরাগী ও সাধুদের চিন্তায়, গৌড়ীয়-মতের বৈষ্ণব প্রমুখ প্রেমাশ্রয়ী

ধর্ম-সম্প্রদায়ে ও সাহিত্যে, স্থফী অনুভূতির প্রভাব ও স্থফী সাহিত্যের ছাপ আছে কি না, এবং থাকিলে কতটা আছে, তাহা বিচার্য্য।

আরবদের মধ্যে নবী মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বেই কতকগুলি ধর্মপিপাসু তত্ত্বানুসন্ধানীর জন্ম হয়, ইঁহারা "হানীফ" (ঃহনীফ) নামে অভিহিত হন। ইঁহারা ঈশ্বর-লাভের আশায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া পর্বতে ও মরুতে একাকী বাস করিতেন। ইঁহাদের কোনও সম্প্রদায় ছিল না; তবে ইঁহারা সকলেই, আরব-জাতির মধ্যে যে আদিম ভাবের পৌত্তলিকতা ছিল, তাহা বর্জন করিয়া, এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্য সাধনা করিতেন, এবং বর্বর যুগের আরবদের অনেক নিষ্ঠুর ও কুৎসিত প্রথা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তস্বর্‌র্ ুফেব জড এক দিকে আরব-জগতে এই সব হানীফদের সাধনায় গিয়া পহঁছায়। হজরৎ মুহম্মদ নিজে প্রথম জীবনে, হানীফদের ন্যায় কিছুকাল পর্বতে গিরি-গুহায় বাস করিয়াছিলেন, সেখানে হানীফদের আচরিত সাধনা বা তপস্যা (তঃহন্ন ুথ) করিতেন। কিন্তু মুহম্মদ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না—সন্ন্যাস-মার্গ তাঁহার মনোমত ছিল না। তাঁহার উক্তিতে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরানুভূতির প্রচুর প্রমাণ ও আভাস থাকিলেও, তিনি মনে করিতেন যে তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ মানুষের মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিবার জন্য আগত প্রচারক—"রসূল" অর্থাৎ 'প্রেরিত পুরুষ', এবং "পযগম্-বর" অর্থাৎ 'সন্দেশ-বহ' দূত (প্রথমটি আরবী ও দ্বিতীয়টি ফারসী শব্দ)। নবী মুহম্মদের মৃত্যুর পরে, কয়েক পুরুষ ধরিয়া আরবেরা রাজ্য-জয় ও ইস্‌লাম-প্রচারের কার্য্যে লাগিয়া গেল; তখন তাহাদের মধ্যে গভীর চিন্তার বা রহস্য-বাদের সূক্ষ্ম বিচারের সময় ছিল না। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে গৃহ-ত্যাগী ঈশ্বর-ভক্ত দুই-জন চারি-জন করিয়া দেখা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের অনুভূতিতে, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ, প্রভুর সহিত ভৃত্যের সম্বন্ধ মাত্র ছিল; পরবর্তী স্থফী মতের প্রেমের সম্বন্ধ তখনও কল্পিত হয় নাই। আত্মদমন ও সংযম, শাস্ত্রানুবর্তিতা ও শান্তিপ্রিয়তা, একান্তে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন জপ-তপ, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, এবং ব্যর্থ আচার-নিষ্ঠতার বর্জন—এই-সব ছিল ইঁহাদের সাধনার অঙ্গ। এই-রূপ সাধকদের মধ্যে, সাধক আবু হাশিম শামী, যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, তিনি-ই সর্ব-প্রথম "স্থফী" নামে অভিহিত হন; পরে কোরান-বহির্ভূত

পথে যাঁহারা তত্ত্ব বা সার সত্যের অনুসন্ধান করিতেন, তাঁহারা এই নামেই অভিহিত হইতে থাকেন। "সূফী" (স্বূফী) শব্দের নানা ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে; তন্মধ্যে "সূফ" (স্বূফ) অর্থাৎ 'উনী বা পশমের কাপড়', এই শব্দ হইতে যে ব্যুৎপত্তি, তাহা-ই ঠিক বলিয়া মনে হয়; কারণ সূফীরা প্রথম হইতেই কালো পশমের খদ্দরের ("স্বূফ"-এর) আলখাল্লা পরিতেন; ইহা আমাদের দেশের সন্ন্যাসীর গৈরিক-বস্ত্রের মতো ছিল: সেইজন্য এই সূফ-বস্ত্র, গৃহত্যাগী বা সংসার-নিস্পৃহ সাধুর বর্ণ-চিহ্ন হইয়া দাঁড়ায়। "সেক শুভোদয়া"-গ্রন্থে গৌড়-বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় যে "সেক" অর্থাৎ "শেখ" (শয়্খ্) বা মুসলমান সাধুর আগমনের কথা বর্ণিত আছে, তিনিও নিশ্চয়ই সূফী ছিলেন, তিনি "কৃষ্ণাম্বরধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টনতৎপরঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; ইঁহা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষের দিকের কথা। "সূফী" নাম, এই-সব সাধকের বিশেষ সংজ্ঞা রূপে প্রচলিত হয়, এবং সূফী ভাবকে আরবী ব্যাকরণ মতে "তস্বর্‌রুফ্" বলা হইতে থাকে। এই শব্দ পরে আমাদের 'তত্ত্বজ্ঞান' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' অথবা 'ঈশ্বরানুভূতি' বা 'পরানুরক্তিময় ঈশ্বর-ভক্তি' প্রভৃতি শব্দের পর্য্যায়ের হইয়া পড়ে।

প্রথম যুগের ইস্‌লামে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত), কোরানের সহজ সরল ঈশ্বর-বাদের অনুযায়ী দাস্য-ভাবের সাধক কতকগুলি সূফী দেখা দেন—ইঁহারা সংখ্যায় ১২।১৪ জন হইবেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন নারী ছিলেন, তিনি হইতেছেন বিখ্যাত তাপসী রাবেয়া (রাবি'অৎ); ইনি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে দেহরক্ষা করেন। ঋষিকা রাবেয়াকে 'আরব-জগতের মীরাবাঈ' বলা যায়। ইনি সূফীদের মধ্যে প্রথম প্রেম-ভক্তি আনয়ন করিলেন—ফলাফল- বা স্বর্গ-নরক-নিরপেক্ষ ঈশ্বরে পরা অনুরক্তি ছিল ইঁহার সাধনার মূল কথা। প্রথম যুগের এই-সকল সূফীর মধ্যে কতকগুলি ঈরানীও ছিলেন—প্রথম হইতেই সূফী সাধনায় ঈরানীদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা লক্ষণীয়।

সূফী মত-বাদের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষ এবং দশম শতকের প্রারম্ভ হইতে। এই সময়ে আবু য়জীদ বিস্তামী ও জুনয়দ্ বগ্‌দাদী নামে দুইজন ঈরানী সূফীর অনুভূতিতে ও শিক্ষায় 'সর্বভূতে ঈশ্বরাধিষ্ঠান' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাদ, ইস্‌লামীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রথম

প্রকটিত হয়। ইহার মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয় ;—'অহং ব্রহ্ম অস্মি' এই সংস্কৃত মহাবাক্যের অনুরূপ যে মহাবাক্যটি আরবী-ভাষায় প্রচারিত হয়— " 'অন-ল্-ঃহক্‌ক্" aan-l-Haqq, (প্রচলিত বাঙ্গালা বানানে "আনাল্-হক্")— তাহার অর্থ হইতেছে 'আমি-ই ('অন) সত্য (অল্-ঃহক্‌ক্)' ; পরব্রহ্মের নাম হিসাবে এখানে "ঃহক্‌ক্" বা "হক্" অর্থাৎ 'সত্য' এই বিরুদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই মহাবাক্য পরে হুসয়ন্ বিন্-মন্‌সূর অল্-হল্লাজের মুখে তাঁহার প্রাণদণ্ডের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই কারণে ইহা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখন, ইসলামী জপ-মালায় (তস্‌বীহ্-তে) ঈশ্বরের যে একোনশত বা নিরা-নব্বইটি (নব্বদ্-ও-নৌ) নাম জপ করা হয়, তন্মধ্যে "অল্-ঃহক্‌ক্" তাঁহার একটি নাম। কিন্তু ঈরানের সূফীদের মধ্যে এই নামটি, ঈশ্বরের সর্ব-প্রধান আরবী নাম "অল্লাহ্" শব্দের প্রায় প্রতিস্পর্ধী হইয়া উঠে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে মুসলমান-সমাজে সেদিন পর্য্যন্ত পত্রের আদিতে "শ্রীশ্রীহকনাম" বলিয়া দেবতা-প্রণামের পাঠ লিখিবার যে রেওয়াজ ছিল, তাহার মূলে এই সূফী প্রভাব বিদ্যমান। ঈশ্বর বা ঐশী শক্তির জন্য "হক্"(অর্থাৎ সত্য)-শব্দের এই অধিক প্রযোগ যে ঈরানীয সূফীগণের মধ্যেই আরম্ভ হইল, তাহার কারণ কী ? একটি বিষয লক্ষণীয। ইস্‌লাম-ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ঈরানীদের মধ্যে যে জরথুশ্‌ত্রীয ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল দ্বৈতবাদ-মূলক। পৃথিবীতে ঈশ্বর ও পাপ-পুরুষ, অহুর-মজ্‌দ ও অঙ্গ্র-মন্যু, সত্য ও মিথ্যা— ইহাদের দ্বন্দ্ব সতত লাগিযা আছে। মানুষের কর্তব্য, সজ্ঞানে সত্যের পক্ষ লইয়া, ঈশ্বরের পক্ষ লইয়া, অহুর-মজ্‌দের দাস হইয়া, মিথ্যা ও পাপের বিরুদ্ধে, অঙ্গ-মন্যুর বিরুদ্ধে, লড়াই করা। পাপ-পুণ্যের যুদ্ধে মানুষ হইতেছে ঈশ্বরের সৈনিক মাত্র। প্রাচীন ঈরানের ভাষায়, 'সত্য' অর্থে "অর্ত" বা "অষ" শব্দের ব্যবহার হইত ; এই দুইটি শব্দ হইতেছে আমাদের সংস্কৃত "ঋত" শব্দের ঈরানী প্রতিরূপ, প্রাচীন-পারসীকে "অর্ত" ও অবেস্তার ভাষায় "অষ" ; তদ্রূপ, 'মিথ্যা'-অর্থে আমাদের "দ্রোহ" শব্দের প্রতিরূপ প্রাচীন-পারসীকে "দ্রউজ" ও অবেস্তার ভাষায় "দ্রুজ্" শব্দ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে, ইস্‌লামেও এই দ্বৈতভাব, পুণ্য ও পাপের বা সত্য ও মিথ্যার শাশ্বত বিরোধ, দেখা যায়। ঈরানীদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিলালেখ প্রভৃতিতে, অবেস্তা গ্রন্থে ও হখামনীষীয় বংশের সম্রাট্‌দের লিপিতে, সর্বত্র দেখিতেছি, "অর্ত"-র (বা

"অষ"-র) পক্ষ লইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষ লইয়া, "দ্রউজ"-র (বা "দ্রুজ্"-এর), অর্থাৎ মিথ্যা, অজ্ঞান, পাপ বা শয়তানেব বিরুদ্ধে লড়াইযের কথা, বিশেষ জোর দিয়া বলা হইতেছে। সত্যের প্রতি আস্থা প্রাচীন ঈরানীয় চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণীয় গুণ ছিল, হেরোদোতস্-প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ঈরান। স্থফীগণের চিন্তায় ও ভাষায়—ঈশ্বর বা পবম-পুরুষ বা সত্যময-পবব্রহ্ম-ই যে 'ঋত'—এই প্রাচীন আর্য্য ভাব, আরবী-ভাষায় "অল্-লাহ্"-কে জানাইবার জন্য "অল্-ঃহক্ক্" শব্দের প্রযোগেব বাহুল্যে, নূতন কবিয়া কি আত্মপ্রকাশ করিল?

প্রথম যুগের স্থফীবা কতকগুলি নূতন চিন্তাধাবা আনযন করেন। বগদাদের স্থফী ম'রূফ্ অল্-করূখী (মৃত্যু খ্রীষ্টাব্দ ৮১৫; ইনি ঈরানী-বংশীয় ছিলেন. যদিও ভাষায আরব হইয়া গিয়াছিলেন) একজন দিব্যোন্মাদ-যুক্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি তপস্যা ও কৃচ্ছ্র-সাধন অপেক্ষা অনুভূতিব দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছিলেন। ইনি যে কথা বলিতেন—"ভক্তি মানুষেব শিক্ষায মিলে না, ইহা ঈশ্বরেব দান, তাঁহার করুণায় পাওযা যায"—এই কথা, উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" এই শ্লোকেব যেন প্রতিধ্বনি। ম'রূফ্ প্রথম তস্বর্র্ফের সংজ্ঞা নির্ণয কবিযা দেন—"তস্বর্রুফ বা ঈশ্বরানুভূতি হইতেছে সত্য বস্তু-সমূহেব বোধ, এবং স্থষ্ট জীবগণের হাতে যাহা আছে তাহার পরিত্যাগ" (আরবীতে—'অত্-তস্বর্রুফু 'অল্-'অখ্ধু বি-ল্ ঃহকা'ইকি, র-ল্-য়'অসু মিম্-মা ফী-ল্-'অয়্দী-ল্-খলা'ক্বি); অর্থাৎ, বিষয়-নিস্পৃহতার উপরেই তত্ত্ব-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। আবু স্থলয্মান্ ইরাকী (মৃত্যু ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে) স্থফী চিন্তায় "মারিফৎ" (ম'রীফৎ) অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জগতের বিশেষ জ্ঞানকে, অর্থাৎ শাস্ত্রাতীত অনুভূতি-জাত আধ্যাত্মিক বোধকে একটি প্রধান স্থান দিলেন। এই মারিফৎ, গ্রীকদের gnōsis-এর কল্পনা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। ইঁহাদের পরে প্রকটিত হন আবু-ল্-ফয়্দ্ থওবান্ বিন্-ইব্রাহীম ধু-ন্-নুন্ অল্-মিস্‌রী (মৃত্যু ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি মিসর-দেশের অধিবাসী ছিলেন, ইঁহার উপনাম "ধু (বা জ্)-ন্-নুন্" অর্থাৎ 'মৎস্যবান্' দ্বারাই ইনি বেশী পরিচিত। ইনি মারিফৎ-বাদকে পূর্ণ-ভাবে

স্বীকার করেন, এবং ঈশ্বরের সত্তায় নিলীন হইয়া মানুষ যে আনন্দ-রস (wajd রজ্দ্) অনুভব করে, তাহা-ই জীবনে একমাত্র কাম্য, এই শিক্ষা ইনি দেন।

"'অন-ল্-ঃহক্ক্"-মন্ত্রের প্রধান সাধক সূফী মহর্ষি হুসয়্ন্ বিন্-মন্সূর অল্-হল্লাজের নাম বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে পরিচিত। স্বর্গীয় মোজাম্মেল হক্-রচিত "মহর্ষি মনসূর" পুস্তকে প্রকাশিত তাঁহার জীবনী অনেকেই পাড়য়াছেন। মন্সূরের জাবন-কথা ও তাঁহার মত-বাদ এবং শিক্ষা লইয়া ফরাসী পণ্ডিত Louis Massignon লুই মাসিঞঁ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে যে তথ্য-পূর্ণ ও উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন (La Passion d'al-Hosayn Ibn-Mansour al-Hallaj, Martyr Mystique de l' Islam), তাহা হইতে ইঁহার সম্বন্ধে সব-কিছু খবর পাওয়া যাইবে। ইনি শীরাজের নিকটে বয়্জা (বয়্দ্বা) নামক গ্রামে ৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইরাকে বগ্দাদ নগরীতে ও অন্যত্র বেশী সময় অতিবাহিত করেন, তিন বার মক্কা-দর্শন করিয়া আসেন। ৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে যান; ভ্রমণের উদ্দেশ্য এই বলিয়া প্রকাশ করেন যে, তিনি ভারতের জাদুবিদ্যা শিখিতে এবং তথায় সত্য-ধর্ম প্রচার করিতে যাইতেছেন। জাহাজে চড়িয়া ইরাক হইতে যাত্রা করিয়া গুজরাটে অবতরণ করেন, পরে সিন্ধু-নদ ধরিয়া মুলতান হইয়া কাশ্মীরে যান; মধ্য-এশিয়ায় ও ঈরানে বহু ভ্রমণ করেন, যেরুশালেম-নগরও দর্শন করিয়া আনে। 'অন-ল্-ঃহক্ক্' মন্ত্র প্রচারের ফলে ইনি গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হন, তাঁহারা ইঁহার এই মন্ত্রকে ঈশ্বরত্বের দাবী বলিয়া ইস্লাম-বিরোধী পাপ-রূপে ঘোষণা করেন। সুদীর্ঘ বিচারের পরে নিষ্ঠুর-ভাবে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় (৯২২খ্রীষ্টাব্দে); প্রথম তাঁহাকে পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারা হয়, পরে তাঁহার দুই হাত ও দুই পা কাটিয়া ফেলা হয়, এক রাত্রি এই অবস্থায় তাঁহাকে তেকাঠায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পরদিন তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়।

এইভাবে প্রাণ দিয়া আপন বিশ্বাস অটুট রাখিয়া, সূফী মত-বাদকে হল্লাজ যে প্রতিষ্ঠা দান করিয়া গেলেন, তাহার ফলে তাঁহার পরে ইস্লামের অনেক-খানি সূফী অনুভূতি ও দর্শনের আওতায় আসিয়া পড়িল। মন্সূরকে জুয়াচোর এবং মতলব-বাজ বলিয়া মনে করিত, এমন

লোকেরও অভাব ছিল না ; তাঁহাকে নিন্দা করিয়া অনেক কথাও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহর প্রভাব কমিল না। মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কথিত আছে তিনি ৪৬ খানি বই লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক মাসিঞঁ হল্লাজের রচনাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার কতকগুলি উক্তিও মহামূল্য। অনেক কবিতাও ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। হল্লাজের দর্শন ও অনুভূতি বুঝিতে না পারিযা প্রবল-প্রতাপ শরিয়তী কাজী ও মোল্লারা যেমন তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল, তেমনি ওদিকে অনুভব-শীল জন-সাধারণ তাঁহাকে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের সম্মান দিল। হল্লাজ ইস্‌লামের জগতে এক শ্রেষ্ঠ "শহীদ" অর্থাৎ ধর্মার্থে প্রাণত্যাগীব আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁহার ব্যক্তিত্ব অদ্ভুত ছিল। তিনি ভারতবর্ষে আসিযাছিলেন—কেবল কি জাদু-বিদ্যা শিখিতে আসিয়াছিলেন? ভারতের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদেব সঙ্গে, যোগী ও সাধকদের সঙ্গে, তাঁহার কি দেখা হয় নাই—তাঁহাদেব নিকট হইতে তিনি কি কিছু-ই পান নাই? পাঞ্জাব ও কাশ্মীব তখন হিন্দুবই দেশ ছিল, হিন্দু জাতি তখন মরে নাই। "অহং ব্রহ্মাস্মি"-মন্ত্র কি তাঁহাকে " 'অন-ল্‌-হক্‌ক্‌"-মন্ত্র জপে আরও বেশী কবিযা উদ্বুদ্ধ কবে নাই? ইঁহাব গুরু জুনয়দ্‌ ইঁহাকে এই ভাবে এই মন্ত্র প্রচার কবিতে নিষেধ করেন ; "আমি-ই সত্য বা ব্রহ্ম", একথা না বলিয়া, "আমি-ই সত্যেব জন্য" (অন-বি-ল্‌-হ ক্‌ক্‌), এই কথা বলিতে উপদেশ দেন ; হুসয়্‌ন্‌ বিন্‌-মন্‌সূব তাহা শুনেন নাই। সে যুগেব কথা আমরা সব জানি না ; কিন্তু তখন দেশে-দেশে ধর্মে-ধর্মে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে লেন-দেন কিছু কম ছিল না। গ্রীক নব্য-প্লাতোনিক দর্শন সূফী দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাভূমি হইলেও, বেদান্ত-মতের সহিত সূফী দর্শনের সাম্য এত অধিক যে কতকগুলি প্রধান বিষযে প্রাচীনতর বেদান্তের প্রভাব মানিতেই হয়। যাঁহাদের মাধ্যমে এই প্রভাব গিযাছিল, হল্লাজ তাঁহাদের একজন হইতে পারেন। তবে বেদান্তের প্রভাব না বলিয়া, স্বাধীন ভাবে ভারত ও ঈরান উভয় দেশে একই ধরণের অনুভূতি ও দর্শন আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে, একথাও বলা যায়।

মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজের প্রতি যখন নিষ্ঠুর মৃত্যু-দণ্ড জ্ঞাপন করা হইল, তখন তিনি অটল রহিলেন। ইঁহার মৃত্যুর দিনের কথা ইঁহার শিষ্যদের কেহ-কেহ,

ইঁহার পুত্র, এবং অন্য নিরপেক্ষ বা বিরোধী ব্যক্তিগণ লিখিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া বধ করিবার জন্য কারাগার হইতে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবস্থায় বাহিরে আনা হয়, তখন তিনি হাসিতেছিলেন। একজন শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু, তোমার এ অবস্থা কেন?"—তিনি উত্তর করিলেন—"তার রূপের আদর এই প্রকার; যারা তার সঙ্গে মিলন চায়, তাদের এই ভাবেই সে (=প্রেমিকারূপে কল্পিত ঈশ্বর) টেনে নেয়!" তাহার পরে আরবী-ভাষায় এই শ্লোক দুইটি রচনা করিয়া পাঠ করিলেন—

নদীমী ঘয়্র মন্‌সূবিন্ ইলা শয়্'ইন্ মিন-ল্-হয়্ফি।
সক্কা-নী—মিথ্‌ল মা য়শ্‌রিবু ক-ফা-লি-দ্ব্-দ্বয়্বি বি-দ্ব্দ্বয়্ফি।
ফ-লম্মা দারতি-ল্-কাসি, দা'আ বি-ন্-ন্ত্'ই ব-স্-সয়্ফি।
ক-ধা মন্ য়শ্‌রিবু-র্-রাঃহ, মা'অ-ত্-তিন্নীনি ফী-স্-সয়্ফি॥

"আমাব বন্ধু,—সে দয়ামায়ার কোনও-কিছুর সহিত সম্বন্ধের বাইরে। আমায় সে পান করালে যেন যা সে নিজে পান করে, যেমন বন্ধু অতিথি-বন্ধুর সঙ্গে করে। সুরা-পাত্র ঘুরে' আসবার পরে, সে আনিয়ে' নিলে মাথা-কাট্‌বার জন্য চামড়ার আসন (নত্'ং), আর তলোয়ার। এমনি-ই তার ঘটে, যে সুরাপান করে মহানাগের সঙ্গে, গ্রীষ্মকালে॥"

("তিন্নীন্" অর্থে Dragon বা 'মহানাগ'; অধ্যাপক মাসিঞোঁ-র মতে, সূফী দর্শনের ইহা একটি পারিভাষিক শব্দ, ইহার আভ্যন্তর অর্থ হইতেছে "য়কীন" অর্থাৎ 'স্থির বা ধ্রুব সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বর'। শেষ ছত্র আমাদের ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৬ সূক্তের শেষ ঋকের দ্বিতীয়ার্ধ মনে করাইয়া দেয়—"কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্ রুদ্রেণাপিবৎ সহ"—'যেহেতু, কেশী অর্থাৎ দিব্যোন্মাদযুক্ত দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী, রুদ্রের সঙ্গে এক-পাত্রে বিষপান করিয়াছেন।')

ইহার পরে, হল্লাজ যথারীতি নমাজ পড়েন, এবং সঙ্গীদের উপদেশ ও উৎসাহ দেন। চাবুক মারার কালে প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে "আহাদ! আহাদ্" (অঃহদ্, অঃহদ্) অর্থাৎ 'এক। এক!' (একমেবাদ্বিতীয়ম্) এই বীজমন্ত্র বলিতে থাকেন। হাত পা কাটিয়া ফেলিবার পরের দিনও ইনি সজ্ঞান অবস্থায় জীবিত থাকেন, এবং এই ধরণের কথাবার্তা করেন ও উপদেশ দেন বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শিগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

হুসয়্‌ন বিন্‌-মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজকে সূফী সাধকমালার মধ্যমণি বলা যায়। তাঁহার তিরোধানের পরে সূফী মত-বাদ—দর্শন ও চিন্তা—বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজ ও তাঁহার পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক সত্য-দ্রষ্টাদের অনুভূতির আধারে, পরবর্তী যুগের mystic বা 'মরমিয়া' কবি ও দার্শনিকগণ ইরাকে, আরবে, শাম বা সিরিয়ায়, মিসরে, মগরেবে ও স্পেনে এবং রূম বা তুর্কীস্থানে, ঈরানে, মধ্য-এশিয়ায় ও ভারতবর্ষে, আরবী এবং ফারসী ভাষায় কাব্য ও কবিতা এবং বিচার-পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া, বিরাট্ এক সূফী সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন। মুসলমান ধর্মে ৭২টি সম্প্রদায় আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রায় সব সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে তসব্‌বুফ্‌ দেখিতে পাওয়া যায়; শরিয়তের সঙ্গে, কোরান ও হদীস-এর সঙ্গে, এই সূফী অনুভূতির নানাভাবে আপসের চেষ্টা হয়। একটি আপস এইভাবে হইয়াছে। ভগবানের বাণী আরবী কোরানে প্রচারিত হইয়াছে—কিন্তু এই আরবী কোরান হইতেছে 'জাহিরা' অর্থাৎ প্রকাশিত কোরান; ইহা ব্যতীত এক 'গায়েবী' (ঘয়্‌বী) বা গুপ্ত কোরান আছে, তাহা হইতেছে গুরু-মুখে প্রাপ্ত সূফী-বাদ। সূফী সমাজে গুরুর (পীর বা মুর্‌শিদ-এর) স্থান অতি উচ্চে, আমাদের আধুনিক হিন্দু-সমাজে যতটা আছে বা ছিল, প্রায় ততটা।

সূফী অনুভূতি ইস্‌লামের মধ্যে এক অভূত-পূর্ব কোমলতা ও ভাব-প্রবণতা আনিয়া দিয়া, ইহাকে বিশ্বমানবের দৃষ্টিতে সুন্দরতর ও শোভনতর করিয়া দিয়াছিল। অল্‌-ঘজালীর মতো দার্শনিক সেই কথা প্রণিধান করিয়া প্রাথমিক ইস্‌লামের সঙ্গে তসব্‌বুফের বিরোধকে যুক্তি-তর্ক ও বিচার দ্বারা মিটাইয়া দিয়াছিলেন। সূফী মতের সহিত অন্য ধর্ম-মতের বিরোধ নাই; সকল ধর্মের মধ্যে এক-ই সার সত্য বিদ্যমান, সকল ধর্ম-ই ঈশ্বর-লাভের পথ, হিন্দু ধর্মের অনুমোদিত এইরূপ মনোভাব সূফী সাহিত্যে সুস্পষ্ট; ইস্‌লামের মধ্যে সূফীরাই এই কথা সাহসের সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। সর্ব জাতির মধ্যে বিদ্যমান ঈশ্বর-লাভের চেষ্টাকে সহানুভূতি-শীল, কবি ও ভাবুকের দৃষ্টিতে সূফীগণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। ইব্‌নু-ল্‌-ফরীদ্‌, ইবনু-ল্‌-'অরবী, হকীম সনাঈ, মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী, শমসুদ্দীন হাফেজ, নূরুদ্দীন জামী—ইঁহারা মানুষকে নূতন স্বর্গ দেখাইয়াছেন; তাহার মনের ও আত্মার সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া, তাহাতে জিন্নৎ বা ফিরদৌসের অর্থাৎ অমরার হাওয়া বহাইয়াছেন;

সমগ্র মানব-জাতির জন্য ইঁহারা ভাবুকতার, সৌন্দর্য্যের ও আধ্যাত্মিক আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সূফী পণ্ডিতেরা, দর্শন-শাস্ত্রের সাহায্যে বিশেষ খুঁটি-নাটির সঙ্গে সূফী অনুভূতি ও উপলব্ধি, কল্পনা ও কাব্যের প্রসারণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণ প্রভৃতি করিয়া, জিনিসটিকে সাধারণ মানুষের পক্ষে হয়-তো একটু জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই : সাধারণ মানুষের জন্য তস্বর্‌রুফের মূল কথাগুলি আছে, অল্‌-হুসয়ন্‌ বিন্‌-মন্‌সূর অল্‌-হল্লাজের জীবনী আছে, রাবেয়া ও অন্য সূফীদের উক্তি আছে, ইব্‌নু-ল্‌-ফরীদ্‌, ইব্‌নু-ল্‌-'অরবী, ফরীদুদ্দীন অত্তার, মৌলানা রূমী, হাফেজ ও জামীর আরবী ও ফারসী কবিতা আছে। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও অনুভূতিতে বিশ্বমানবকে মুসলমান আরব ও পারস্যের ইহা-ই শ্রেষ্ঠ দান; ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বলিয়া ভারতেও আমরা, মিসর শাম ইরাক আরব ও পারস্যের ইস্‌লামের এই উপহার পাইয়া, সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, ও তদ্দ্বারা আমাদের নিজেদেরও আধ্যাত্মিক সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পারস্যের অন্তিম সূফী মহাকবি নূরুদ্দীন জামী(১৪১৪—১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ)-রচিত সূফী-মত-সার-সংগ্রহ স্বরূপ Lawā'ih "লবা'ইঃহ্‌" অর্থাৎ 'রশ্মিরাজি' বা 'কিরণাবলী' নামক গ্রন্থ হইতে গদ্যময় একটি প্রার্থনা অনুবাদ করিয়া দিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি (ইহার আরম্ভ আরবীতে, বাকী সমস্তটুকু ফারসীতে)—

"হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জড়িত থাকা হইতে আমাদের মুক্ত করো ; এবং সমস্ত বস্তুর সত্য স্বরূপকে আমাদের দেখাও (র 'অরি-না ঃহকা'ইক-ল্‌-'অশ্‌য়া'ই ক-মা হিয়)। আমাদের বিচার-চক্ষুর উপরে যে গাফিলতীর (অমনোযোগের) পরদা পড়িয়াছে, তাহা সরাইয়া দাও, এবং প্রত্যেক বস্তু, যেমনটি আছে তেমনি আমাদের দর্শন করাও। নাস্তি বা অসৎকে আমাদের নিকট অস্তি বা সতের রূপে প্রকাশিত করিও না (নীস্তী-রা বর্‌ মা দর্‌ সূরত্‌-ই-হস্তী জল্‌বহ্‌ ম-দিহ্‌), এবং সতের সৌন্দর্য্যের উপরে অসতের পরদা রাখিও না (ব অজ্‌ নীস্তী বর্‌ জমাল্‌-ই-হস্তী পরদহ্‌ ম-নিহ্‌)। পরিদৃশ্যমান রূপ-সমূহকে তোমার সৌন্দর্য্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রতিচ্ছায়া (আয়না, আরশী) করো, এগুলিকে আবরণের এবং দূরত্বের কারণ করিও

না, এবং এই-সকল মায়াময় কাল্পনিক চিত্রকে আমাদের জ্ঞান ও সত্য-দর্শনের সাধন করিয়া দাও—এগুলিকে অজ্ঞান ও অন্ধত্বের সাধন করিও না। আমাদের সব অভাব ও সব দূরীভবন (প্রবাস) আমাদের নিজের হইতেই ঘটে; আমাদের নিজেদের মধ্যে আমাদিগকে ফেলিয়া রাখিও না, বরং আমাদিগ-হইতেই আমাদের মুক্তি দাও, এবং আমাদিগকে তোমায় জানিতে দাও॥"

এই প্রার্থনাটি যেন উপনিষদের "অসতো মা সদ্ গময়" মন্ত্রের একটি অনুভূতিময় ব্যাখ্যা।

মন্তব্য।—আরবী ব্যঞ্জনবর্ণের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণ, এই রীতি অনুসারে আরবী শব্দ ও বাক্যগুলিতে করা হইয়াছে :—[', ব, ত, থ, জ, ঃহ, খ, দ, ধ, র, জ, স, শ, স্ব, দ্ব, ত্ব, ধ্ব, ', ঘ, ফ, ক্ক, ক, ল, ম, ন, ৱ, হ, য়, ৎহ বা ৎ]।

[বঙ্গাব্দ ১৩৫০]

অল্‌-বীরূনী ও সংস্কৃত

আবু রয়্‌হান মুহম্মদ ইব্‌ন্‌ অহ্‌মদ অল্‌-বীরূনী (অথবা অল্‌-বেরোনী) ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক খীবা রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের গজনী নগরে ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ে খীবা রাজ্যের নাম ছিল Khwarizm খ্‌বারিজ্‌ম্‌, এবং প্রাচীনকালে গ্রীকেরা এই দেশকে Chorasmia 'খোরাস্মিয়া' বলিত। অল্‌-বীরূনী মধ্যযুগের এক অতি বিরাট্‌ পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত। এই বহু-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত একাধারে গণিত এবং ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং দর্শন, রসায়ন এবং ঐতিহাসিক কাল-নির্ধারণ, ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, প্রভৃতি প্রায় তাবৎ বিদ্যায় সমান ভাবে পারদর্শী ছিলেন। উপরন্তু তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ভারত-বিদ্যাবিৎ ছিলেন, এবং তাঁহার মতো ভারত-সম্বন্ধে এত বড়ো পণ্ডিত, বিদেশীদের মধ্যে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একদিকে ছিল তাঁহার সূক্ষ্ম ও সর্বগ্রাহী পাণ্ডিত্য, আর অন্যদিকে ছিল তাঁহার এক প্রশস্ত উদারতা বস্তুনিষ্ঠতা; এই উভয়বিধ গুণের জন্য অল্‌-বীরূনীকে সমগ্র মানবজাতির প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। বিখ্যাত জর্মান পণ্ডিত Elward Sachau এডুয়ার্ড জা-খাউ, যিনি অল্‌-বীরূনীর দুইটি মুখ্য গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার নিকট আধুনিক জগৎ অল্‌-বীরূনীর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় পুস্তকের আরবী-ভাষার মূল এবং ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের জন্য বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ থাকিবে, তিনি (এডুয়ার্ড জাখাউ) অল্‌-বীরূনীর পাণ্ডিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবত্তা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। (মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, লণ্ডন হইতে, এবং ইংরেজী অনুবাদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। জাখাউ পণ্ডিত ও মানুষ হিসাবে অল্‌-বীরূনীর সকৃতির যে সশ্রদ্ধ প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন, সে প্রশস্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রাপ্য; উপরন্তু, ধীর বাচংযমতার জন্য যে প্রশস্তি সকলেরই মনে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা—এবং সর্বোপরি, অল্‌-বীরূনীর গ্রন্থের স্বকীয় মহত্ত্ব—এই-সকল মিলিয়া,

অল্‌-বীরূনীর আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। অল্‌-বীরূনী, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, আরও বেশি করিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য, কারণ তিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রথম বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকার-রূপে দেখা দেন। মনে হইতেছে যে, এখন এতদিন পরে অল্‌-বীরূনী তাঁহার উচিত সমাদর কথঞ্চিৎ লাভ করিবেন; কারণ তাঁহার তিরোধানের প্রায় ৯০০ বৎসর পরে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে প্যারিসে যে একবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌-মহাসম্মেলন হয়, তাহাতে "অল্‌-বীরূনী সহস্রবার্ষিকী" উদ্‌যাপন করা হয়; তাহার পরে কলিকাতায় ঈরান-সমিতির উদ্‌যোগে অল্‌-বীরূনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

যদিও অল্‌-বীরূনীর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য গভীর ও বিস্তৃত ছিল, কেবল তাহারই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তিনি কেবল নিছক পণ্ডিত ছিলেন না, ইহার চেয়ে তিনি আরও বড়ো ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়ধর্মী মানুষ; তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, সম্পূর্ণ অন্য বাতাবরণের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে এমন অন্য একটি জনগণের সভ্যতাবিষয়ক কৃতিত্বকে কখনো লঘু করিয়া দেখিতে দেয় নাই। বিশেষ-শাস্ত্র-নিবদ্ধ গোঁড়া-মতের ধর্মের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী—যাহা সত্যকে কেবল নিজেরই আয়ত্ত বলিয়া মনে করে, এবং অন্য ধর্ম-মতকে সেই এক-ই সার-সত্যের সন্ধানে সহযাত্রী-রূপে দেখিয়া সহানুভূতির সহিত তাহার আলোচনা ও প্রণিধানের পক্ষে যাহা প্রায়-ই অনুকূল নহে—অল্‌-বীরূনীর মন সেইরূপ সংকীর্ণতা হইতে বিশেষভাবে মুক্ত ছিল। সত্য বটে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অল্‌-বীরূনীর পুস্তকের সম্পূর্ণ আরবী নামকরণ হইয়াছিল একজন গোঁড়া মুসলমান-ধর্মে-বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকোণ হইতে, যথা—"যাহা স্বীকার্য্য এবং যাহা বর্জনীয়, এইরূপ উভয়বিধ বস্তু লইয়া হিন্দুচিন্তার সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের এক যথাযথ বর্ণনা" (কিতাব···ফী তহ্‌কীক মা-ল্‌·হিন্দ্‌ মিন্‌ মক্‌লহ্‌ মুকবূলহ্‌ ফী-ল্‌-'অকল্‌ অব্‌ মিরূধুলহ্‌), তথাপি এই পুস্তক বাগ্‌বিতণ্ডাময় অথবা প্রচার-মূলক নহে, এবং বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণকে অন্য সমস্ত দৃষ্টিকোণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে নাই। হিন্দুরা ঐ সময়ে জীবন-সংগ্রামে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী

তুর্কীদের নিকট হারিয়া যাইতেছিল, এবং সেইজন্য বাহির হইতে আগত একজন বিশ্বাসী মুসলমান ও উপরন্তু পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার মনে যে হিন্দুদের তুলনায় স্বজাতির সম্বন্ধে একটি সহজবোধ্য শ্রেষ্ঠতার ভাব থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক ছিল। এইজন্য হয়-তো ইনি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এবং সহজভাবে একথা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, তাঁহার ইস্‌লামী মনোভাব, হিন্দু মনোভাব অপেক্ষা আরও অধিক আন্তর্জাতিক ও যুক্তিতর্কানুমোদিত বলিয়া, উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই বোধ সত্ত্বেও, তিনি তুলাদণ্ড সমান করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু-জগতে যে সমস্ত বস্তু এবং বিচার, অনুষ্ঠান এবং ভাবধারা, বৈজ্ঞানিক ও সহজবুদ্ধির মানুষ বলিয়া তাঁহার অনুমোদন লাভ করে নাই, তিনি সেগুলিকে কেবল beastly devices of the heathen "বিধর্মী বা কাফেরের পশুপ্রকৃতিক আচার-প্রণালী" বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। পৃথিবীর অন্য অংশের মানব-সমাজের মধ্যে, যেমন প্রাচীন গ্রীকদের অথবা প্রাচীন আরবদের মধ্যে, প্রচলিত অনুরূপ বিষয় বা বস্তুর নজির সংগ্রহ করিয়া তিনি ইহা প্রমাণিত করিতে সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন যে, এই-সব বিষয়ে হিন্দুরা ছিল সাধারণ মানবের মতোই। তাঁহার আরবী গ্রন্থের মুসলমান পাঠকবৃন্দের মনে যদি ভারতবর্ষের লোকেদের সম্বন্ধে ঘৃণা বা তুচ্ছতার ভাব দেখা দেয়, তিনি এই উপায়ে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-পূত মনের উপযুক্ত এই পৃথক্‌ বা উর্ধ্বে অবস্থান অথবা নৈর্ব্যক্তিকতা, এবং ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত অথবা জাতি-সংক্রান্ত বিষয়ে অপক্ষপাতিতা, অল্‌-বীরূনীর এই গুণ থাকার দরুন, ভারতবাসী আমাদের (বিশেষ করিয়া হিন্দুদের) তাঁহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং এই জন্য সমগ্র বিজ্ঞান-অনুশীলক পণ্ডিতসমাজেরও উচিত তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। মানবিকতার দিক্‌ হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, অল্‌-বীরূনীর এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিছক পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আরও অধিক মহার্ঘ্য বস্তু।

তাঁহার সময়ে অল্‌-বীরূনী ছিলেন একজন অদ্ভুত দৃষ্টির পণ্ডিত। যখন তিনি তাঁহার মানসিক জীবনের পূর্ণ পরিণতিস্তরে ছিলেন, ধরা যাউক অনুমানিক ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৯০০ বৎসরেরও অধিক কাল আগে, তখন নিঃসন্দেহ-রূপে তিনি সমগ্র জগতের মধ্যে সকলের

চেয়ে বিদ্বান্ এবং সকলের চেয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। সে সময়ে চীনদেশের এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দৃষ্টি কেবল চীন অথবা ভারতবর্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল ; এই দুই দেশের বিদ্বান্‌দের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যাঁহার মনে পশ্চিমের অর্থাৎ ইস্‌লামিক জগতের—তথা প্রাচীন গ্রীসের এবং প্রাচীন রোমের—বিরাট্ সভ্যতার সম্বন্ধে অল্পমাত্র ধারণাবও অবকাশ ছিল। ওদিকে ইতালি সমেত সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে ঐ যুগ ছিল এক অন্ধকারময় যুগ— লাতিন ভাষার মাধ্যমে একটু খ্রীষ্টান ধর্মের জ্ঞান, এবং প্রাচীন লাতিন লেখকদের দুই চারিখানি গ্রন্থ যাহার পাঠ অল্প কয়জন উৎসাহী পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত, এইটুকু-ই ছিল তখন পশ্চিম-ইউরোপে বিদ্যার পরিধি। পূর্ব-ইউরোপে খ্রীষ্টান গ্রীক অর্থাৎ Byzantine বা বিজান্তীয পণ্ডিতদের মধ্যেও তেমনি আরব ও অন্য প্রাচ্যদেশীয় জাতিব সাহিত্য অথবা সংস্কৃতির সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। মুসলমান আরব সাম্রাজ্য, সিরিয়া, মিসব, উত্তর-আফ্রিকা, স্পেন ও সিসিলি-দ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, ইউবোপে বিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার উদ্ভব হইল। অল্-বীরূনীর মধ্যে এই আন্তর্জাতিকতা অসাধারণ-ভাবে দেখা দেয়। তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ফারসী ; কিন্তু তুর্কীভাষী খ্বারিজ্‌ম্ দেশের মানুষ ছিলেন তিনি, এবং পরে তিনি গজ্‌নী নগরের তুর্কীভাষী অভিজাত সমাজে বিচরণ করিতেন, এইজন্য তুর্কীভাষাও তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তাঁহার মতন জিজ্ঞাসু এবং সর্ববিষয়ে রসগ্রহণেচ্ছু পণ্ডিত, এই দুই ভাষার যতটুকু সাহিত্য হাতের কাছে পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, এমন অনুমান করা যায়। আরবী ভাষা তখন ছিল সমগ্র ইস্‌লামিক জগতের ধর্মশাস্ত্র এবং সংস্কৃতির ভাষা ; এই আরবী তিনি খুব ভালো রকমই জানিতেন—ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজী-লেখকগণের মধ্যে ইংরেজীর জ্ঞান যতটা গভীর ও ব্যাপক রূপে দেখা যায়, অল্-বীরূনীর আরবীর জ্ঞান অন্ততঃ ততটা ছিল, ইহা অনুমান করা সহজ ; সম্ভবতঃ তাঁহার আরবীর জ্ঞান আরও গভীর ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং বিজান্তীয় বা মধ্যযুগের খ্রীষ্টান গ্রীক, তথা সিরিয়ান, জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকটার সহিত, উপরন্তু গণিতে ও জ্যোতিষ-বিদ্যায় ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তারও একটা বড়ো অংশের সহিত

এই আরবী ভাষায় অনুবাদের মারফৎ তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। বগদাদ-নগরে আরবের ইস্‌লামী সভ্যতার দ্বিতীয় যুগ হইতে, আরবী ভাষা, আরবদেশের আশ-পাশের দেশগুলিতে প্রাচীনতর যে-সমস্ত সভ্যতা ছিল, সেগুলিতে সঞ্চিত সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অল্‌-বীরূনী Plato প্লাতোন এবং Aristotle আরিস্তোতল-এর লেখা হইতে তাঁহাদের বক্তব্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন; এই প্রাচীন গ্রীক লেখকদের গ্রন্থের সহিত, সিরিয়ান ভাষায় অনুবাদের আরবী অনুবাদ হইতে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই ভাবে দুই হাত ঘুরিয়া আসিলেও, তিনি মূল দার্শনিকগণের ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য এবং উপযোগিতা ভালো ভাবেই বুঝিতেন। এদিকে আবার তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত কপিল ও ব্যাস হইতে, বরাহ-মিহির হইতে, সংস্কৃত পুরাণ-সমূহ হইতে নানা উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন—এবং আরও বড়ো কথা এই যে, এই ভারতীয় লেখকগণের মূল ভাষা তিনি জানিতেন—এবং এইরূপ জ্ঞান তাঁহার স্বজাতির মধ্যে নিতান্তই বিরল ছিল। ভারতীয় হিন্দু, আরব-ঈরানীয় ও তুরানীয় অর্থাৎ তুর্কী-সমেত সমগ্র ইস্‌লামীয়, উপরন্তু সোজাসুজি গ্রীক হইতে না হইলেও সিরীয় ও আরবী ভাষার মারফৎ প্রাচীন গ্রীসের—এতগুলি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্য জগতের সহিত তুল্য পরিচয় রাখা, আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০-এর দিকে, সরল বা সহজ ব্যাপার ছিল না; এবং যতদূর জানা যায়, সমগ্র সভ্য জগতে এইরূপ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সেই যুগে একজন মাত্র ছিলেন—তিনি হইলেন অল্‌-বীরূনী।

যে রাজার অধীনে অল্‌-বরূনী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে—তাঁহার ৪৪ বৎসর বয়স হইতে ৫৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—বাস করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মহামহিম গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ; কতগুলি রাজনীতিক ঘটনা-পরম্পরার কারণে, এই রাজার পক্ষে অল্‌-বীরূনীর একজন বিদ্যোৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, যদিও এইরূপ পৃষ্ঠপোষক হওয়া তাঁহার উচিত ছিল। কেন যে এইটি হয় নাই, তাহার কারণাবলী জাখাউ বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহ্‌মূদের দরবারে, মহ্‌মূদের শত্রুপক্ষীয় অন্য রাজ্যের প্রতিভূ বা জামিন হিসাবে অল্‌-বীরূনী আসিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য নিশ্চয়ই সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত, কিন্তু রাজনীতিক কারণে তিনি উপযুক্ত সহায়তা

ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। গজনীর সুলতান মহ্‌মুদ এক অতি শক্তিশালী রাজা ছিলেন; অন্ধবিশ্বাস-পূর্ণ ধর্মীয় আগ্রহ এবং ধনরত্ন লুণ্ঠনের উগ্র প্রবৃত্তি, এই উভয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইয়াছিলেন; এই অভিযান-সমূহের দ্বারা তিনি প্রতিবেশী হিন্দুগণের সমূহ ও অনপনেয় ক্ষতি করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তিনি বধ করেন, এবং দাস করিয়া ধরিয়া লইয়া যান, এবং বহু নগর, মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেন, ও কোটি কোটি টাকা লুঠ করিয়া লইয়া যান। এই সকল অভিযানের ফলে, হিন্দু জনসমূহের মনে মহ্‌মুদ ও তাঁহার তুর্কী সেনার প্রতি কোনো অনুকূল বা মিত্রতার ভাব আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং হিন্দুদের মধ্যে "তুর্ক" এই নামটি, ভয়ের এবং ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়ানো স্বাভাবিক ছিল। ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে মহ্‌মুদ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। দেশের অধিবাসী প্রায় সকলেই হিন্দু হইলেও, এই ভাবে একজন মুসলমান রাজার অধীনে আসায়, এই দেশ এক "শান্তির দেশ" (দারু-স্‌-সলাম) হইয়া দাঁড়াইল, যেখানে অবাধে মুসলমান ধর্মের প্রসার হইতে লাগিল, এবং যেখানে, সিপাহি হোউক অথবা পণ্ডিত হোউক, যে-কোনো মুসলমানের অবাধ চলাফেরা সহজ হইল। এইরূপ অবস্থা অল্‌-বীরূনীর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল—তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এবং সেখানে অবস্থান করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির আলোচনা করিবার এক বিশেষ সুযোগ পাইলেন। ইহার পূর্বে, জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচক-রূপে তাঁহার নিকট এই দুই বিজ্ঞানের বিষয়ে হিন্দুদের লেখা বই আরবী অনুবাদের মারফৎ যাহা পহুঁছিযাছিল, তাহা-ই তাঁহাকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাধ্য হইয়া তাঁহার নিজের দেশ খারিজ্‌মের জামিন-রূপে ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাকে গজনীতে থাকিতে হইল। তখন-ই সম্ভবতঃ হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সোজাসুজি জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ তাঁহার ঘটিল। ঐ-সময়ে গজনী-নগরী ছিল এশিয়া খণ্ডে অন্যতম বিশাল মুসলমান রাজ্যের কেন্দ্র; এবং মহ্‌মুদের মতো শক্তিশালী ও কৃতকর্মা শাসকের রাজধানী বিধায়, নিঃসন্দেহ-রূপে Near East বা অন্তিক-প্রাচ্য এবং মধ্য-এশিয়ার সমস্ত অংশ হইতে লোকে গজনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিত; গজনীর নানাজাতীয় জনসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষেরও অভাব

ছিল না। বহু ভারতীয় সৈন্য ও শিল্পী, রাজা-রাজড়া ও পণ্ডিতলোক গজনীতে যুদ্ধবন্দী-রূপে ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে হযতো ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়া ঘটিলেও, ভারতবর্ষে ঐ যুগে সাধারণ হিন্দুজন-গণের এতদূর মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিয়াছিল যে, তাহারা নিজেরা তুর্কীদের নিকট হইতে বহুদূরে থাকার জন্যে অথবা অন্য কোনও কারণে বাঁচিয়া গেলেও, এই-সমস্ত হিন্দু যুদ্ধবন্দীদের বিদেশী ম্লেচ্ছ তুর্কীদের মধ্যে বাস করা, তাহাদের পক্ষে এক অমার্জনীয় ও অনপনেয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, এবং স্বসমাজে এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠ হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এ ছাড়া, আফগানিস্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বাস করিয়া আসিতেছে এমন হিন্দু প্রজাও ছিল, ইহারা ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মতো মূলোৎখাত হয় নাই; এবং মুসলমান তুর্কী শাসনের প্রথম যুগে এই হিন্দু প্রজাগণ, নিজেদের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। অনুমান করিতে পারা যায় যে, ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এবং আফগানিস্থানের হিন্দু প্রজা, এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এইরূপ সুবুদ্ধি লোক নিশ্চয়-ই ছিল, যাহারা তুর্কী রাজার জাতির একজন বিশিষ্ট ও সম্মানিত পণ্ডিতের মনে তাহাদের ধর্ম এবং চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতি ও আগ্রহ দেখিয়া খুশী-ই হইত। সম্ভবতঃ গজনীতে বসিয়াই অল্‌-বীরূনী ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর চর্চা আরম্ভ করিয়া দেন, এবং গজনীতে তিনি সংস্কৃত তথা পশ্চিম-পাঞ্জাবের কথ্যভাষা (যাহা সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল) শিখিতে আরম্ভ করেন। পাঞ্জাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, সম্ভবতঃ তিনি পশ্চিম-পাঞ্জাবের কোনো-কোনো স্থানে গিয়াছিলেন, এবং এই-সব স্থানে তিনি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। ঐ সময়েই মুলতান-নগরী হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। বহুদূর হইতে হিন্দু যাত্রীরা মূলতানের সূর্য্যমন্দিরে আসিত, এবং এরূপ একটি তীর্থস্থানে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম অর্ধ ধরিয়া সংস্কৃত জ্ঞানের চর্চা কিছুটা থাকা সম্ভব ছিল। অল্‌-বীরূনী মূলতানে হয়-তো কিছুকাল অবস্থান করিয়া থাকিবেন।

অল্‌-বীরূনীর সংস্কৃতের জ্ঞান কি ধরণের ছিল, সে সম্বন্ধে জাখাউ তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু ইহা কার্য্যকর ছিল। ইতালীয় পণ্ডিত তমিলভাষাবিৎ Constantino Beschi কন্‌স্তান্তিনো বেস্কি, ফরাসী পণ্ডিত Abbe Dubois আবে দ্যুবোআ, ও প্রথম ইংরেজ সংস্কৃতজ্ঞ Charles Wilkins চার্লস্‌ উইল্‌কিন্‌স্‌ ও William Jones উইলিয়াম জোন্‌স্‌-এর সময় হইতে, ভারতে বসিয়া যে-সমস্ত ইউরোপীয় সংস্কৃতবিদ্‌ গবেষণার কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের মতো অল্‌-বীরূনী-ও সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রী বা পণ্ডিতের সহায়তা লইয়াই কার্য্য করিতেন। অনুমান হয়, অল্‌-বীরূনী তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ সহায়ক বা সহকর্মীর উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই-রূপ পণ্ডিতগণ, যে-সমস্ত গ্রন্থপাঠ তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল, সেগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়া তাঁহার সহায়তা করিতেন—এই অনুবাদ, নিশ্চয়-ই উভয় পক্ষের পরিচিত কোনো ভাষাতেই হইত, এবং সেই ভাষা নিশ্চয় ছিল, হয় পশ্চিম-পাঞ্জাবের কথ্যভাষা যাহা অল্‌-বীরূনী কিছুটা শিখিয়া লইয়াছিলেন, অথবা ফারসী ভাষা। ইহা-ই তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের প্রধান আধার ছিল। তবে তিনি নিজেও এইরূপ অনুবাদের অথবা ব্যাখ্যার সাহায্য লইয়া কোনো-কোনো মূল সংস্কৃত বই পড়িয়া থাকিবেন, তবে মুখ্যতঃ এই-সকল অনুবাদের আধারে তিনি ফারসী বা আরবীতে তাঁহার মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষাতে কতকগুলি পুস্তক অনুবাদ বা রচনা করেন, এবং এ ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন—বিষয়-বস্তু বা আশয় মুখে-মুখে শুনিয়া এই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শ্লোকে অল্‌-বীরূনীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। জাখাউ সংস্কৃত ভাষায় অল্‌-বীরূনীর কৃতিত্বের অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত মূলের সহিত তাঁহার আরবী অনুবাদ মিলাইয়া অল্‌-বীরূনীর কৃতিত্ব কত দূর এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অধিকারের সীমা কত দূর ছিল, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান্‌ জরমান পণ্ডিত, যিনি একাধারে অদ্ভুতভাবে আরবী ও সংস্কৃত দুইটি-ই দখলে আনিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ আলোচনা কম কথা নহে।

ঈরানের ইতিহাসে, সাসানীয় সম্রাট্‌দের যুগে (২২১-৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ) খানকয়েক সংস্কৃত পুস্তক মধ্য-যুগের ফারসী ভাসা পহ্লবীতে অনূদিত হইয়াছিল। পরে এই-সব বই পশ্চিমের ভাষা সিরিয়ান, আরবী ও গ্রীকে পহ্লবী হইতে অনূদিত হয়। আরব মুসলমান আব্বাস-বংশীয় খলীফা বা রাজাদের রাজত্ব-কালে বগ্‌দাদ-নগরে গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে কতকগুলি সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়, সেই অনুবাদ এই-সকল সাসানী অনুবাদের ধারা অনুসরণ করিয়াই হয়। ঈরান ও পশ্চিম-এশিয়াতে ভারতবর্ষের চিন্তার প্রচারের এই ধাবা, গ্রীকদের যুগ এবং তাহার আগেও গিয়া পহুঁছায়। কমপক্ষে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক হইতে কতকগুলি ভারতীয় পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসী (ইঁহারা প্রায় সকলেই ভবঘুরে'-প্রকৃতির ছিলেন, এবং বিদেশ-যাত্রার অসুবিধা ও বিপদ্‌কে ইঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না—এই ধরণের ভ্রমণশীল ভারতীয় পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী এখনও ভারতের বাহিরে মাঝে-মাঝে দেখা দেন) পশ্চিমের দেশসমূহে পর্য্যটন করিতে যাইতেন এবং গ্রীস পর্য্যন্ত গিয়া পহুঁছিতেন। ইঁহারা বিদেশে রসজ্ঞ সমানধর্মা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিতেন, এবং আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ব্যাপারে ইঁহারা নিজেদের বিচার-ধারা লইয়া আলোচনা করিতেন। এইরূপ অন্ততঃ একজন ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের কথা গ্রীক-সাহিত্যে আমরা পাই; ইনি খ্রীঃ-পূঃ ৪০০-এর পূর্বে আথেন্স-নগরীতে গিয়াছিলেন. এবং গ্রীক দার্শনিক Sokrates সোক্রাতেস্‌-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী বীর Alexander আলেক্সান্দর ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে Kalanos কালানোস্‌ অর্থাৎ "কল্যাণ" নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিতকে নিজের সঙ্গে লইয়া যান; কিন্তু এই পণ্ডিত বাবিলন পর্য্যন্ত যান, সেখানে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করেন। মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং অন্তিক-প্রাচ্যের কতকগুলি দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন—সিরিয়াতে, মাসিডনে, এপিরসে, মিসরে এবং উত্তর-আফ্রিকায় কিরেনে বা সাইরিনি দেশে। সম্ভবতঃ এই-সকল ব্যক্তি ভারতীয় দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে মৌখিক উপদেশ দিতেন, এবং এই উপদেশেরই আধারে গ্রীক ও সিরিয়ান জগতের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরা ভারতীয় চিন্তাজগৎ সম্বন্ধে অল্প-কিছু সংবাদ পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই-

সকল পণ্ডিত, প্রাচীন পারসীক, সিরিয়ান অথবা গ্রীক প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষায়, সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ অথবা রূপান্তরিত করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই; এইরূপ কোনো বই অনূদিত হইয়া থাকিলেও, টিঁকিয়া যাইতে পারে নাই—এবং এই প্রকারের কোনো বইয়ের উল্লেখও পাওয়া যায় নাই। ইহার পরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন ঈরানের পরাক্রান্ত সাসানীয় রাজবংশ, ভারতবর্ষে ইহার সমসাময়িক আর্য্যাবর্তের গুপ্ত সাম্রাজ্যের এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্য সাম্রাজ্যের রাজবংশের সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে, তখন হইতে সাসানীয় রাজাদের আনুকূল্যে পহ্লবী ভাষায় ভারতীয় গ্রন্থসমূহের অনুবাদ রীতিমত ভাবে হইতে থাকে। (ইতিপূর্বে অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায় মধ্য-এশিয়ার ঈরানী ভাষায়—প্রাচীন খোতনী ভাষায় এবং চুলিক বা Sogdian সোগ্‌দীয় ভাষায়—বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ-কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রভাব ঈরানের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজ-দরবারে, তেমন করিয়া পড়িতে পারে নাই।) বিরাট্ এবং শক্তিশালী সাসানীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরবের দিনে, ঈবান-দেশে এক নবীন মানসিক ও সাহিত্যিক পুনর্জাগৃতি আরম্ভ হইয়াছিল; এবং ঠিক সেই সময়েই, একদিকে গ্রীক ও সিরিয়ান ভাষা হইতে যেমন চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ হইতে থাকে, তেমনি অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থেরও পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ হইতে আরম্ভ করে। পহ্লবী ধর্ম-গ্রন্থ Den-kart "দেন-কর্ত" হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে গ্রীস হইতে দার্শনিক পণ্ডিত (pat Hrōm Filisōkfāy অর্থাৎ রোম বা বিজান্তিয়ম হইতে আগত দার্শনিক) সুপ্রাচীন গ্রীস বা হেল্লাস্-এর এবং অর্বাচীন রোমান-প্রভাবিত বিজান্তীয় গ্রীসের বিদ্যা (Yonāyīk এবং Hromāyīk অর্থাৎ য়োন বা যবন বা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় বা অর্বাচীন গ্রীক—এইভাবে সাসানীয় যুগে ঈরানীয়গণ গ্রীকবিদ্যায় এই পরম্পরা নির্দিষ্ট করিয়াছেন) ঈরান-দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই উপায়ে ঈরানের মন ও ইহার সাহিত্য, এই উভয়কে, তাঁহাদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদের দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তুলেন। অনুরূপ কতকগুলি ভারতীয় জ্ঞানী

(pat Hindūkan danāk) সাসানীয় রাজাদের সভায় তাঁহাদের গুণের জন্য এবং তাঁহাদের দর্শন ও বিজ্ঞানের জন্য আদর প্রাপ্ত হন; কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদের কথাও আমরা জানিতে পারি। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, H.W. Bailey-কৃত বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ Zoroastrian Problems in Ninth-Century Books—Ratanbai Katrak Lectures, Oxford, 1943, পৃষ্ঠা ৮০-৮৬।) এই-সমস্ত বইয়ের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান (Kalatak u Damnak অর্থাৎ 'করটক ও দমনক', পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত এই দুই বৃষের কাহিনী) পাওয়া যায়, এবং trk' অর্থাৎ তর্ক-শাস্ত্রের বইয়ের অনুবাদের কথা জানা যায়। যে-সকল ভারতীয় পণ্ডিত ঐ যুগে ঈরান-দেশে আসা-যাওয়া করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈরানের ধর্মীয় ও সামাজিক বাতাবরণ প্রতিকূল ছিল না—ঈরান-দেশের তখনকার দিনের জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম ও তাহার অগ্নি-প্রতীকের মাধ্যমে উপাসনা, ভারতীয় হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান বা আচারের সঙ্গে খাপ খাইত। সাসানীয় যুগে হিন্দুদের মধ্যে ছুঁৎমার্গের এত বাড়াবাড়ি দেখা দেয় নাই; এবং আর্য্য ও ম্লেচ্ছ, জাতিভেদ ও জাতিনাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা, তুর্কী মুসলমানদের আগমনের পরে ভারতে যতটা কঠোর হইয়াছিল, তখনও ততটা কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই; এবং এইহেতু অনুমান হয় যে, ঐ সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতেরা সহজে ঈরানে যাইতেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে হিন্দুসমাজে ঠেকা হইয়া থাকিতেন না। আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের জন্মের দুই-এক শত বৎসরের মধ্যে ঈরানীয় বা "মগ"-নামধারী পুরোহিতগণ (গ্রীকেরা ইহাদের Magos—Magoi বলিত) ভারতবর্ষে নূতন করিয়া "মিহির" নামে সূর্য্যদেবের পূজা লইয়া আসেন, এবং তাঁহারা হিন্দু-সমাজে "মগ-ব্রাহ্মণ" বা "শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত হন। ("মিহির" শব্দটি পহ্লবী Mihr-এরই ভারতীয় রূপ; সংস্কৃত "মিত্র" = অবেস্তা "মিথ্র", এবং ইহা হইতে পহ্লবী Mihr।) খ্রীষ্ট-পূর্ব কালে প্রাচীন যুগে এ-বিষয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ আরও উদার ছিলেন। কিন্তু ঈরান-দেশে ইসলামের মতো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, যে-ধর্মের সাধারণ অনুষ্ঠাতৃগণ অন্য কোনও জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি বা সমন্বয়ের ভাব রাখিত না এবং ইসলাম-বহির্ভূত প্রায় তাবৎ

ধর্ম ও মত-বাদকে "কাফের" অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করিত —ঈরানের অবস্থা অন্য প্রকারের হইয়া দাঁড়াইল। যে স্বল্পসংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত বগ্‌দাদ-এর মতো মুসলমান-বহুল স্থানে যাইতেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা সেইখানেই থাকিয়া যাইতেন; এবং আমরা এই-রূপ ভারতবাসীর ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণের কথাও পাঠ করি। ইহা হইতে মনে হয় যে, যাহারা কোনো ক্রমে ইরাকের মতো মুসলমান-দেশে গিয়া প্রবাস করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বসমাজে পুনর্গৃহীত হওয়ায় বাধা ঘটিত, বিশেষতঃ যখন সে সময়ে হিন্দুভারত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান তুর্ক ও ঈরানীর সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

এই-সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও বিঘ্ন সত্ত্বেও, বিদেশ-ভ্রমণ বা বাণিজ্য উপলক্ষে পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলের বিদেশে গিয়া অবস্থানের এই প্রাচীন ধারা, সিন্ধু-প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে উৎসাহী ভারতীয় হিন্দু ও শিখ বানিয়ারা সে-দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছিল; তাহারা আফগানিস্থানে, মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্থানে (কাশগর, য়ারকন্দ, খোতন, সমরকন্দ প্রভৃতি নগরে), ককেসস্‌ অঞ্চলে (বাতুম ও বাকুতে, জর্জিয়ায়, আর্মেনিয়ায়), ইরাকে, সিরিয়ায়, মিসরে গিয়া বসবাস করিত, দেশের সহিত সংযোগও রক্ষা করিত, বিদেশে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের ধর্মও বজায় রাখিত।

গজনী-নগর ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হওয়ায়, এবং অল্‌-বীরূনীর মতো জিজ্ঞাসু পণ্ডিতের পক্ষে, তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান ও বিচার-ধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পাওয়া সহজ হওয়ায়, এই ঈরানীয় মহাপণ্ডিত, আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে, নিজে মুসলমান থাকা সত্ত্বেও, এবং সেই হেতু হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দু বিজ্ঞান ও দর্শনের রুদ্ধ-দ্বার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অল্‌-বীরূনী তাঁহার গ্রন্থে কুত্রাপি "সংস্কৃত" এই শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি একবারও "প্রাকৃত" ও "অপভ্রংশ" শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন নাই। মধ্যযুগে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল (এবং আজ

পর্য্যন্ত প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যমান আছে) যে, সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষাগুলি বস্তুতঃ পৃথক্ ভাষা নয়, পরন্তু এক-ই আর্য্য বা সংস্কৃত ভাষার দুই বিভিন্ন "পাঠ" বা রূপ ; অল্-বীরূনীও ইহার অনুরূপ মত মানিয়া লইয়াছিলেন। কেবল ধ্বনি- বা উচ্চারণ-গত পরিবর্তন আনয়ন করিয়া, ও "সুপ্-তিঙ্" ও বিভিন্ন প্রত্যয়ে এবং ব্যবহৃত শব্দে অল্প-স্বল্প পরিবর্তন আনয়ন করিয়া, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষাকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা সহজ ছিল ; এবং ইহার বিপরীতও অনুরূপ-ভাবে সহজ ছিল। অল্-বীরূনীর মৃত্যুর শত বৎসরের মধ্যে, উত্তর-ভারতে—সম্ভবতঃ কাশীতে—বসিয়া, লোক-ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য দামোদর পণ্ডিত নামে এক আচার্য্য "উক্তি-ব্যক্তি-প্রকরণ" আখ্যা দিয়া যে একখানি বই লেখেন, তাহাতে তিনি এই কথা-ই বলিয়াছিলেন : যেমন, "পতিতা ব্রাহ্মণী প্রায়শ্চিত্ত্য করিলে পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়া পায়", সেইভাবে প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার শব্দ ও রূপ সংস্কৃতে পুনরায় উন্নীত হইতে পারে। ঐ যুগে যেরূপ লোক-ব্যবহার ছিল, তদনুসারে, শুদ্ধ ব্যাকরণানুগত সংস্কৃত, এবং লোক-ভাষার প্রয়োগ অনুসারে বিকৃত সংস্কৃত, ইহাদের মধ্যে পূরা পার্থক্য অল্-বীরূনী রক্ষা করেন নাই। স্থানে-স্থানে তিনি শুদ্ধ সংস্কৃত রূপের পরিবর্তে, অথবা তাহার সঙ্গে-সঙ্গে, প্রাকৃত বা ভাষার রূপও দিয়াছেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ সম্বন্ধে আবার তিনি সব সময়ে অবহিত হন নাই। তাঁহার উচ্চারণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, তিনি যে-সকল সংস্কৃত-জানা লেখক অথবা সহকর্মীর সহযোগিতা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হয়-তো এক-ই প্রকারের সংস্কৃত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে জাখাউ নিজেই এ কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইঁহারা ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক।

প্রশ্ন এই, এই-সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রধানতঃ ভারতের কোন্ অংশের লোক ছিলেন ? জাখাউ অল্-বীরূনীর পুস্তকে ব্যবহৃত সমস্ত সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় নাম ও শব্দের সূচী দিয়াছেন—মূল গ্রন্থের আরবী লিপিতে লিখিত রূপ, এবং সেগুলির মূল সংস্কৃত রূপ, উভয়-ই। সে যুগে যে কুফী ছাঁদের আরবী লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহা নানা বিষয়ে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, অল্-বীরূনী এই অসম্পূর্ণ লিপির সাহায্যে সংস্কৃত শব্দের যে

প্রতিলিখন দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে পশ্চিম পাঞ্জাবে সংস্কৃত ভাষার এবং স্থানীয় লোক-ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

অল্-বীরূনীর প্রতিলিখন বা প্রত্যক্ষর হইতে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণের হদিস আমরা পাই। তাঁহার প্রদত্ত শব্দগুলি হইতে আমরা বিশেষ এক মাত্র স্থানের উচ্চারণের প্রমাণ পাই না—শুধু পশ্চিম পাঞ্জাবের, অথবা মধ্যদেশ অথবা অন্তর্বেদের উচ্চারণ ইহা নয়, ইহার মুখ্য আধার হইতেছে—সংস্কৃত বানানের অনুসারী এক প্রকার উচ্চারণ, যাহাতে সংস্কৃতের লিপির প্রত্যেকটি বর্ণের সাধারণ সর্বজন-গৃহীত উচ্চারণের সহিত পরিচিত কোনও সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশীর প্রত্যক্ষর-করণের চেষ্টা দেখা যায়; এবং এই বিদেশী, বিভিন্ন প্রকারের প্রান্তীয় উচ্চারণের ধারা সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিফ-হাল ছিলেন না। অল্-বীরূনীর বইয়ে সাকল্যে ২৫০০-এরও অধিক ভারতীয় শব্দ আরবী লিপিতে লেখা পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যক্ষরীকরণে দুই দিক্ দিয়া ভুল-চুকের পথ মিলে। এক তো কুফী ছাঁদে আরবী লিপির একান্ত অসম্পূর্ণতা; এবং দ্বিতীয়, Schefer শেফর পুঁথি, যেখানিতে অল্-বীরূনীর ভারতবর্ষ-বিষয়ক গ্রন্থ রক্ষিত আছে, সেটি অল্-বীরূনীর নিজের হাতের লেখা পুঁথির ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নকল-করা প্রতিলিপি হওয়া সত্ত্বেও (খ্রীষ্টীয় ১০৩১ সালের প্রথমে অল্-বীরূনী নিজের লেখা সমাপ্ত করেন), নকল-নবিশ সংস্কৃত শব্দগুলির সহিত অপরিচিত থাকার দরুন, মূল পুঁথির অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষরে আরও ভুল-ভ্রান্তি আনয়ন করিয়াছেন। আজকালকার প্রচলিত আরবী (এবং ফারসী) লিপিতে নোক্তা বা বিন্দু দিয়া বর্ণের পার্থক্য প্রকাশিত হয়; যেমন, এক-ই অক্ষরে তলায় একটি বিন্দু দিলে "ব", তিনটি বিন্দু দিলে "প", এবং উপরে দুইটি বিন্দু দিলে "ত"। সেইরূপ আরও একটি বর্ণে বিন্দু না দিয়া যথাযথ লিখিলে ":হ"-ধ্বনি, উপরে একটি বিন্দু দিলে উষ্ম "খ", নীচে একটি বিন্দু দিলে "জ", ও তিনটি বিন্দু দিলে "চ"; তেমনি এই নোক্তার ব্যবহারের দ্বারা "দ" এবং উষ্ম "ধ", তথা "শ" এবং "স"—ইহাদের পার্থক্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অল্-বীরূনীর সময়ে প্রচলিত কুফী ছাঁদের আরবী লিপিতে এইরূপ নোক্তা বা বিন্দুর ব্যবহার বিরল থাকাতে, বিদেশী নামের পাঠ অতি কঠিন হইয়া দাঁড়ায় —যেমন পর-পর লিখিত অক্ষর তিনটি, ":হব্স্" পড়া যায়, আবার "জস্ন্"-ও

পড়া যায়। অল্-বীরূনী, যতদূর এই Schefer শেফর পুঁথি বইতে দেখা যায়, নোক্তা ব্যবহারের দ্বারা ও অন্য চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা সংস্কৃত শব্দের ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, ভারতীয় ভাষার "প", "চ", "ত", "গ" প্রভৃতি কতগুলি বর্ণ বা ধ্বনির যথাযথ প্রতিলিখন সম্বন্ধে তিনি তেমন অবহিত হন নাই, এবং ভারতীয় ভাষার মহাপ্রাণ "খ", "ঘ", "থ", "ধ" প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লন নাই। তিনি সাধারণতঃ আমাদের ভারতীয় মহাপ্রাণ "ধ"-এর জন্য আরবী "ধ়াল" বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ এই আরবী বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজী this, then, bathe প্রভৃতি শব্দের th বা dh-এর মতো উষ্ম "ধ"-কারের উচ্চারণ। অল্-বীরূনী, কি ভাবে আরবী লিপিতে বিশিষ্ট ভারতীয় মূর্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির নির্দেশ করা যায়, তাহার পথ খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য তিনি "ট", "ড"-এর জন্য "ত", "দ" ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যেখানে শব্দের অভ্যন্তরে অবস্থিত "ড"-অক্ষর "ড়"-এর মতো উচ্চারিত হইত, সেখানে তিনি "র" ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন, krb = "কুড়ব", by'ry = "ব্যাড়ি", drwr = "দ্রবিড়", drmr = "দ্রমিড়", n'ry = "নাড়ী", byrwrj = "বৈডূর্য", ইত্যাদি।*

অল্-বীরূনী কিন্তু মূর্ধন্য "ণ"-এর সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন, কারণ এই ধ্বনি এখনও পর্যন্ত সমগ্র পাঞ্জাবে—কি পশ্চিম-পাঞ্জাবে কি পূর্ব-পাঞ্জাবে—ও সিন্ধু-প্রদেশে প্রচলিত আছে, এবং উপরন্তু ইরানী-গোত্রর অন্তর্গত পষ্‌তো ভাষাতেও ইহা বিদ্যমান। কখনো-কখনো অল্-বীরূনী আরবী লিপিতে n+r বা r+n ব্যবহার করিয়া এই "ণ"-এর ধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; যেমন p'nrn = "পাণিনি" (দুই এক স্থলে এই নাম ভুল-ক্রমে p'nrt লিখিতও হইয়াছে) এবং brnj = "বণিজ্, রণিজ্" ;

*আলোচনার সুবিধার জন্য আমি এখানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আরবী-লিপির রোমান প্রতিলিখন অনুসরণ করিতেছি—মূল আরবীতে যেমন "হরকৎ" অর্থাৎ স্বরচিহ্ন সাধারণতঃ দেওয়া হয় না, এই প্রতিলিখনেও তদ্রূপ স্বরবর্ণ দেওয়া হইতেছে না ; ' = 'অলিফ", ', "অলিফ হমজা" ; b = "বা (বে)" ; t = "তা (তে)" ; θ = "থা (বা সে)" ; j = "জীম" : c = "চে" ; h: = ":হা (বা বড়ী-হে)" ; x = "খ়া (বা খে :)" ; δ = "ধ়াল (বা জাল)" ; z' = "ঝে" ; s' বা ś = "শীন্" ; s: = "স্বাদ (বা সোআদ)" ; d: = "দ্বাদ (বা জ়াআদ)" ; t: = "ত্বা (বা তোএ)" ; δ: = "ধ্বা (জোএ)" ; ' = "অয়ন্" : w = "রার (ওআও)" ; y = "য়া"।

এবং কখনো-কখনো তিনি সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ ধরিয়া দন্ত্য "ন"-স্থানে মূর্ধন্য "ণ"-এর প্রতিলিখন করিয়াছেন—যেমন, bh'n, bh'nw= "ভানু", আবার bh'nr, bh'r="ভাণু"। সংস্কৃত শব্দের হ্রস্ব বা দীর্ঘ ধ্বনি নিতান্ত অবহেলার সহিতই নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং বহুস্থলে হ্রস্ব স্বরধ্বনি দেখানোই হয় নাই, যেমন b'r="বারু"।

অল্-বীরূনী তাঁহার প্রতিলিখনে বা প্রত্যক্ষরে সাধারণতঃ যে উচ্চারণ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা যাইতেছে। তিনি প্রায় সর্বত্রই সংস্কৃত অন্তঃস্থ "ব়"-এর স্থলে b-, -b-, -b লিখিয়াছেন; শব্দের আদিতে কখনও w="ব়" লিখেন নাই, এবং অতি অল্প কয়েকবার ব়-ফলার স্থলে অথবা শব্দের মধ্যে অবস্থিত "ব়"-এর জন্য w লিখিয়াছেন। ব়-ফলা বহুস্থলে আরবী প্রত্যক্ষরে প্রদর্শিত হয় নাই, এবং ইহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রাকৃত বা ভাষার অনুসারে উচ্চারণ ধরিয়া লিখিয়াছেন, যে-উচ্চারণে ব়-ফলার দ্বারা পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব-ভাব আসিয়া যায় ও ব়-ফলার উচ্চারণ হয় না। অল্-বীরূনীর প্রতিলিখনে "ব" ="ব়"-এর নিদর্শন: blnb (=blmb)="ৱিলম্ৱিন্"; 'bykt="অৱ্যক্ত"; blbh="ৱলভী"; prd অর্থাৎ brd="ৱৃদ্ধি"; prk অর্থাৎ brk="ৱৃক"; brn="ৱর্ণ", ও "ৱরুণ"; bdś="ৱিদিশা"; b'lmyk="ৱাল্মীকি"; b'mn= "ৱামন"; plb="প্লৱ" (কিন্তু b'ndw অর্থাৎ p'ndw="পাণ্ডব"); byn= byd+by'as="ৱেদৱ্যাস"; t'mrbrn="তাম্রৱর্ণ"; śwyt="শ্বেত", bywswt="ৱৈৱস্বত"; drśdbd="দৃষদ্বতী"; rb="রৱি"; k'b="কাৱ্য"; ইত্যাদি। সংস্কৃত "সরস্বতী" শব্দ দুই ভাবে লিখিত হইয়াছে—srst এবং srsft; "ৱৈশ্বানর" শব্দের প্রতিলিখন হইয়াছে byśf'nr, এবং "নন্দিকেশ্বর"-স্থানে লিখিত হইয়াছে nndkyśfr অর্থাৎ nrdkyśfr। এইখানে "শ্ব" ও "স্ব"-তে যে অন্তঃস্থ "ব়" ব-ফলা রূপে আসিতেছে, তাহার "f"-রূপে উচ্চারণ আমরা দেখিতেছি—অর্থাৎ অঘোষ উষ্ম "শ"ও "স"-এর প্রভাবে পড়িয়া অন্তঃস্থ "ব়"=v অঘোষ f-তে পরিবর্তিত হইত। ইহা একটু লক্ষণীয় ব্যাপার যে, অল্-বীরূনী গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া, অন্তঃস্থ ব়-কার(w,v)-এর স্থানে বর্গীয় ব (b) লিখিয়াছেন। পাঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে কিন্তু প্রায় সর্বত্রই অন্তঃস্থ "ব়" "ব়"-ই রহিয়া গিয়াছে (v, w)—ইহা

বর্গীয় "ব" অর্থাৎ b-তে পরিবর্তিত হয় নাই। অল্‌-বীরূনী কেন এইরূপ করিলেন? তাঁহার মনে কি এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের উচ্চারণ অপেক্ষা গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চারণ আরও প্রামাণ্য ছিল? অথবা তিনি এমন কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট এই বর্গীয় ব-উচ্চারণই (b-ই) শুনিয়াছিলেন, যাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল? ইউরোপীয় ভাষার দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি v-এর নির্দেশের জন্য মিসর-দেশে ও অন্যত্র আরবী লিপিতে আজকাল তিনটি নোক্তা-দেওয়া "ফা" বা "ফে" অক্ষর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, এবং অল্‌-বীরূনীর পুঁথিতে এই বিশেষ বর্ণটি-ও দুই-এক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা, myv'r = "মেবাড়"।

মধ্যযুগের ভারতে, ঠিক কখন তাহা আমরা জানি না, সম্ভবতঃ ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, যখন উত্তর-ভারতের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া পশ্চিমী বা শৌরসেনী অপভ্রংশ অন্যতম সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তখন সংস্কৃতের মূর্ধন্য "ষ"-য়ের "খ"-রূপে উচ্চারণও সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই উচ্চারণ এতই সাধারণ হইয়া দাঁড়ায় যে, বহু স্থলে উত্তর-ভারতে লেখায় "খ"-বর্ণটির ব্যবহার হইত না, মূর্ধন্য "ষ" দিয়াই "খ"-এর কাজ চালানো হইত। পাঞ্জাবের গুরুমুখী লিপিতে নাগরী মূর্ধন্য "ষ"-ই এখন "খ"-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উচ্চারণ অতি সাধারণ থাকার দরুন, শাহ্‌-জাহানের পুত্র রাজকুমার দারা শিকোহ্‌ যখন ফারসী-ভাষায় সংস্কৃত উপনিষদের অনুবাদ করান, তখন "উপনিষৎ" শব্দটি ফারসীতে "উপনিখৎ" ('pnkht)-রূপেই লিখিত হয়। কিন্তু অল্‌-বীরূনী সাধারণতঃ সংস্কৃত মূর্ধন্য "ষ"-এর জন্যও ṡ-ই ব্যবহার করিয়াছেন: এবং "খ"-এর উচ্চারণ ধরিয়া আরবী লিপির "x" এবং "k" = "kh"-ও অতি অল্প কয়েক স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন, skht = "শিষ্যহিত" (উচ্চারণে 'sikkhahita "শিখ্যহিত"); এবং "নিষধ" শব্দটি, nxδh = "নিখধ" এবং nṡδ = "নিষধ", এই দুই প্রকার উচ্চারণ ধরিয়া দুইভাবে লিখিত হইয়াছে; তদ্রূপ 'ṡryxyn = "শ্রীষেণ" = "অশ্রীখেন", ghwk = "ঘোষ", অর্থাৎ "ঘোখ"; bxw = "ব্রিযুব্র" (উচ্চারণে "বিখুব্র")। দর্শনীয়—pxkl'wt = "পুষ্কলাবতী", pxkr = "পুষ্কর"। এইরূপ বানান হইতে বুঝা যায় যে, অল্‌-বীরূনী মূর্ধন্য "ষ"-এর বিশুদ্ধ প্রাচীন উচ্চারণ (অর্বাচীন "খ"-উচ্চারণ নহে) প্রদর্শন করিবার

জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের তালব্য "শ" প্রাকৃতের মধ্য দিয়া দন্ত্য "স"-এ পরিবর্তিত হইয়া যায়, এবং সংস্কৃত তৎসম শব্দেও তালব্য "শ"-এর এই দন্ত্য "স" উচ্চারণ সংক্রামিত হয়। কিন্তু অল্-বীরুনী মূল সংস্কৃতের তালব্য "শ"-এর উচ্চারণ বহু স্থলে ś অর্থাৎ "শীন্" অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একথা মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দী, পাঞ্জাবী, লহ্ন্দী (বা হিন্দ্কী) এবং সিন্ধী প্রভৃতি ভাষায়, তদ্ভব শব্দে মূল মূর্ধন্য "ষ" "খ" হয় নাই, দন্ত্য "স" হইয়া গিয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আদি-আর্য্য-ভাষার বা সংস্কৃতের "শ", "ষ", "স" প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া সর্বত্র দন্ত্য "স" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবে ও সিন্ধুর ভাষায় এই দন্ত্য "স"-এর স্থলে আমরা পাই "হ"; যেমন সংস্কৃতে "বিংশতি", "বিংশ" = হিন্দী "বীস" (bīs), কিন্তু পাঞ্জাবী "বীহ্" (wīh); সংস্কৃত "দেশ" = হিন্দী "দেস্", সিন্ধী "ডেহু"; সংস্কৃত "স্নুষা" = মারাঠী "সুন্", পাঞ্জাবী "নুহ্"; সংস্কৃত "আষাঢ়" = হিন্দী "অসাঢ়", পাঞ্জাবী "হাড়"; সংস্কৃত "পৌষ" = হিন্দী "পোস, পুস", পাঞ্জাবী "পোহ্, পুহ্"; সংস্কৃত "ত্রাস" = পাঞ্জাবী "ত্রাহ"; ইত্যাদি। অল্-বীরূনীর প্রত্যক্ষরীকরণে তালব্য "শ" ও মূর্ধন্য "ষ"-এর স্থানে ś অর্থাৎ "শীন" অক্ষর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত : k'śy = "কাশী", k'yśb = k'śyb = "কাশ্যপ"; tś = তিষ্য; bbś, bhbś = "ভবিষ্য", ; bh'rθbrś = "ভারথরর্ষ", থ-যুক্ত রূপ ("ভারতবর্ষ"-স্থলে); kśyr = "ক্ষীর"; kśknd = "কিষ্কিন্ধ্যা"; kś = "কুশ"; k'śt = "কাষ্ঠা", ; śnk = "শঙ্খ"; śyś = "শেষ"; ś'ntn = "শান্তনু"; śylst'pt = "শৈলসুতাপতি"; śkt = "শক্তি"; śślkś = "শশিলক্ষ"; śś = "শিষ্য"; ś'tr = "শাস্ত্র"; śq = "শক"; śkrbr = "শুক্রবার"; 'ś = "ইষু", "আশা"; śr'bn = "শ্রাবণ"; śrw = "শরভ", "শরব"; śj = śc = "শুচি"; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কতকগুলি অদ্ভুত বানান পাইতেছি, যেমন—tkrśl = "তক্ষশীলা" (= tkśśl ?); pywrn = "পয়োষ্ণী; 'rt = "অষ্ট"; m'nsrtg = "মাংসাষ্টক"; pwr'rtk = "পূরাষ্টক"—এই শব্দগুলিতে ś-স্থলে r পাইতেছি, ইহার কারণ ঠিক বুঝা যাইতেছে না; সম্ভবতঃ ইহা মূর্ধন্য "ষ"-এর বিকার-জাত কোনও ঘোষবদ্ উষ্ম ধ্বনি নির্দেশ করিবার চেষ্টায় হইয়া থাকিবে—ś (sh)-এর স্থলে z' (zh)-এর মতন ধ্বনি, এবং এই ধ্বনি সহজেই r বা "র" অক্ষরের মতো শুনাইতে পারে। (পূর্ববঙ্গের—

ঢাকা বিক্রমপুরের—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উচ্চারণে আমি সংস্কৃত “কশ্চিৎ”, “যক্ষশ্চক্রে” প্রভৃতি শব্দে “কর্চিৎ”, “জৈখ্যর্চক্রে” এইরূপ শুনিয়াছি : পূর্ববঙ্গের এই “শ্চ”-স্থানে “র্চ” উচ্চারণের মতো, অল্‌-বীরূনীও সংস্কৃত “ষ্ণ, ষ্ট”-স্থানে হয়-তো “র্ণ, র্ট” শুনিয়া থাকিবেন।) কতকগুলি স্থানে তালব্য “শ” এবং মূর্ধন্য “ষ” উভয়ের জন্য s “সীন” অক্ষর অর্থাৎ দন্ত্য “স” লিখিত হইয়াছে; জাখাউ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ অনবধানতা-বশতঃ ইহা হইয়া থাকিবে। nixrb = “নিখর্ব”—এখানে সংস্কৃত অঘোষ মহাপ্রাণ “খ”-স্থলে অঘোষ উষ্ম x-ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওদিকে যেমন সংস্কৃত অন্তঃস্থ “ব”-এর (w বা v-র) বর্গীয় “ব” = b-র উচ্চারণ পাইতেছি, সেইরূপ এদিকে অন্তঃস্থ “য”-র (y-এর) বর্গীয় “জ” = j-উচ্চারণ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা লোক-ভাষার উচ্চারণের অনুসারী, এবং অল্‌-বীরূনী সাধারণতঃ এই বর্গীয় উচ্চারণ-ই মানিয়া লইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—jbn = j'wn = “যবন, যবন”; j'njblk = “যাজ্ঞবল্ক্য”; j'm = “যাম্য”; j'dw = “যাদব”; 'jwdhh = “অয়োধ্যা”; jnjw, Jujwy = “*জঞোঈ” (সংস্কৃত “যজ্ঞোপবীত” শব্দের পুরাতন পাঞ্জাবী রূপ); 'rjbhr = “আর্যভট” (উচ্চারণে “আর্জভড”); 'rj'prt অর্থাৎ 'rj'brt, ও 'rj'wrt = “আর্য্যাবর্ত”; jδśtr = “যুধিষ্ঠির”; jm = “যম”; 'rjk = “আর্যক”; 'rjm—“অর্যমা”; jwz'n = “যোজন”; 'jrd' = “আয়ুর্দা”; jwg = “যুগ”; 'j'rj = 'c'rj = “আচার্য”; njwt, nywtn = “নিযুত”; p'rz'tr = “পারিয়াত্র”; srjw = “সরযূ”; srw = “সরযূ” (“সরযূ” নামের প্রাকৃত রূপ); srjt = “শর্যাতি”। সংস্কৃত “সহ্য” পর্বতের নাম sj-রূপে লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ অল্‌-বীরূনী বাঙ্গালার মতো “সজ্‌ঝ” এই-রূপ প্রাকৃত উচ্চারণ শুনিয়া লিখিয়াছিলেন।

অল্‌-বীরূনী সংস্কৃত “জ্ঞ” এই সংযুক্ত বর্ণের ভাষায় প্রচলিত উচ্চারণ “গ্যঁ” শুনিয়াছিলেন; এবং এই উচ্চারণ এখন প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত, দক্ষিণ-ভারতেও বহুস্থানে ইহা প্রসার লাভ করিয়াছে। তিনি “যজ্ঞ” শব্দ jgmn (= “জগমঁ”?)-রূপে লিখিয়াছেন, এবং “যাজ্ঞবল্ক্য” শব্দ j'njblk এবং j'gbnlk এই উভয় পদ্ধতিতেই লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি সংস্কৃত “জ্ঞ” = “জ ঞ”-স্থলে nj লিখিয়াছেন, এবং একস্থানে δn অর্থাৎ

"শ্ন্"-ও লিখিয়াছেন : śnh = সংস্কৃত "জ্ঞ"। বহু স্থানে তিনি "ত" = t-এর স্থানে "দ" = d প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—mds, mts = "মৎস্য" (উপরন্তু এই শব্দের প্রাকৃত "মচ্ছ" রূপও ধরিয়াছেন এবং এই রূপটির জন্য mj অর্থাৎ mc লিখিয়াছেন); 'dr = "অত্রি" এবং "অদ্রি" (উপরন্তু "অত্রি"-র জন্য 'tr রূপও তিনি দিয়াছেন); 'dby—"আটব্য (= আডব্য)"; bds = bts = "বৎস"; ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে এবং তদ্‌বিষয়ে যে-মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাতে, কোন্ রীতি অনুসারে অল্-বীরূনী তাঁহার সময়ের প্রচলিত কুফী লিপিতে সংস্কৃত শব্দগুলিকে ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধান করা যাইবে। আরও কতকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় আছে, সেগুলি ভারতীয় ভাষায় উচ্চারণের ধারা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আরবী লিখন-প্রণালী, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিচার করিয়া ধরিতে হইবে। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর আশে-পাশে, যে-সময়ে নব্য ভারতীয়-আর্য্য ভাষাগুলি আত্মপ্রকাশ কবিতেছিল, এবং যখন মধ্যযুগের এক অভিনব সংস্কৃত উচ্চারণের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইযা গিয়াছিল, সেই সময়ের ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির আলোচনায়, অল্-বীরূনীর পুস্তকে ভারতীয় শব্দের আরবী লিপিতে লিখন-প্রয়াস হইতে (এই প্রয়াসে নানা ভ্রম-প্রমাদ এবং লিপিকর-প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও) বহু তথ্য আমরা পাইতে পারি।†

অল্-বীরূনী ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে সাধারণ প্রচলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে পৃথক্ ছিল; অর্থাৎ লোকে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষায় কথাবার্তা কহিত, কিন্তু উচ্চ-সাহিত্যে সংস্কৃত ব্যবহার করিত। অল্-বীরূনী বিভিন্ন প্রকারের মধ্য-আর্য্য (অর্থাৎ প্রাকৃত বা অপভ্রংশ) অথবা নব্য-আর্য্য ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। তিনি সংস্কৃতেতর ভাষাগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ পশ্চিম-পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের হিন্দুদের ভাষা-ই শিখিয়া থাকিবেন, এবং এই দুইটি ঐ যুগে সম্ভবতঃ এক-ই ছিল, এবং

† এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য আমার লেখা প্রবন্ধ—Sanskrit in Perso-Arabic Script—A Sidelight on the Medieval Pronunciation of Sanskrit in Kashmir and North India, *Indian Linguistics*, Quarterly Bulletin of the Linguistic Society of India, Volume VII, Part 2, 1939, Calcutta, pp. 131-166.

সিন্ধু-প্রদেশের ভাষা ইহা হইতে বেশী পৃথক্ ছিল না। আভ্যন্তর-ভারতের অর্থাৎ "পছাহাঁ" বা পশ্চিমী-হিন্দী প্রান্তের, তথা "পূরব" অর্থাৎ মধ্য- ও পূর্ব-উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের ভাষাসমূহ, তথা গুজরাট-রাজস্থানের ভাষার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঐ যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশ, সমগ্র আর্য্য-ভাষী ভারতবর্ষে সংস্কৃতের পাশে একটি মুখ্য সাহিত্যের ভাষার মর্য্যাদা পাইয়াছিল। কোথাও কোথাও অল্‌-বীরূনী জ্ঞাতসারে তাঁহার বইয়ের মধ্যে, অপেক্ষিত সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে, উত্তর-পশ্চিমের কথ্য ভাষার রূপ ধরিয়াছেন, এবং তদনুসারে তিনি আরবী লিপিতে অক্ষরান্তর করিয়াছেন। এইরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণ- ও ধ্বনি-বিষয়ক অভ্যাস ও প্রবৃত্তি অনুধাবন করিতে পারি। প্রাকৃত হইতে লব্ধ "স"-এর ধ্বনি (যাহা সংস্কৃত "শ", "ষ", "স" হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল) এই ভাষায় "হ"-কারে পরিবর্তিত হইত—শব্দের মধ্যে, এবং কখনও-কখনও আদিতে। অল্‌-বীরূনী কর্তৃক ধৃত এইরূপ কয়েকটি শব্দ—krwh = "*ক্রোহ" = সংস্কৃত "ক্রোশ" ; by'h = "*বিআহ, বিয়াহ = ৰিৱাহ" = সংস্কৃত "বিপাশা" ; 'h'ry = "*আহাড়ী" = সংস্কৃত "আষাঢ়িকা" ; bhnd = "বহন্দ" = "ৱহন্দ" = সংস্কৃত "ৱসন্ত" ; lwh'wr = "*লৌহাৱর" = "*হলাৱর" = সংস্কৃত "শালাতুর" ; dhyn = "*দহীঁ" = অপভ্রংশ "*দহরিঁঅ", সংস্কৃত "দশমিকা" ; y'hy = "*এআঅহী" = সংস্কৃত "একাদশিকা" ; dw'hy = "*দুৱাহী" = "দ্বাদশিকা" ; তদনুরূপ trwhy, cwdhy, pnc'hy = "ত্রিৱহী, চৌদহী, পঞ্চাহী" = "ত্রয়োদশিকা, চতুর্দশিকা, পঞ্চদশিকা"। এই ভাষায়, আদ্য-ভারতীয়-আর্য্য অর্থাৎ সংস্কৃতের নাসিক্য বর্ণ + অঘোষ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, এই প্রকারের সংযুক্ত বর্ণ, নাসিক্য + ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয় ; এবং নাসিক্য বর্ণ + ঘোষবদ্ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, দ্বিত্বরূপ নাসিক্য বর্ণে পরিণত হয ; যেমন, অল্‌-বীরূনীর উদাহরণ হইতে, সংস্কৃত "সাংখ্য" = s'ng = "সাঙ্গ" অর্থাৎ "সাঙ্ঘ" ; "ৱসন্ত" = bhnd "বহন্দ" ; "সামন্ত" = s'mnd "সামন্দ" ; "ত্রিপঞ্চাশক" = trnj'y "ত্রিয়ঞ্জাহী" ; এবং সংস্কৃত "ডোম্ব = dwm = "ডোম্ম" ; সংস্কৃত "উদ্দণ্ডপুরী" = 'dnpr = "উদ্দন্নপুরি" ; তুলনীয়—আধুনিক পাঞ্জাবী "দন্দ" = সংস্কৃত "দন্ত" ; "চম্বা' = সংস্কৃত "চম্পক" ; "চন্নণ" = "চন্দন" ; সিন্ধী "কাণ্ড" =

"কণ্টক", ইত্যাদি। পাঞ্জাবী "চন্নাব"="চন্নহা"=প্রাকৃত "চন্দহাআ", সংস্কৃত "চন্দ্রভাগা"; "চন্দহাআ"+ফারসী "আব্" (=জল), ইহা হইতে "চন্নাব, চনাব" নামের উৎপত্তি। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-র পূর্ব্বে আমাদের মহাভারতের উপাখ্যান সিন্ধুপ্রদেশে আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, এবং মহাভারতের এই আরবী রূপে "কুন্তী" qnd-রূপে লিখিত হইয়াছে, এবং এই qnd সিন্ধী ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভাষার রূপ "কুন্দি"-রই প্রত্যক্ষর। তদ্রূপ সংস্কৃত "পাণ্ডু"=প্রাকৃত "পণ্ডু", সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিমের ভাষায় ছিল "পন্নু", এবং এই "পন্নু"-রূপ আরবীতে fnn-রূপে লিখিত হইয়াছিল। এই ভাষাতে উপরন্তু আদি-আর্য্য-ভাষা বা সংস্কৃতের সংযুক্ত "ক্র", "ত্র" প্রভৃতি যথাযথ রক্ষিত হইয়াছিল; যেমন—সংস্কৃত "ক্রোশ"=krwh="ক্রোহ"; সংস্কৃত "তৃতীয়"=tryh="ত্রীয়"="ত্রিঈয়"।

এইভাবে দেখা যায় যে, অল্-বীরূনীর লেখা বইয়ের মধ্যে যে-সমস্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আরবী লিপিতে পাওয়া যাইতেছে, সেগুলি ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দের আরবী এবং অন্য বিদেশী ভাষায় এইরূপ প্রত্যক্ষরী-করণের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু।

•

অল্-বীরূনী সংস্কৃত হইতে আরবীতে কতকগুলি বইয়ের অনুবাদ করেন। কী কী বই তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়, এবং কোন্ পদ্ধতিতে তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয়ও জাখাউ দিয়াছেন। তাঁহার নিজেরই উক্তি প্রমাণে, তিনি উপরন্তু কতগুলি আরবী বইয়ের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার সহকর্মী ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। জাখাউ অল্-বীরূনীর মূল আরবী বইয়ের সংস্করণের ভূমিকায় ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ভারত-বিদ্যা বিষয়ে অল্-বীরূনীর কৃতি, সংস্কৃত হইতে আরবীতে কৃত অনুবাদ সমেত, জাখাউ উল্লেখ করিয়াছেন—এই-সমস্ত রচনা তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ "ভারত-বিবরণী" (অল্-তহ্কীক অল্-হিন্দ)-এর বহির্ভূত। তিনি অন্ততঃ তিনখানি বইয়ের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন—গ্রীক গণিতবিদ্যাবিদ্ ইউক্লীড-এর জ্যামিতি-শাস্ত্রের

লঘু সূত্র (Elements of Geometry), জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রীক ভৌগোলিক Ptolemy প্তোলেমি-র একখানি গ্রন্থ, এবং Astrolabe 'উস্তুরলাব' অর্থাৎ সমুদ্রে দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের বিষয়ে রচিত তাঁহার নিজের একখানি পুস্তক। জাখাউ-এর উক্তি অনুসারে, "সম্ভবতঃ তিনি এই সকল বইয়ের অর্থ পণ্ডিতদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহার বক্তব্য তাঁহারা সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত করিয়া দিতেন।" অনুমান হয় যে, আরবী এবং ইসলামী বিজ্ঞান-গ্রন্থের এই-সকল সংস্কৃত অনুবাদের দ্বারা অল্-বীরূনী কাশ্মীর এবং আভ্যন্তর-ভারতের হিন্দু পণ্ডিতদের সহিত একটি যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিয়া-ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-সমস্ত সংস্কৃত অনুবাদের অস্তিত্ব আর নাই।

একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে (ব্যাপারটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ ছিল), আমাদের মনে হয়, আমরা অল্-বীরূনীর হাত দেখিতে পাই, এবং ইহাতে অল্-বীরূনী কিভাবে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতেন তাহার একটা দিগ্‌দর্শন যেন পাই। উপরন্তু, এই ব্যাপারে অল্-বীরূনীকে দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অনুরাগী-রূপে, এবং প্রত্যেক জাতির পক্ষেই নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার যে আছে এইরূপ বিচারের মানুষ-রূপে।

১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ যখন খীবা রাজ্য জয় করিলেন, তখন অল্-বীরূনী তাঁহার দেশের জামীন-রূপে গজনীতে আসিতে বাধ্য হইলেন। মনে হয় যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কারণে সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, যদিও সম্ভবতঃ তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার কার্য্যের জন্য তিনি সুলতানের দরবারে কোনোরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বা দাক্ষিণ্য বা অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। সে যাহা হউক, তাঁহার সমসাময়িক এই পরাক্রান্ত সুলতানের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ হইবার কোনো কারণ তাঁহার ছিল না। উপরন্তু, তাঁহার গবেষণার কার্য্য চালাইবার জন্য সময় এবং অর্থ এই দুইয়ের-ই অভাব-হেতু তাঁহাকে যে প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইত, সে সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গজনীর সুলতান মহ্‌মূদের দরবারে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি কবি ফিরদৌসী; সুলতানের দাক্ষিণ্য-লাভের আশায় ইনি পারস্য-দেশের জাতীয় মহাকাব্য "শাহ্‌-নামা" বা 'রাজ-কথা' নামে বিরাট গ্রন্থ

রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সুলতানের নিকট হইতে আশানুযায়ী ও প্রতিশ্রুতির অনুরূপ অর্থ না পাইয়া বিশেষভাবে মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আন্তরিক সহানুভূতির অভাব এবং মহ্‌মুদের প্রধান মন্ত্রীর বিরোধিতা, এই দুই কারণে সুলতান মহ্‌মুদ তাঁহার সময়ের এই দুই মহান্ ব্যক্তির উপযুক্ত সমাদর করেন নাই, এবং অল্-বীরূনী ও ফিরদৌসী উভয়েরই পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

সুলতান মহ্‌মুদ একজন কৃতকর্মা শাসক ছিলেন। তিনি উদার-হৃদয় ও সত্যকার শূর-বীর ছিলেন, এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের একজন উচ্চদরের উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তিনি ইসলামের এবং তুর্কী জাতির ইতিহাসের দ্বিতীয় বীরযুগের ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলাম-ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল, তাহাতে একাধারে ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ এবং কাফেরের দেশ লুঠপাট করিয়া ধন-সংগ্রহের সহজ পন্থা, এই উভয়-ই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল। তাঁহার এক শতাব্দী পরে পশ্চিম-ইউরোপের Frank বা ফিরাঙ্গী অর্থাৎ ফরাসী ও জার্মান জাতীয় খ্রীষ্টান Crusader বা ধর্মযোদ্ধগণ নিজেদের সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস করিত, সুলতান মহ্‌মুদের মনেও তদ্রূপ বিশ্বাস ছিল ; তাঁহার অনুমাত্র সংশয় ছিল না যে, তিনি এবং তাঁহার তুর্কী যোদ্ধগণ ঈশ্বরের সমক্ষে উচ্চ আদর্শের মানুষ-ই ছিলেন—তাঁহারা ছিলেন পরমেশ্বর আল্লার নির্বাচিত সেনা ; বিধর্মী হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, তাহাদের ধনে-প্রাণে মারিয়া, লুঠপাট করিযা, ও তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিয়া এবং মুসলমানের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারা ঈশ্বরেরই প্রত্যাদেশ বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছিল। আল্লার সেই সেবার জন্য তাহারা ভারত-বর্ষের বহুযুগের সঞ্চিত ধনরত্ন এবং বিজিত হিন্দুদের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র দাসদাসী পাইয়া ইহজগতে পুরস্কৃত হইত, এবং পরজগতে কোরানে বর্ণিত জিন্নৎ বা স্বর্গের সমস্ত সুখ ও আনন্দের অধিকারী হইত। এই-সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া, সুলতান মহ্‌মুদ ইসলাম-ধর্মের প্রচারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা শক্তিশালী হইয়া, তাঁহার সু-নিয়ন্ত্রিত তুর্কী ও অন্যান্য যোদ্ধাদের সাহায্যে, "খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" এবং দুর্বল ও অধঃপতিত হিন্দুদের জয় করিয়া নিজের শাসন-ক্ষেত্র আরও পরিবর্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন ; এবং হিন্দুরা,

তাহাদিগের প্রাচীন ও সে-যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী যুদ্ধের রীতি লইয়া মহ্মূদের সম্মুখে কোথাও দাঁড়াইতে পারে নাই। অল্-বীরূনী এই ব্যাপারের সম্বন্ধে নিজে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন : "সুলতান মহ্মূদের বীর-কার্য্য অদ্ভুত ছিল, এবং ইহার সমক্ষে হিন্দুরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় হইয়াছিল ; এবং তাহাদের কথা, মানুষের মুখে প্রাচীন জনশ্রুতির মতন হইয়া দাঁড়াইতেছিল" ; ৩০ বৎসর ধরিয়া মহ্মূদ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে-সমস্ত ধ্বংস ও লুণ্ঠন-মূলক অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা, "দেশের সমৃদ্ধি একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন"। গজনীর মহ্মূদ কর্তৃক ভারতবর্ষের মধ্যে এই-সকল লুণ্ঠনের অভিযান, হিন্দুজাতির ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকর বিপত্তি-রূপে দেখা দিয়াছিল। হিন্দুদের মনে এই ভীষণ "বুত-শিকন্" অর্থাৎ মূর্তিভগ্নকারী মহ্মূদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব থাকা সম্ভবপর ছিল না, কারণ জাতি-হিসাবে তিনি তাঁহাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবীবের মতন এ-যুগের একজন নিরপেক্ষ মুসলমান ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন যে, সুলতান মহ্মূদের আচরিত এই "তুর্কী পদ্ধতি"-তে ইসলাম-ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল ; বরঞ্চ ইহার বিপরীত ফল-ই হইয়াছিল। এই Blitzkriog অর্থাৎ "ঝঞ্ঝা আক্রমণ' এবং ধ্বংসের কার্য্য, যাহা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আফগানিস্থানের তুর্কীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, এবং পরবর্তী একাদশ শতকে যাহা আরও প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকর হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ঈরানের প্রখ্যাতনামা সূফী দার্শনিক ও রহস্যবাদী কবি জলালুদ্দীন রূমী (মৃত্যুকাল খ্রীষ্টীয় ১২৭৪ সাল) এইভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন—

"হিন্দুয়ক্-ই-হস্তী-রা তুর্কানা তু নঘ্মা·কুন্"।

[যেভাবে তুর্কগণ অপদার্থ হিন্দুদের নিজের অধীনে আনে,
সেইভাবে তুমি জীবনকেও নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনো।]

ক্রমে মুসলমান ঈরানী ও তুর্কী মুসলমান জগতে অনেকে বুঝিতে পারিলেন যে, মহ্মূদের এই তুর্কী পদ্ধতি—"তুর্কানা তরীকা"—অনুসারে লুঠপাট, হত্যা ও ধ্বংসের পথে ভারতবর্ষের লোকেদের—কি অভিজাত শ্রেণীর এবং কি

নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হইবে না। অন্য এক পথ এদিকে ইসলাম-প্রচারের কার্য্য করিতেছিল, সে ছিল শান্তির পথ—হিন্দু জন-সাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা-যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে, সহানুভূতির সহিত ও সহজ সরলভাবে ইসলামের মূল তত্ত্বকথা প্রচার করিয়া এবং সঙ্গে-সঙ্গে নানা-প্রকারের অলৌকিক প্রক্রিয়া দেখাইয়া (অর্থাৎ "কেরামতি জাহির করিয়া") তাহাদিগকে স্বমতে অথবা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনা। এই "সুফিয়ানা তরীকা" অর্থাৎ সুফী সাধকের পদ্ধতি, ইসলাম-প্রচারে বিপুল সহায়তা করিয়াছে। কোমল ভাব, সকল ধর্ম-মত সম্বন্ধে উদারতা, এবং ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান-ধারণা লইয়া জীবন-যাপন, সুফী সাধক-গণ এই-সব গুণ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করায়, মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্রসমূহ হইতে বহু দূর অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ জন-সাধারণের মধ্যে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিতে এই রীতির শান্তিপূর্ণ প্রচার বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। এই জন্য দিল্লী, আগ্রা, লখ্‌নৌ, জৌনপুরের আশ-পাশে যেখানে শতকরা মাত্র ১৫ কি ২০ জন মুসলমান, সেখানে সুদূর পূর্ব-বঙ্গে কোনো-কোনো জেলায় শতকরা ৮০ জনের উপর হিন্দু এখন মুসলমান ধর্ম স্বীকার করিয়াছে। সুলতান মহ্‌মূদ অবশেষে যখন ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের এক অঞ্চল পাঞ্জাব অধিকার করিয়া গজনীর সাম্রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দিলেন, তখন পর্য্যন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান করা তাঁহার জীবনের যেন প্রধান ব্রত ছিল।

পাঞ্জাব জয় করিবার পরে এবং পাঞ্জাবকে গজনীর সাম্রাজ্যের এক অংশে পরিণত করিবার পরে, হিন্দুদের এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রবল শত্রু, মন্দির- ও দেবমূর্তি-ধ্বংসকারী বিদেশী মুসলমান রাজা, তাঁহার অধীনে আগত এই নূতন ভারতীয় প্রদেশের হিন্দু প্রজাবর্গের জন্য এক নূতন ধরণের মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই মুদ্রার উপরে তিনি যে লেখ উৎকীর্ণ করাইলেন, তাহাতে এমন একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল, যাহা মুসলমান coin legend বা মুদ্রালেখের ইতিহাসে ইহার পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, এবং ইহার পরেও আর কোনো মুসলমান শাসক কোথাও এরূপ করেন নাই। Omayya ওময়্যা-বংশীয় আরব মুসলমান খলীফা বা সম্রাট্‌দের

সময় হইতে যে বিশিষ্ট ইসলামীয় রীতির মুদ্রা মুসলমান জগতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই কয়টি বিষয় সব সময়েই পাওয়া যায় : [১] প্রথম থাকে, কলিমা বা কলমা, অর্থাৎ আরবী ভাষায় রচিত ইসলাম ধর্মের বীজমন্ত্র—"লা-ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্, মুহম্মদ রসূলু-ল্লাহ্", অর্থাৎ অল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই, এবং মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ; [২] মুদ্রার প্রবর্তক রাজার বা শাসকের নাম ও বিরুদ; [৩] যে স্থানে বা টাঁকশালে মুদ্রাটি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ (আরবী ভাষায়)—"দ্বুরিবা (বা জুরিবা) হাধা অল্-দিরহম্ (অথবা অল্-দীনার) ফী··" (অর্থাৎ এই দিরহম বা রৌপ্য মুদ্রা, অথবা দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা, অমুক স্থানে আহত হইয়াছে বা প্রস্তুত করা হইয়াছে); এবং শেষে থাকিত—[৪] হিজরা সংবৎসর ধরিয়া মুদ্রা-প্রবর্তনের বর্ষের উল্লেখ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত সুলতান মহ্মূদের মুদ্রায় আমরা দেখি, দুইটি ভাষার ব্যবহার করা হইয়াছে—ইহা-ই হইতেছে ইহার প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। মুদ্রার একদিকে পাইতেছি (মুসলমান রাজাদের মুদ্রায় আমরা যেমন পাই) উপরে লেখা এই চার দফা উল্লেখ, আরবী ভাষায়; এবং অন্য দিকে পাইতেছি, এই সম্পূর্ণ আরবী লেখের ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে অনুবাদ—এবং এই ব্যাপারটি বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। একজন মুসলমান রাজা, যিনি সারা জীবন বিধর্মী বলিয়া হিন্দুদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছেন, এবং যে হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনো আস্থা বা দরদ থাকিবার কথা নহে, তিনি তাঁহার নিজ ধর্মের পবিত্র বীজ-মন্ত্রটি সেই বিধর্মী ঈশ্বরাভিশপ্ত জাতির দেবভাষা সংস্কৃতে অনুবাদ করাইলেন—ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা। এই মুদ্রায় সংস্কৃতে আরবী কলমার এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে :—"অব্যক্তম্ এবম্, মুহম্মদ অবতার।" ইহা অবশ্য আক্ষরিক অনুবাদ নহে, এবং পণ্ডিত মুসলমান এই অনুবাদ সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইবেন না—বিশেষতঃ কলমার দ্বিতীয় অংশের অনুবাদটুকু। কারণ খ্রীষ্টান ও হিন্দুরা যেভাবে incarnation বা "অবতার" মানে, নবী মুহম্মদকে সে ভাবের "অবতার"-রূপে মুসলমানগণ কল্পনা করেন না। মুহম্মদ ছিলেন পুরাপুরি মানুষ, এবং তিনি নিজেও সে কথা বার-বার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ

শতকে ইসলামের জগতে, বিশেষ করিয়া ঈরান, আফগানিস্থান ও তুর্কীস্থানে, নবী মুহম্মদের ব্যক্তিত্ব প্রায় দেবত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল—ইসলামের অভ্যুত্থানের ৩।৪ শত বৎসর পরে। কোরানের সরল সহজবোধ্য ধর্মমত নানাভাবে অলংকৃত ও পল্লবিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছিল। স্থফীগণের কল্পনা-প্রবণতার দরুন ইহা অনেকটা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র, নবী মুহম্মদের মানবাতিগতা সম্বন্ধে বিশ্বাস খুবই সাধারণ; এবং মিলাদ বা মৌলুদ-শরীফের মতো ধর্মকথার আসরে, মুসলমান পুরাণ-অনুসারে স্থষ্টির কথা এবং মুহম্মদের আবির্ভাব ও জীবনীর কথা, এবং শেষে "রোজ কিয়ামৎ" অর্থাৎ পৃথিবীর অস্তিত্বের শেষ দিনের কথা, যখন "ওয়াইজ়" বা ধর্মোপদেশক বর্ণনা করেন, তখন ইহা প্রচারিত হয় যে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের স্থষ্টির বহুপূর্বে, এমন কি পরমেশ্বরের সত্তার অংশ-রূপে, স্বর্গে আল্লা-তায়ালা "নুর-ই-মুহম্মদী" অর্থাৎ মুহম্মদের জ্যোতি বলিয়া এক বিশেষ জ্যোতির্ময় শক্তি স্থজন করিয়াছিলেন, এবং তাহা যুগ যুগ ধরিয়া স্বর্গে অবস্থিত ছিল; পরে এই জ্যোতির্ময় শক্তির অংশ লইয়া স্বর্গের "ফেরেস্তা" বা দেবদূত এবং অন্য নানা প্রকারের প্রাণী স্থষ্ট হয়; এবং অবশেষে এই "নুর-ই-মুহম্মদী" ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া মুহম্মদের মাতা দেবী আমিনার গর্ভে ভবিষ্যৎ নবী বা রসূল অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই কল্পনোজ্জ্বল পৌরাণিক কাহিনী, নবী মুহম্মদের জীবনকথা-রূপে এক অদ্ভুত রসপূর্ণ "ভক্তমাল" কথার ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া পঁহুছে, এবং বিশ্বাসী মুসলমান সকলেই আগ্রহের সঙ্গে এই কাহিনী গ্রহণ করেন। স্থতরাং এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, মুহম্মদকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করা তেমন অনুচিত বলা যায় না; এবং ঐ সময়ে, জনপ্রিয় স্থফী প্রচারকগণ, ভারতবর্ষের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের কাছে তথা যাহাদের ইসলাম ধর্মে আনা সম্ভবপর ছিল এইরূপ হিন্দুদের কাছে, মুহম্মদের ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কথা তাহাদের মানসিক চিন্তাধারা অনুসারে এইরূপ উপাখ্যানের সাহায্যে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছিলেন।

কলমা-মন্ত্রের এই সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া শেষে আলোচনা করিতেছি।

রাজার ও টাকশালের নাম এবং সন-তারিখের কথা লইয়া আরবীতে এই মুদ্রায় যাহা লেখা আছে, তাহা বেশ যত্নের সহিত যথাযথভাবে অনূদিত

হইয়াছে ("অয়ং টঙ্কঃ মুহমদপুরে ঘট্টে আহতঃ"—এই টঙ্ক বা টাকা মুহম্মদপুর অর্থাৎ লাহোরের ঘট্ট বা টাঁকশালে আহত হইয়াছে অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়াছে); "নৃপতি মহমূদ"; "জিনায়ন-সংবতি···" ("জিন" অর্থাৎ বিজেতা, অর্থাৎ নবী মুহম্মদের "অয়ন" অর্থাৎ নির্গমন বা যাত্রার···বর্ষে)। মুসলমান অব্দের নাম "হিজরা" (অর্থাৎ "পলায়ন" বা "নির্গমন"), বিশেষ চিন্তার সহিত এই শব্দটির সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হিজরা অব্দের সম্পূর্ণ নাম হইতেছে "হিজ্‌রতু-ন্‌-নবী" অর্থাৎ নবী ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের পলায়ন বা নির্গমনের বৎসর—ইহার সংস্কৃত করা হইয়াছে "জিনের বা বিজেতা পুরুষের, অথবা ধর্মগুরু বা ধর্মোপদেশক মহাপুরুষের অয়ন বা নির্গমন"। এই দুই ভাষার লেখ-সম্বলিত মুদ্রার বিভিন্ন তারিখের অঙ্ক সম্বলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রতি পাওয়া গিয়াছে (যথা ৪১২ হিজরী অব্দ ও ৪১৯ হিজরী অব্দ = যথাক্রমে ১০২১ ও ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দ), এবং এই বিভিন্ন প্রতিতে পাঠভেদও কিছু আছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে একটিতে "বি-স্মি-ল্লাহ্" এই বাক্যটি যথাযথ অনূদিত হইয়াছে এইভাবে—"অব্যক্ত-নামে" অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের নাম লইয়া।*

এইভাবে আরবী কলমার সংস্কৃত অনুবাদ দিয়া মুদ্রার প্রবর্তন, গোঁড়া মুসলমানের দৃষ্টিতে "জিম্মি অর্থাৎ কর-প্রদাতা বিজিত বিধর্মী প্রজার প্রতি অশেষ এবং অনুচিত অনুগ্রহ বলিয়া-ই মনে হইত। ঐ সময়ে, যখন প্রায় সর্বত্র সাধারণ ধর্ম-বিশ্বাসী মুসলমানের মনে আরব-জাতির শ্রে[illegible]ষ্ঠত্ব-স্বীকারের মনোভাব বিদ্যমান ছিল, এবং আরবী ভাষার পাশে এইভাবে বিধর্মী হিন্দুর

* এই মুদ্রা সম্বন্ধে প্রমাণপঞ্জী: (১) Edward Thomas, 'On the Coins of the Kings of Ghazni, 961-1171 A. D.', London, 1848, p. 57; (২) Charles J. Rodgers, 'Catalogue of Coins collected by Chas. J. Rodgers and purchased by the Government of the Panjab', Part II, Miscellaneous Muhammadan Coins, Panjab Government Publication, Calcutta, 1894, p. 28, coins no 88 ff.; (৩) Stanley Lane Poole, 'Catalogue of Coins in the British Museum', referred to by K. N. Dikshit; (৪) K. N. Dikshit, 'A Note on the Bilingual Coins of Sultan Mahmud of Ghazni', JRASB Letters, Vol. II, 1936, No. 8, issued 1938, Numismatic Supplement, p. 29; (৫) Stanley Lane Poole, 'Mediaeval India' ('Story of the Nations' Series), London, 1905, p. 27—৪১৮ হিজরা = ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত এই ধরণের একটি মুদ্রার চিত্র আছে; (৬) জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—'ইতিহাস-প্রবেশ' (হিন্দী পুস্তক), প্রথম খণ্ড, প্রয়াগ, ১৯৩৯, পৃঃ ২১৩, ২১৬।

ভাষার স্থান দেওয়া অনেকেরই ভালো লাগিত না, তখন, আমাদের মনে আশ্চর্য্য লাগে, কেমন করিয়া গজনীর অধিপতি সুলতান মহ্‌মূদ, যিনি জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের সহিত লড়িয়াছিলেন, তাঁহার নব-বিজিত হিন্দু প্রজাদের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এবং ইসলামের মূল কথা তাহাদের নিকট তাহাদেরই আপন ভাষায় প্রকাশ করিলেন। রাজ্যের মুদ্রায় তাহাদের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনে হয়, তিনি যেন হিন্দুদের জাতীয়তা-বোধের পরিপোষক কর্ম-ই করিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, তিনি কূট রাজনীতিক চাল-রূপেই এই কার্য্য করিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ মহ্‌মূদ তাঁহার সাম্রাজ্যের নব-জিত হিন্দু প্রজাদের বিরোধী করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, কারণ এই হিন্দুরা তখন তাঁহার সাম্রাজ্যে সংখ্যায় বিশেষ অল্প ছিল না। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে, এ ব্যাপারে তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত উদারতার স্বাভাবিক প্রবণতা-ই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু আমরা ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না যে, এই সংস্কৃত অনুবাদ মুদ্রায় অঙ্কিত করার পিছনে হিন্দুজাতির প্রতি যে সহানুভূতিশীল তথা সংস্কৃতি-পূত এবং বিশ্বজনীন মনোভাব কার্য্য করিতেছে, তজ্জন্য অল্‌-বীরূনী-ই আমাদের সাধুবাদের পাত্র। যতদূর জানা যায়, সুলতান মহ্‌মূদের দরবারে অল্‌-বিরূনীর মতো ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না। হিন্দুদের ভাষাকে রাজকীয় মুদ্রায় স্থান দিয়া ইহার প্রতি যে মর্য্যাদা দেখানো হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদের বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ব্যাপারে ভারতবর্ষ হইতে আগত কোনও ব্রাহ্মণ বা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের যে কোনো হাত ছিল, তাহাও মনে হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকদিগের উক্তি-অনুসারে, গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ যে সকল প্রকার বিদ্যার বিষয়ে গুণগ্রাহী ছিলেন. তাহার প্রমাণ আছে। একবার কতকগুলি তুর্কী সৈনিক ভারতবর্ষে জনৈক রাজপুত রাজার রাজধানীতে কতকগুলি ছাড়া হাতীকে আয়ত্তে আনিয়া শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল ; তাহাদের এই সাহস ও শৌর্য্যের বিষয়ে, "হিন্দী" অর্থাৎ তখনকার যুগের অপভ্রংশ ভাষাতে কবিতা রচনা করিয়া, প্রশস্তিবাদ করা হইয়াছিল। ঐ রাজা পরে এই কবিতাগুলি সুলতান মহ্‌মূদের কাছে ভেট-স্বরূপ পাঠাইয়া দেন ; মহ্‌মূদ ঐ ভাষা বুঝিতেন না বলিয়া, কতকগুলি পণ্ডিত অর্থাৎ উক্ত ভাষার সহিত পরিচিত ব্যক্তিকে

দিয়া ঐ কবিতা অনুবাদ করাইয়া লন এবং পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হন। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি যে কোনও ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও হিন্দুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আপন মুদ্রায় এই সংস্কৃত অনুবাদ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

এই ব্যাপারে যদি কেহ সুলতান মহ্‌মূদকে প্রেরণা দিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র অল্‌-বীরূনী-ই হইতে পারেন; এবং যে ভাবে কতকগুলি আরবী শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ এই মুদ্রাতে করা হইয়াছিল, তাহাতে অল-বীরূনীর-ই চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী "নবী" বা "রসূল" অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ বা ভাববাদী অর্থে সংস্কৃত "জিন" শব্দ অনুবাদে ব্যবহার করা হইয়াছে। অল্‌-বীরূনী তাঁহার ভারত-বর্ণন গ্রন্থে "জিন" শব্দটি দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই শব্দটি "বুদ্ধ" শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে ধরিয়াছেন ("জিনু র-হুর অল্‌-বুদ্‌")। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, কাষায়-বস্ত্র পরিহিত "সামানী" অর্থাৎ "শ্রমণ" বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন "বুদ্ধ", এবং সম্ভবতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রচলিত "জিন" শব্দ (যাহার অর্থ হইতেছে "বিজেতা"), অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দের অভাবে, আরবী "নবী" বা "রসূল" শব্দের কাজ-চালানো প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কলমার প্রথম অংশের অনুবাদে অল্‌-বীরূনীর হাত দেখিতেছি। "অল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাস্য নাই", ইহার অনুবাদ হইয়াছে—"অব্যক্তম্ একম্" ; অর্থাৎ যিনি অ-রূপ, তিনি এক বা অদ্বিতীয়। এই অনুবাদ একটু ব্যাখ্যাত্মক ; কিন্তু অল্‌-বীরূনীর মত অনুসারে ইহার উপযোগিতা আছে। আরবী ভাষায় "ইলাহ্‌" শব্দের অর্থ "যাহাকে দর্শন বা স্পর্শ করা যায়, এমন কোনো সম্মান বা পূজার পাত্র" ; অর্থাৎ "প্রতিমার আকারে কোনো দেবতা"। এই শব্দের দ্বারা কোনো দৈব শক্তি বা ভাব আববদের মধ্যে প্রকাশিত হইত না। কিন্তু "অল্লাহ্‌" শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব একেবারে ইহার বিপরীত—"অল্লাহ্‌" কোনো দৃশ্যমান "ইলাহ্‌" বা দেবতা নন, ইনি দৃশ্যমান দেহ-রূপের অতীত ঈশ্বরীয় সত্তা। এইরূপ ঈশ্বরীয় শক্তি বা দেবতা, যাঁহার কোনো রূপ নাই, তিনি-ই একমাত্র সত্তা ; এবং অন্য কোনো "ইলাহ্‌" বা রূপ-যুক্ত দেবতার কথা "অল্লাহ"-এর সমক্ষে উঠিতেই পারে না। অতএব "অ-ব্যক্ত বা অ-রূপ

দেবতা-ই এক”—এইরূপ অনুবাদ, কলমা-মন্ত্রের প্রথম অংশের অসংগত অনুবাদ বা অপব্যাখ্যা নহে, এবং এইরূপ অনুবাদের পিছনে আছে ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রধান মনোভাব—রূপ বা প্রতিমার বিরোধ। উপরন্তু এইরূপ অনুবাদ, হিন্দু আধ্যাত্মিক চিন্তা বা দর্শনের বাক্য-ভঙ্গীর অনুকূল; এবং এইরূপ অনুবাদের দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রের “একং সৎ” এবং “একম্ এবাদ্বিতীয়ম্” প্রভৃতি কতকগুলি বচনকে মনে করাইয়া দেয়। অল্-বীরূনী তাঁহার পুস্তকে “অব্যক্ত” শব্দের আরবী ভাষায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— ’bykt ’y ṡy” bl’ s:wrth অর্থাৎ “অব্যক্ত, অয়্যু শয়্যান্ বিলা স্বুরৎ” (যাহার কোনও রূপ বা আকার নাই, এইরূপ সত্তা)। “অব্যক্ত” শব্দের নানা অর্থের মধ্যে এইটি অন্যতম। মূল অর্থ অবশ্য “যাহা ব্যক্ত বা প্রতিভাত হয় নাই”—কিন্তু এই ব্যক্ত বা প্রতিভাত হওয়া কেবল রূপ-গ্রহণের মধ্যেই সীমিত নহে, এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু ধরিতে, ছুঁইতে, দেখিতে বা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহার সব-ই “ব্যক্ত”। “অল্লাহ্” শব্দের অনুবাদ-রূপে “অব্যক্ত” যে সুষ্ঠু অনুবাদ, তাহা বলা চলে না; কিন্তু “অল্লাহ্”-এর “স্বুরত” বা রূপের অতীত থাকা-ই যদি এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত “অ-ব্যক্ত”-শব্দের ব্যাপক অর্থ-সমূহ হইতে যদি কেবল এইটিকেই নির্বাচিত করিয়া লইয়া, ইহাকে রূপাতীত “অল্লাহ্”-এর প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা খুব অনুচিত হয় না।

“অল্লাহ্”-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ যিনি-ই নির্ধারিত করিয়া থাকুন, তিনি যে এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট। চীনদেশের বিখ্যাত দার্শনিক লাও-ৎসি-রচিত “তাও-তেঃ-কিঙ্” গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে—আসাম (প্রাগ্জ্যোতিষ্)-এর রাজা ভাস্করবর্মার আগ্রহে, চীনদেশের পণ্ডিতেরা চীনের সম্রাটের আহ্বানে এই কার্যে অবতীর্ণ হন। তখন চীনা শব্দ “তাও”, যাহা লাও-ৎসি’র দর্শনের মুখ্য কথা, তাহার অনুবাদ লইয়া হিউএন্-ৎসাঙ্ প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লাও-ৎসি’র মতানুবর্তী চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল। আজকালও দুইটি বিভিন্ন ভাষার ও ধর্মের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাব ও শব্দের সামঞ্জস্য সাধন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। অল্-বীরূনী যে সংস্কৃত দার্শনিক শব্দ আরবীতে অনুবাদ

করিবার কাজে অবতীর্ণ হইয়া বহুল অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সর্বগ্রাহিতার পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে—গ্রীক, ইসলামী ও হিন্দু দর্শনের তুলনাত্মক আলোচনা তাঁহাকে এইভাবে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল; এবং সেইহেতু Comparative Religion বা তুলনাত্মক-ধর্মানুশীলন বিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ তাঁহাকে বলা যায়।

অতএব অনুমান করিতে বাধা নাই যে, সুলতান মহ্‌মূদের মুদ্রায় "অল্লাহ্‌" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে "অব্যক্ত" শব্দের ব্যবহার অল্‌-বীরূনীর দ্বারাই হইয়াছিল। এবং ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে, অল্‌-বীরূনীর-ই চেষ্টায় এই মুদ্রায় আরবী লেখের পূর্ণ সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে অল্‌-বীরূনীর ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রের মধ্যে আমরা এক নূতন প্রকারের মহত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি। তিনি সংস্কৃতের ও ভারতের প্রতি আকৃষ্ট তো হইয়াছিলেন-ই—উপরন্তু তিনি এই ভাবের ভাবুকও ছিলেন যে, উচ্চ সভ্যতার উত্তরাধিকারী মানবসমাজ-সমূহের পক্ষে নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার অধিকার, সব জাতির পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা আবশ্যক। পৃথিবীর সর্বজাতির মানব নিজ নিজ ভাষায় তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করুক, ইহা-ই বুদ্ধদেব কামনা করিয়াছিলেন। একটি বিশেষ ভাষাকে ধর্মের ভাষা বা রাজার ভাষা বলিয়া, অন্য সমস্ত জাতির ঘাড়ে ইহাকে চাপাইবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র-ই দেখা যায়। ইহা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যেই, পাঞ্জাব তুর্কীদের দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই, পাঞ্জাবের ভারতীয় প্রজাগণ নিজ ভাষায় ইসলামের বীজ-মন্ত্রের সহিত পরিচিত হইবার অধিকার পাইয়াছিল। যাঁহার ন্যায়দর্শিতার ফলে সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই মানব-শ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ অল্‌-বীরূনীর স্মৃতির প্রতি তাঁহার জীবৎকালের প্রায় সহস্র বৎসর পরে, সমগ্র সভ্য জগতের শ্রদ্ধা নিবেদন করা কর্তব্য—তিনি তাঁহার কালের ও সর্বকালের বিশ্বমানবিকতার আদর্শের পুরোহিত ছিলেন, এবং মানবের মানসিক প্রগতির পথে এক আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন ॥

মন্তব্য—এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পর বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাসুদেব-শরণ অগ্রবালের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে,

তিনি এই মুদ্রার সংস্কৃত লেখটির একটু অন্যভাবে পাঠ করিয়াছেন। তিনি প্রায় সমস্ত লেখটিব পূর্ব-আলোচকদের দ্বারা নির্ধারিত পাঠ একরকম মানিয়া লইযাছেন, কিন্তু "জিনায়ন-সংবতি" এই অংশটুকু, "তাজিকীয়ের-সংবতি" অর্থাৎ "তাজিক" বা আরব জাতির সংবৎ বা অব্দ বলিয়া পাঠ করিতে চাহেন। এই পাঠে "-যের" অংশটি কিন্তু গ্রহণযোগ্য মনে হয না, কাবণ "-যেব" প্রত্যয়েব কোনও সংগত অর্থ মিলিতেছে না। ডাক্তার অগ্রবালও মনে করেন যে, এই সংস্কৃত অনুবাদ অল্‌-বীরূনীর হওয়া-ই সম্ভব। ইঁহাব প্রবন্ধ Journal of the Numismatic Society of India, Vol. V. Part II-তে, ও পরে Journal of the United Provinces Historical Society, Vol. XVII, Part II, December 1944, Lucknow-তে প্রকাশিত হইযাছে।

[বঙ্গাব্দ ১৩৬২]

দরাপ খাঁ গাজী

স্থরধুনি মুনিকন্যে, তারয়েঃ পুণ্যবন্তং—
স তরতি নিজপুণ্যৈস্—তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি তু গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদিহ তব মহত্ত্বং—তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

"হে স্বর্নদী জহ্নুমুনিকন্যা গঙ্গা, তুমি পুণ্যবান্‌কে তাবণ কবো, কিন্তু তাহাতে তোমার কী মহত্ত্ব? সে নিজ পুণ্যে তরে। কিন্তু যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে তারণ করো, তবেই পৃথিবীতে তোমার মহত্ত্ব, আর সেই মহত্ত্ব-ই (সত্যকার) মহত্ত্ব।"

দবাপ খাঁ গাজীব বচিত বলিয়া পরিচিত এই শ্লোকটি বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রচলিত, অন্ততঃ আমার বাল্যকালে প্রচলিত ছিল। নিজ ধর্মের দেব-দেবীর পূজার সঙ্গে এবং দেব-দেবী-সম্পর্কিত স্তব-স্তোত্রের সঙ্গে পরিচিত বাঙ্গালী হিন্দু বোধ হয় এমন কেহ নাই, যিনি দরাপ খাঁ-কৃত গঙ্গা-স্তোত্রেব, অন্ততঃ উপরে প্রদত্ত মালিনী-ছন্দের শ্লোকটি না জানেন, এবং আবেগের সহিত পাঠ না করেন। আমার পূজ্যপাদ পিতামহ প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে ইংরেজী ১৯০৬ সালে দেহবক্ষা করেন, তখন আমার বযস ছিল ষোল বৎসর, তাঁহার নিকট বহুবার এই শ্লোকটি শুনিয়াছি, এবং শ্লোকটি মনে কাবয়া রাখিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। দবাপ খাঁ গাজী যে এই শ্লোকের রচয়িতা, তাহা তাঁহারই কাছে শুনি, এবং দরাপ খাঁর পরিচয়, তাঁহার জ্ঞান-মতো, তিনি এইটুকু আমাকে বলিয়াছিলেন যে (দরাপ খাঁর সময় সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণা ছিল না, কৌতূহলও ছিল না), দরাপ খাঁ নামে এক মুসলমান আমীব বা অভিজাত ব্যক্তি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ফকীব হইয়া যান, ত্রিবেণীতে গঙ্গার ধারে তাঁহার মুসলমান ধর্ম ও শাস্ত্র অনুসাবে তিনি সাধন-ভজন করিতেন; তীর্থক্ষেত্র বলিয়া ত্রিবেণীতে বহু হিন্দু যাত্রী ভক্তিভরে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত, দরাপ খাঁ তাহা দেখিতেন। তাঁহার সাধন-ভজনে নিষ্ঠা দেখিয়া গঙ্গাদেবী প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেখা দেন; এবং দরাপ খাঁ

মুসলমান হইলেও, উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন বলিয়া, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে ভেদ করিতেন না, গঙ্গার কৃপায় তিনি গঙ্গাভক্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার মুখ দিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি গঙ্গা-স্তব বাহির হয়, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটি হইতেছে একটি। পরে মুদ্রিত পুস্তকে দরাপ খাঁর (বা দরাফ খাঁর) রচিত বলিয়া শ্লোকটি বহু স্থলে দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় কর্তৃক সংকলিত "বৃহৎ-স্তব-কবচ-মালা" পুস্তকে, দরাপ খাঁ-রচিত অষ্টশ্লোকময় গঙ্গা-স্তবটি সম্পূর্ণ পাইয়াছি (দশম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩২ সাল, পৃঃ ৫০৯।৫১০)। বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত এই গঙ্গাস্তবটি নীচে দিতেছি; অষ্টম বা শেষের শ্লোকটি-ই সুপরিচিত, এবং সেটি উপরে দেওয়া হইয়াছে।

শার্দূলবিক্রীড়িত

১। যৎ ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্‌বান্ধবৈঃ
যস্মিন্‌ পান্থদৃগন্ত-সন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীকুর্বতী পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাঽসি ভাগীরথী॥

"যে মানবদেহকে মাতৃগণও ত্যাগ করিয়াছে, মিত্র ও আত্মীয়গণও যাহা ছোঁয় না, পথিকের দৃষ্টি যাহার উপর পড়িলে তাহারা শ্রীহরি স্মরণ করিয়া থাকে, এই প্রকার সেই মৃতমানবদেহকে নিজের কোলে তুমি ই তুলিয়া লও; এইজন্য, হে ভাগীরথী, তুমি-ই হইতেছ করুণাময়ী মাতা।"

আর্য্যা

২। অচ্যুত-চরণ-তরঙ্গিণি, শশিশেখর-মৌলি-মালতীমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণ-সময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা॥

"হে বিষ্ণুচরণ-নিঃসৃতে, শিব-শিরোজটা-স্থিত শ্বেত-মালতী-মালা-স্বরূপিণী, তোমাতে (তোমার জলে) দেহত্যাগের সময়ে আমাকে যে হরতা বা শিবত্ব দান করা হইবে, তাহা হরিতা অর্থাৎ হরণ করা হয় নাই।"

মন্দাক্রান্তা

৩। শূন্যীভূতা শমন-নগরী, নীরবা রৌরবাখ্যা,
যাতায়াতৈঃ প্রতিদিনমহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ!

সিদ্ধৈঃ সার্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥

"হে মাতঃ গঙ্গে, যে-দিন হইতে তোমার প্রবাহ পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেদিন হইতে যমপুরী শূন্য হইয়া গিয়াছে, রৌরব-আদি নরক নীরব হইয়াছে, মর্ত হইতে স্বর্গে প্রতিদিন বহুবার যাতায়াতের ফলে স্বর্গীয় বিমান-সমূহ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে; এবং স্বর্গে সিদ্ধগণের সহিত স্বর্গবাসিগণ হস্তে কেবল অর্ঘ্যপাত্র ধরিযাই রহিয়াছেন।"

উপেন্দ্রবজ্রা-ইন্দ্রবজ্রা

৪। পয়ো হি গাঙ্গ্যং ত্যজতামিহাঙ্গং পুনর্নচাঙ্গং যদি বৈতি চাঙ্গম্।
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গ্যম্ ॥

"এই পৃথিবীতে যাহারা দেহত্যাগ করে, যদি তাহাদের দেহে গঙ্গার জল লাগে, তাহাদের আর দেহধারণ করিতে হয় না—(তাহারা বিষ্ণুত্ব লাভ করে বলিয়া তাহাদের) করে চক্র, শয়নে অনন্তনাগ, যান-রূপে গরুড-পক্ষী এবং চরণে গঙ্গাজল আসে।"

শার্দূলবিক্রীডিত

৫। কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপি-দ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোক-জননি ত্বদ্‌বারিপূরোদরে
মজ্জজ্জন্তু-কদম্বকং সমুদযত্যেকৈকমাদায় যৎ ॥

"কত অক্ষি, কত মস্তক-করোটি, কত চিতাবাঘ ও হাতীর চর্ম, কত কাক ও পেচক প্রভৃতি পক্ষী, কত সর্প, সুধাধাম চন্দ্রের কত খণ্ড; এমন কি, তুমিও কত, হে ত্রিলোক-জননি! কারণ তোমার বারিপূর্ণ গর্ভে মজ্জনশীল জন্তুসমূহ প্রত্যেকে তোমাকেই পাইয়া (স্বর্গলাভের জন্য) উদিত হয়।"

শিখরিণী

৬। কুতোঽবীচিবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ ॥

"যদি তোমার তরঙ্গ নেত্রপথে আগত হয়, তাহা হইলে অবীচি নামে নরক কোথায় থাকে? অল্প-পরিমাণে তোমার জল যদি পান করা যায়, তাহা হইলে যে পান করে তুমি তাহাকে পীতাম্বর নারায়ণের বৈকুণ্ঠপুরে নিবাসের ফল বিতরণ কর। যদি দেহধারী মানবের দেহ, হে গঙ্গে, তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে শতক্রতু ইন্দ্রের পদলাভও, হে মাতা, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র ব্যাপার হয়।"

শিখরিণী

৭। ত্বমম্ভো লোকানামখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগন্ত্রী নিম্নানামপি নয়সি সর্বোপরি নতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জনয়সি মুরারাতিনিবহান্
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥

"হে জলময়ী মাতা, তুমি জগতের অশেষ পাতক-সমূহ দহন করিয়া থাক; নিম্ন স্থানেও তুমি গমন কর, কিন্তু যাহারা (তোমার চরণে) নত, সকলের উপরে তুমি তাহাদের লইয়া যাও। তুমি নিজে বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত, কিন্তু তুমি বহু বহু মুরারি বা বিষ্ণুর উদ্ভব ঘটাইয়া থাক; আহা, মাতর্ গঙ্গে, তোমার কি অদ্ভুত চরিত্র সদা জয়যুক্ত হইতেছে।"

এই শ্লোকগুলি যিনি রচনা করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় তিনি কিছু অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং শ্লোকগুলি হইতে প্রকাশিত তাঁহার মনোভাব যে সাধারণ গঙ্গাভক্ত, পৌরাণিক-দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুর-ই মতো ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। দরাপ খাঁ গাজী যদি সত্য-সত্যই এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংস্কৃত ভাষায় এতটা দখল যাঁহার ছিল এবং হিন্দুধর্মের প্রতি যিনি এতটা নিষ্ঠা বা প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মুসলমান সজ্জন কে ছিলেন জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সুখের বিষয়, দরাপ খাঁ গাজী সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যিক উল্লেখ আছে, এবং "পাথুরে' প্রমাণ"-ও আছে। ইনি ত্রিবেণীতে বাস করিতেন বলিয়া যে কিংবদন্তী আমার পিতামহের নিকট শুনিয়াছিলাম, সাহিত্যিক উল্লেখ এবং "পাথুরে' প্রমাণ" এই দুইয়ের দ্বারা সেই কিংবদন্তী সমর্থিত হইতেছে।

দরাপ খাঁর নামের সহিত "গাজী" উপাধি মিলিতেছে। "গাজী" অর্থে, যে মুসলমান ব্যক্তি ধর্মের নামে বিধর্মী অ-মুসলমানের বিপক্ষে আক্রমণে বা যুদ্ধে যোগদান করে ; এই উপাধি হইতে, দরাপ খাঁ যে কোনও কালে অন্ততঃ যোদ্ধা ছিলেন এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয়। "খাঁ" বা "খান্" পদবী তুর্কী ভাষার, ইহার অর্থ "রাজা", এবং ইহা উচ্চবংশের মুসলমানের—বিশেষতঃ তুর্কী-জাতীয় মুসলমানের—পরিচায়ক। "দরাপ" বা "দরাফ" নামটি লইয়া পবে বিচার করিব।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যতগুলি "ধর্ম-মঙ্গল" কাব্য পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর রচিত গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ১৬৫০-এর মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছিল। এই বইখানি এতাবৎ অপ্রকাশিত ছিল, সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম্-এ পি এচ্-ডি এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল এম্-এ-র সম্পাদনায বর্ধমান-সাহিত্য-সভা কর্তৃক অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৫১ সাল)। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের প্রারম্ভে বন্দনা-পালা অংশে, গণেশ, ধর্ম, ঠাকুরাণী বা দেবী, চৈতন্যদেব, সরস্বতী, বিপ্র—ইঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ বন্দনার পরে, দিগ্‌বন্দনা অংশে কবির পরিচিত বা শ্রুত বিভিন্ন স্থানের দেবতাদের বন্দনা আছে। দেবতাদের মধ্যে, মুসলমান পীরেরাও বাদ যান নাই। এই দিগ্‌বন্দনায় আমরা পাইতেছি—

ত্রিপর্ণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো যোল শয় কাজী ॥—পৃ. ১৫, মুদ্রিত সংস্করণ।

"ত্রিপর্ণী" বা ত্রিবেণীর দফর খাঁ গাজী ভিন্ন, কবি রূপরাম আরও অন্য পীরের স্মরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ার "শুভি খাঁ" বা শাহ্ সুফী অন্যতম। কথিত আছে, এই শাহ্ সুফী ছিলেন দফর খাঁ বা দরাপ খাঁর ভাগিনেয়।

কারবালার যুদ্ধ লইয়া ফারসীতে মহাকাব্যের আকারে কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। সেইগুলির আধারে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় "জঙ্গনামা" নামক কাব্য-ধারা বা কাব্য-মালা আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ জঙ্গনামা-গুলির মধ্যে বশীরহাটের অন্তর্গত জিকিরপুর-নিবাসী কবি য়াকুব আলীর রচিত বইখানি ("ছহি বড় জঙ্গনামা") ১১০১ বঙ্গাব্দে (১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে) লিখিত—এই বইখানি বাঙ্গালার মুসলমান

সমাজে বিশেষ লোকপ্রিয়। এই বইয়ের প্রারম্ভে দরাফ খাঁর বন্দনা এই ভাবে আছে—

ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান্।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান ॥*

ত্রিবেণীর ঘাটে যিনি বাস করিতেন, এমন মুসলমান সাধক গাজী দফর খাঁ বা দরাফ খানকে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যাইতেছে। তিনি কয়েক শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

ত্রিবেণীতে দরাফ খান্ বা দফর খানের সমাধি ও তৎকর্তৃক স্থাপিত মসজিদ আছে, তাঁহার কীর্তির নিদর্শন আছে, তাঁহার সম্বন্ধে সেখানে কিংবদন্তীও আছে। এতদ্ভিন্ন ত্রিবেণীর সন্নিকট ভাগীরথী-তীরবর্তী নানা স্থানে দরাফ খান্ সম্বন্ধে নানা গালগল্প আছে। "গাজীর কুড়ুল" বলিয়া একটি লোকোক্তি ত্রিবেণী-অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে—'ত্রিশঙ্কুর মতো স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে অবস্থান' অর্থে এই উক্তি প্রযুক্ত হয়; বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন—"বাবা, মৃত্যু তো হয় না, গাজীর কুড়ুল হ'য়ে আছি"—অর্থাৎ জীবন্মৃত অবস্থায় আছি। কথিত আছে, "গাজীর কুড়ুল" নামে প্রসিদ্ধ দুইটি লৌহদণ্ড দরাফ খাঁ বা দফর খাঁর তপস্যার প্রভাবে শূন্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, ১৩০২ সালের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এই শ্রেণীর কতকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি গল্প এই ধরণের: দরাফ খাঁ ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গার ধারে বাস করিতেন। নিজ ধর্ম-মতে সাধনার ফলে তাঁহার অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত হইয়াছিল, তিনি প্রেতযোনির কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিতেন। একটি লোককে ষাঁড়ে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলে; মৃত্যুর পরে তাহার স্বর্গলাভ হয়, কারণ ষাঁড়ের শিঙ্গে গঙ্গামাটি লাগিয়াছিল; এইভাবে মরণকালে গঙ্গামৃত্তিকার সংস্পর্শে তাহার সদ্গতি হয়—প্রেতমুখে এই কথা শুনিয়া দরাফ খাঁয়ের মনে গঙ্গাভক্তি জাগরিত হয়, এবং ইহার পর হইতে তিনি গঙ্গার সাধনা করেন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়।

ত্রিবেণী-সম্বন্ধে উল্লেখ লক্ষ্মণসেন মহারাজের সভার কবি ধোয়ীর "পবনদূত"

* আব্দুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত "কাব্য-মালঞ্চ" বা মুসলমান বাঙ্গালী কবিদের রচনা হইতে চয়ন, কলিকাতা, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকা—আব্দুল কাদির-রচিত "বাঙলা কাব্যের ইতিহাস, মুসলিম সাধনার ধারা", পৃঃ ৩১।

কাব্যে পাওয়া যায়। সুহ্মদেশের দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত এই তীর্থের নিকটে বিষ্ণুর একটি বড়ো মন্দির ছিল বলিয়া ধোয়ীর কাব্য হইতে জানা যায়। এখন হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৪৭ সালের Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকার মে-মাসের সংখ্যায় বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসের D. Money মনি সাহেব An Account of the Temple of Triveni near Hugli নামে একটি প্রবন্ধে (৩৯৩-৪০১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) ত্রিবেণীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-সমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, এবং দরাফ খান্ সম্বন্ধে যে-সমস্ত জনশ্রুতি ও অন্য তথ্য তিনি সংগ্রহ কবিতে পারিয়াছিলেন, সেগুলিও প্রকাশিত করেন। ত্রিবেণীর দরাফ খাঁর মসজিদে অবস্থিত দরাফ খাঁর নামযুক্ত একটি আরবী লিপির শেষাংশ পাইয়া মনি সাহেব সেটির অনুলিখন ইংরেজী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করেন; ইহাতে হিজরীতে যে তারিখ দেওয়া আছে, মনি সাহেব তাহার সহিত খ্রীষ্টাব্দের সমীকবণে ভুল কবেন। পরে Journal of the Asiatic Society of Bengal-পত্রিকার XLI বা একচল্লিশের খণ্ডে H. Blochmann ব্লকমান সাহেব বাঙ্গালা-দেশের কতকগুলি আরবী ও ফারসী শিলালেখের পাঠোদ্ধার প্রকাশিত করেন (Notes on Arabic and Persian Inscriptions in the Hugli District প্রবন্ধে—pp. 280ff); তন্মধ্যে ত্রিবেণীতে দরাফ খান্ গাজীর সমাধিতে অবস্থিত ও মনি সাহেবের দ্বারা আংশিকভাবে প্রকাশিত শিলালেখটি সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করেন, এবং দরাফ খানের আরও দুইটি আরবী-ভাষাময় শিলালেখ অনুবাদ-সহিত প্রকাশিত করেন। দরাফ খান্ সম্বন্ধে এই লেখাগুলি হইতেছে তাঁহার সময়ের প্রত্যক্ষ "পাথুরে' " প্রমাণ।

দরাফ খান্ বা দফর খানের নামের শুদ্ধ রূপ হইতেছে "ধ্ব.ফর্ খান্"— ইহার ভারতীয় অনুবাদ হইবে "বিজয় রায়" অথবা "জয়রাজ"; "ধ্ব.ফর" শব্দ, ইহার আদিতে যে "ধ্ব.া" বা "জ্বোয়্" অক্ষর আছে, আরবীতে তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে dhw (ইংবেজী this, that, then প্রভৃতি শব্দের th- বা dh-এর ধ্বনির সহিত অন্তস্থ:-য় বা w-র ধ্বনি মিশ্রিত)। ফারসীতে এই ধ্বনি সাধারণ জ্ব z-তে পরিবর্তিত হয়। মূল আরবী উচ্চারণে যেন Dhwafar, ফারসী উচ্চারণে ও তাহার অনুকরণে ভারতীয় উচ্চারণে

Zafar। "খান্" শব্দ তুর্কী ভাষার, ইহার মূল অর্থ "রাজা"—ইহা তুর্কীদের মধ্যে ব্যবহৃত আভিজাত্য-ও সম্মান-বাচক পদবী ছিল। পরে ফারসী ভাষাতেও এই পদবী গৃহীত হয়, এবং ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও ইহার ব্যবহার ক্রমে সাধারণ হইয়া দাঁড়ায়; এবং কচিৎ হিন্দু, এমন কি ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই পদবীর প্রতিষ্ঠা হয়। ত্রিবেণীর একটি আরবী লিপিতে দফর (দরাপ) বা জফর খাঁকে "খান জফর (ধ্ব.ফর)" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম-প্রথম এই "খান্" পদবী কেবল তুর্কীদের নামেই ব্যবহৃত হইত।

আরবীর ধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণ করিবার চেষ্টা এখন হইতে ৬।৭।৮ শত বৎসর পূর্বে ফারসী-ভাষীদের মধ্যে অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। এইজন্য Dhwafar হইতে Dafar "দফর" রূপেব উদ্ভব সহজেই হইতে পারে; ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে নামটি রূপরামের ধর্মমঙ্গলে এই "দফর" রূপেই লেখা হইয়াছে। "দফর" হইতে বর্ণ-ব্যত্যয়ে "দরফ", পরে "দরপ" ও শেষে "দরাফ, দরাপ" এইরূপ পরিবর্তন সহজ। ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব ত্রিবেণীতে "জফর"-এর স্থানীয় উচ্চারণ "দপর" শুনিয়া গিয়াছেন (JRAS, 1847, p. 394); ১৮৭০ সালে ব্লকমান সাহেবও ত্রিবেণীতে "জফর"-স্থলে "দপর" শুনিয়াছিলেন (JASB., 1870)। সুতরাং Dhwafar বা Zafar হইতে "দফর, দপর, দরফ, দরাফ, দরাপ"। "ধ্ব.া" বা "জোয়্" অক্ষরের মতো "দ্বাদ্" বা "জোআদ" অক্ষরের এবং "ধাল" বা "জাল" অক্ষরেব উচ্চারণও কেহ-কেহ আরবীর মোতাবেক শুদ্ধরূপে করিতে চেষ্টিত হইতেন; ইহার ফলে "খিদির, খিজির", "জোহা, দোহা", "ফদল, ফজল", "দ্বাল্লীন্, জাল্লীন্", পুরাতন বাঙ্গালা "করধা"=আধুনিক বাঙ্গালা "কর্জ, কর্জা=কর্জ", "সিলিমাবাজ, ফতেয়ারাজ=সিলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ", "কাগদ, কাগজ", "তাকাজা"-স্থানে "তাকাদা" বা "তাগাদা", "খেদমৎ, খেজমৎ", প্রভৃতি বানান ও উচ্চারণ, প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় দেখা যায়।

"জফর খান্ (ধ্ব.ফর খান্)" হইতে "দরাফ বা দরাপ খাঁ"—এই তো গেল নাম-রহস্য। দরাফ খাঁনের শিলালেখ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কী জানা যায়? ত্রিবেণীতে দফর বা দরাফ খাঁর যে সমাধি আছে, সেই সমাধি এখন "গাজীর দরগা" নামে প্রসিদ্ধ; এই নামটি, সমাধি-মধ্যে দুইটি লোহার কীলের জন্য

হইয়াছে। এই সমাধির সংলগ্ন একটি মসজিদ আছে। সমাধি ও মসজিদ উভয়-ই এখন নিতান্ত ভগ্ন অবস্থায়। সমাধি ও মসজিদ উভয়-ই, হিন্দু যুগের একটি কালো পাথরের মন্দিরকে ভাঙ্গিয়া, তাহার প্রস্তরাদি মাল-মশলা লইয়া তৈয়ারী হইয়াছিল। হিন্দু মন্দিরের নক্‌শা-কাটা পাথর এবং বহু দেবমূর্তি ও রামায়ণ-মহাভারতের খোদিত চিত্র দ্বারা অলংকৃত পাথর, মসজিদ ও সমাধির গায়ে এখনও লগ্ন আছে; ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব এগুলির কয়েকটি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন, এবং ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ" নামে ইংরেজীতে যে মূল্যবান্ প্রবন্ধ Journal of the (Royal) Asiatic Society of Bengal-এ প্রকাশিত করেন (পৃঃ ২৪৫-২৬২), তাহাতে এই-সব মূর্তি ও ।চত্রের কথা .এবং তলায সেন-যুগেব রাজাদের সময়ের বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত-ভাষায় চিত্রের বর্ণনা-মূলক যে লিপি আছে, তাহার চিত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

দরাফ খাঁ গাজী ছাড়া তাঁহাব আত্মীয় আরও কতকগুলি ব্যক্তির সমাধি এই স্থানে আছে।

দরাফ খাঁ গাজীর যে তিনটি লেখ পাওয়া গিযাছে, সেই তিনটি-ই আরবী ভাষায় রচিত। প্রথমটির পাঠ সর্বত্র অটুট নাই, কষ্টে পডিতে হয়, অনেকটা এখন পড়াই যায় না। ইহা হইতেছে ২৪ ছত্রের একটি আরবী "কসীদা" বা কবিতা। ইহাতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জফর খানের (দফর খানের) বীরত্বের কথা আছে, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আছে। ১৭, ১৮ ও ১৯-এর ছত্র হইতে এই তথ্যটুকু পাওযা যায়: "...তুর্ক জ়ফর খান্, সিংহের মধ্যে সিংহ ...জনহিতকর ইমারত-নির্মাতাদেব মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ, প্রাচীন যোদ্ধাদের পরেই, কাফেরদিগকে তরবার ও বর্ষা দ্বারা আঘাত করিয়া, ও প্রত্যেক (মুসলমান)-কে প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিয়া..." ইত্যাদি। শেষের ছত্রে তারিখ দেওয়া আছে—হিজরা ৬৯৮, অর্থাৎ ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই লেখটিতে না।.? আর একটি নাম পাওয়া যায়,—নাস্বির মুহম্মদ ওরফে বুরুহান কাদ্বী (কাজী)। দরাফ খাঁর সমাধির মাতোয়ালীর কাছে যে "কুর্সী-নামা" বা বংশাবলী মনি-সাহেব ১৮৪৭ সালে পাইয়া-ছিলেন, তাহাতে দরাফ খান্ (জফর খান্)-এর অন্যতম পুত্রের নাম পাওয়া

যায়—"বরখান্ গাজী"। এই "বরখান্ গাজী" (বড় খাঁ গাজী?) ও শিলালেখের "বুরহান্ কাজী" সম্ভবতঃ এক-ই ব্যক্তি।

দরাফ খাঁর দ্বিতীয় লেখটির তারিখ হইতেছে হিজরী ৭১৩, ১লা মহর্‌রম, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৩১৩, ২৮এ এপ্রিল। ইহা দুইখানি প্রস্তর-খণ্ডে উৎকীর্ণ। ইহাতে "দারু-ল্-খয়্‌রাৎ" (অর্থাৎ "মঙ্গলালয়") নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত আছে। শম্‌সুদ্দীন সুলয়্‌মান বা ফীরোজ় শাহ্ (১৩০২-১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ) তখন বাঙ্গালার মুসলমান সুলতান ছিলেন। এই লেখে, জ়ফর খান্‌কে "বিখ্যাত খান্" ও নানা সদ্‌গুণের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ও তাঁহার পূরা নাম হিসাবে "খান্ মুহম্মদ ধ্বং.ফর খান্" বলা হইয়াছে। তৃতীয় লেখটিরও তারিখ ৭১৩ হিজরী=১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ; ইহাতে কেবল ঈশ্বরের স্তুতি আছে, কাহারও নাম নাই।

লিপি তিনখানি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম জয়ের পরেই, পাথরে তৈয়ারী স্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু মন্দিরটি ধ্বংস করিয়া তাহার মাল-মশলা লইয়া, বিজেতা বিদেশী তুর্কীরা একটি মসজিদ তৈয়ারী করে। সম্ভবতঃ ধ্দ.ফর (জ়ফর) খান্ ছিলেন এই বিজয়ী তুর্কী সেনার নেতা, কাফের-বধ ও তাহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া যোগ্য মুসলমান পাত্রে দান-রূপ পুণ্য কর্ম তিনি-ই করিয়াছিলেন; এবং হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসের উপরে প্রস্তুত প্রথম মসজিদটি তাঁহার-ই কীর্তি ছিল; কারণ, ১২৯৮ সালের কাব্যময় আরবী লিপিটিতে, তাঁহাকে "জনহিতকর ইমারত-নির্মাতা" বলিয়া প্রশংসা করা হইতেছে। বাঙ্গালার মুসলমান সুল্‌তান রুক্‌নুদ্দীন কৈকাউস শাহের আমলে, জফর খান্ এই স্থান জয় করিয়া, উহার জায়গীরদার বা শাসক-রূপেই উপনিবিষ্ট হন বলিয়া-ই মনে হয়; কারণ এই ঘটনার ১৫ বৎসর পরে, সম্ভবতঃ তাঁহার মসজিদের সংলগ্ন স্থানেই, তিনি যে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় আরবী লিপিটি হইতে পাওয়া যাইতেছে; আরবী ও ফারসী ভাষা এবং মুসলমান শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচারের জন্য বাঙ্গালা প্রদেশে ইহার অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও বিদ্যালয়ের খবর এতাবৎ পাওয়া যায় নাই—এই ভাবে মুসলমান সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারে ইনি সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশে প্রথম পথপ্রদর্শক হন। তৃতীয় লিপিটি ঈশ্বরের স্তুতিময়—এটির তারিখও মাদ্রাসা তৈয়ারীর তারিখ, ইহার আরবী

লেখটি অতি সুন্দর ছাঁদের, সম্ভবতঃ এই লেখা মাদ্রাসার ভিত্তি-গাত্র অলংকৃত করিবার জন্য উৎকীর্ণ হয়। ধ্ব.ফর খান্ পরে ত্রিবেণীতেই দেহরক্ষা করেন, এবং সেখানেই সমাহিত হন ; তাঁহার বংশের কয় জনের সমাধিও ঐ মজারে বা গোরস্থানে বিদ্যমান।

উত্তর-বঙ্গে দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর গ্রামের মসজিদে একটি আরবী শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, সেটির নির্মাতা অথবা নির্মাণের জন্য আজ্ঞাদাতা বলিয়া একজন ধ্ব.ফর বা জ়ফর খাঁর নাম পাওয়া যায়। এই শিলালেখটির তারিখ হইতেছে ৬৯৭ হিজরা, অর্থাৎ ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ত্রিবেণীর জফর খাঁর আরবী কবিতাময় লেখের এক বৎসর পূর্বেকার। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় JASB, 1909-এ প্রকাশিত তাঁহার পূর্বোল্লিখিত সপ্তগ্রাম-বিষয়ক প্রবন্ধে এবং তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ"-এ গঙ্গারামপুরের মসজিদের নির্মাতা জফর খাঁকে আমাদের ত্রিবেণীর জফর খাঁর বা দফর খাঁর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে তাহা হইলে জফর খাঁকে এক জায়গা হইতে বহুশত মাইল দূর অন্য জায়গায় টানিয়া আনিতে হয়। গঙ্গারামপুরের মসজিদও বাঙ্গালার সুল্‌তান রুকনুদ্দীন কৈকাউস শাহের আমলে প্রস্তুত হয়, ইহা শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, গঙ্গারামপুরের মসজিদের নির্মাতা জফর খাঁ, ত্রিবেণীর জফর খাঁ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ত্রিবেণীর জফর খাঁর লম্বা চওড়া পদবী নাই, কেবল "তুর্ক জ়ফর খাঁ" এবং "বিখ্যাত খাঁ—খাঁ মুহম্মদ জ়ফর খাঁ", এই বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; এবং ত্রিবেণীর মাদ্রাসার লেখে তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, ঈশ্বর যেন তাঁহাকে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী করেন, এবং তাঁহার মিত্রদের রক্ষা করেন ; ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার শাসন, বা ত্রিবেণীতে তাঁহার অবস্থান, তখনও নিঃশঙ্ক বা নিরুপদ্রব হয় নাই। গঙ্গারামপুরের জফর খাঁর কিন্তু খুব জমকালো নাম ও পদবী দেখা যায়— "শিহাবু-ল্-হ.ক্.ক্ব ওঅ-দ্-দীন, সিকন্দর থানী (=দ্বিতীয় আলেক্সান্দর), উলুঘ্ অধ্ব.ম (অজ়ম্) হুমায়ুন ধ্ব.ফর (জ়ফর) খান্ বহ্‌রাম্ অয়্-তকীন্ সুলত্বান।" এই এতগুলি বিরুদ যাঁহার নামে ব্যবহৃত হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়-ই কোনও অতি উচ্চপদস্থ এবং রাজবংশীয় ব্যক্তি ছিলেন—তিনি সম্ভবতঃ দিল্লীর তুর্কী রাজবংশেরই কেহ ছিলেন, যাঁহাকে প্রায় স্বাধীন রাজার সম্মান

এই লেখে দেওয়া হইয়াছে; "দ্বিতীয় আলেক্সান্দর", ইহা তো মহামহিম সম্রাটেরই উপাধি হইতে পারে; "উলুঘ্" শব্দ তুর্কী ভাষার, "অজম" আরবী ভাষার, দুইয়েরই অর্থ এক—"মহান্"; "হুমায়ুন জফর খান্" তাঁহার ব্যক্তিগত নাম—ত্রিবেণীর জফর খাঁর ব্যক্তিগত নাম হইতেছে "মুহম্মদ"; "বহ্‌রাম" ফারসী নাম বা উপাধি; "অয়্-তকীন" অর্থে "চন্দ্রদেব"—ইহা তুর্কী নাম বা উপাধি; ইঁহাকে আবার "সুল্‌ত্বান" বা 'স্বাধীন রাজা' বলা হইয়াছে, এবং ইঁহার সম্বন্ধে শেষ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে "ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করুন, ও তাঁহার জীবন দীর্ঘ করুন।" আর একটি জিনিস লক্ষণীয়; গঙ্গারামপুরের জফর খান্ নিজেকে "গাজী" বলেন নাই—"গাজী" অর্থে, যে বিধর্মীদের সঙ্গে লড়াই করে। এতগুলি বিরুদ ১২৯৭ সালে নিজের নামের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া, এক বৎসরের মধ্যেই (১২৯৮ সালে) যে তিনি সে-সমস্ত বিরুদ পরিত্যাগ করিবেন, ত্রিবেণীতে হিন্দুদের সঙ্গে লড়িয়া তজ্জন্য কেবল "গাজী" উপাধি পাইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, এক বৎসরের মধ্যে ত্রিবেণী জয় করিয়া তাহার পাথরের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে কারুকার্য্যময় মসজিদ বানাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিবেন—এক ব্যক্তির পক্ষে ইহা কঠিন ব্যাপার; সুতরাং বলিতে হয়, গঙ্গারামপুরের জফর খান্ সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি।

ত্রিবেণীতে ব্লক্‌ম্যান সাহেবের সংগৃহীত "কুর্সী-নামা"-তে জফর খাঁ-দরাফ খাঁর বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কাহিনীও ঐ "কুর্সী-নামা"-তে আছে। এই "কুর্সী-নামা"-র কাহিনী একেবারে অবিশ্বাস্য—জফর খাঁর শিলালেখের সঙ্গে তাহার কোনও সামঞ্জস্য হয় না। শিলালেখের প্রমাণে বুঝিতে পারা যায় যে, জফর খাঁ ত্রিবেণী-জয়ের পরে সেখানে অন্ততঃ ১৫ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। "কুর্সী-নামা"র মতে, শাহ্ জফর খাঁ গাজী কেবল হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার উদ্দেশ্যেই আসেন, এবং প্রথমে "মান নৃপতি" নামে একজন হিন্দু রাজাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু হুগলীর হিন্দু রাজা ভূদেব কর্তৃক নিহত হন। জফর খাঁর পুত্র Ughwan অগ্‌ওয়ান খাঁ তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, রাজা ভূদেবকে নিহত করেন, বহু হিন্দুকে মুসলমান করেন, ও রাজা ভূদেবের কন্যাকে বিবাহ করেন। জফর খাঁ-দরাফ খাঁর অধস্তন পুরুষদের বংশলতা ("কুর্সী-নামা"-মতে) এই—
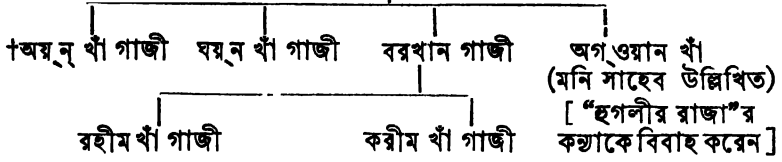
ইঁহাদের সকলের সমাধি ত্রিবেণীতে আছে—জফর খানের হিন্দু-রাজবংশ-জাত পুত্রবধূর-ও। এটি ছিল একটি গাজী-বংশ—সম্ভবতঃ এই বংশের প্রত্যেকেই আশ-পাশের হিন্দুদের সঙ্গে লড়িতেন। তবে ইঁহারা দুই পুরুষের পরে নিশ্চয়-ই আর খাঁটি তুর্কী রহিলেন না, এদেশের মেয়ে বিবাহ করিয়া ভারতীয় এবং বাঙ্গালীই বনিয়া গেলেন। তুর্কী-বিজয়ের একটি ধারা ইঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন—অর্থাৎ কোনও রাজ্যের রাজধানী দখল করিয়া, সেখানে উপনিবিষ্ট তুর্কী ও অন্য স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বাস কায়েম করা। সাতগাঁ ও ত্রিবেণী ত্রয়োদশ শতকের শেষে তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে, ঐ স্থান ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে মুসলমানদের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৪১৭ শকাব্দায়) বিপ্রদাস পিপ্লাই তাঁহার "মনসা-মঙ্গল" কাব্যে, চাঁদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা বর্ণনা-প্রসঙ্গে, সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর একটি উজ্জ্বল বিবরণ দিয়াছেন। হিন্দুতীর্থ সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কথা তিনি বলিতেছেন—

নিবষে জবন জতো তাহা বা বলি কতো মঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
ছয়দ মোলা কাজি কেতাব কোরান রাজি দুই ওক্ত করে তছলীম॥
মসিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে ফয়তা কবরে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে॥

—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, JASB, 1909, পৃ. ২৫৪।

রূপরাম-ও ১৬৫৩ সালে বলিয়াছেন যে, দফর খাঁ গাজীর মোকামে ষোল শত কাজীর বা গাজীর বাস ছিল।

দফর খাঁ গাজীর গঙ্গাভক্ত হওয়ার কথা ১৮৪৭ সালে মনি সাহেব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, "সুরধুনি মুনি-কন্যে" এই শ্লোকটিও অনুবাদের সহিত তিনি দিয়াছেন। মনি সাহেব যে একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন, তাহার পরিচয়

তিনি তাঁহার প্রবন্ধের শেষ অংশে ও অন্যত্র দিয়াছেন। হিন্দু দেব-বাদ তিনি বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করেন নাই; পতনের যুগের রোমানদের দেব-বাদের অনুরূপ বস্তু বলিয়া ইহাকে মনে করিয়া, দফর খাঁর গঙ্গাভক্তির এক উৎকট ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন; এবং অজ্ঞ ও নির্বোধের মতো যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা আবার কবিতার ভাষায় বর্ণনা করিবার হাস্যকর ও বিরক্তিকর প্রয়াস পাইয়াছেন। সাহেবের বিচার-বোধ ও কাণ্ড-জ্ঞান মতে, গঙ্গাদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া দফর খাঁ গঙ্গাভক্ত হইয়া উঠেন, এবং গঙ্গাকে মোক্ষদাত্রী ও মাতা বলিয়া স্তব করেন। এ সম্বন্ধে টীকা নিষ্প্রয়োজন।

দফর খাঁর গঙ্গাভক্তির কোনও প্রমাণ আছে কি? কিংবদন্তী ও উপলব্ধ সংস্কৃত শ্লোকগুলি ভিন্ন আর কোনও পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে এই কিংবদন্তীকে তো একেবারে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। মুসলমান কবি য়াকুব আলী-ও প্রায় আড়াই-শত বৎসর পূর্বে দরাফ খানের প্রতি গঙ্গাদেবীর বিশেষ অনুগ্রহের কথা, মুসলমান আত্মসম্মান-জ্ঞান বজায় রাখিয়া, এইভাবে বলিয়াছেন—গঙ্গা তাঁহার ওজুর (অর্থাৎ নমাজের পূর্বে হাত মুখ ধুইবার) জল যোগাইতেন। কেবল তিনি যে সম্মুখে প্রবাহিত নদী গঙ্গার জলে ওজু করিতেন, এই কথাটুকু বলা-ই তাঁহার অভিপ্রেত নহে—মনে হয়, এখানে গঙ্গার সহিত দরাফ খাঁনের দেবী-ভক্ত সম্বন্ধ লইয়া যে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রতি ইঙ্গিতও আছে।

আমার মনে হয়—প্রতিবেশ-প্রভাবের কারণে শেষ বয়সে দফর খাঁর হিন্দুয়ানির দিকে আকর্ষণ হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। প্রতিবেশ-প্রভাবে, দীর্ঘজীবন-লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে, বয়সের ধর্মে, অনেক কিছু-ই হয়। দফর খাঁ ছিলেন তুর্কী বিজেতাদের অন্যতম, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন যোদ্ধা, বিধর্মীর বিরুদ্ধে অভিযানকারী তুর্কী সওয়ার—chevalier বা knight; সেই জীবনের পরিচয় পাই তাঁহার ১২৯৮ খ্রীষ্টীয় সালের আরবী লেখের মধ্যে। ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার, প্রধানতঃ দুইটি বিভিন্ন পথ বা পদ্ধতি ধরিয়া হইয়াছিল—"তুর্কানা পদ্ধতি" ও "সূফিয়ানা পদ্ধতি"। তুর্ক সেনার দল, "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—"জিতিলে গাজী, মরিলে শহীদ", এইরূপ নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধ চালাইত—

কাফের-বধ, মূর্তি- ও মন্দির-ধ্বংস, মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ করা, জোর করিয়া মুসলমান করা, এই-সব ছিল পুণ্য কাজ ; আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিল, পরাজিত এবং ঈশ্বর-কর্তৃক অভিশপ্ত মূর্তি-পূজক বিধর্মী হিন্দুর ধন-রত্ন লুঠ করিয়া, তাহার নিকট হইতে পাওয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্যে নিজের স্থবিধা করিয়া লওয়া। তুর্কী-বিজয়ের প্রথম শতকে, সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া এই তুর্কানা ঢঙ্গে বা পদ্ধতিতে কাজ চলিতেছিল। ঐ শতকের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তেরর শতকের, বিখ্যাত স্থফী মরমিয়া কবি পুণ্যশ্লোক সাধু মৌলানা জলালুদ্দীন রূমী (জীবৎকাল খ্রীষ্টাব্দ ১২০৭-১২৭৩) স্থদূর রূম বা এশিয়া-মাইনরে বসিয়া লিখিয়াছেন—

চুন্ মস্ত্-ই-অবদ্ গশ্তী, শম্শীর-ই অজল বি-সিতান্,
—হিন্দুয়ক্-ই-হস্তী-রা তুর্কানা তু নঘ্মা কুন্ ॥

"যখন তুমি ভবিষ্যতে অনন্তের (রসে) মাতাল হইবে, তখন অতীতের অনন্তের তলওয়ার লইবে ; তুমি জীবনকে লুঠিয়া লইবে, যে ভাবে (যে তুর্কানা ঢঙ্গে) তুর্ক হতভাগ্য হিন্দুকে লুঠ করে।"

কিন্তু এই জবরদস্তী রীতি কার্য্যকর হইল না—ইহার ফলে হিন্দুরাও আরও জোরে বাধা দিবার জন্য লাগিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আসিল স্থফিয়ানা পদ্ধতিতে ইসলাম-প্রচার। স্থফী সাধনায় ও চিন্তাধারায় এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান ও মনোভাব ছিল, যাহা হিন্দুরাও সমর্থন করিতে পারে। স্থফী সাধকগণ শান্তিপূর্ণ-ভাবে হিন্দুদের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা, সাধন-ভজন ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা, চারিত্র্যের দ্বারা, এবং কোথাও-কোথাও কেরামতি বা সিদ্ধাই জাহির করিয়া, আশ-পাশের হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। স্থফী-বেশ-ধারী সকলেই যে সাধু পুরুষ ছিল, তাহা নহে ; ধর্মধ্বজী "পঞ্চম বাহিনী"র কাজ করিবার জন্য কেহ-কেহ হিন্দু রাজ্যে গিয়া বসিত, স্থফী মতের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা কাহারও-কাহারও পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্থফী-নাম-ধারী কতকগুলি মুসলমান, হিন্দু রাজ্যের অভ্যন্তরে আসিয়া, হিন্দু রাজার নিকট সাধন-ভজনের অনুমতি লইত। পরে ইহারা হিন্দুর নিকটে মহাপাতক-রূপে বিবেচিত গো-হত্যার অনুষ্ঠান করিত। রাজ্যস্বামী হিন্দু রাজা ইহাতে শাস্তি দিতেন। তখন

"অত্যাচারিত" মুসলমান, পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাজ্যে গিয়া ফরিয়াদ করিত; বিপন্ন মুসলমানকে রক্ষা করিবার অজুহাতে তখন মুসলমান রাজ্য হইতে বিজীগিষু মুসলমান সেনার আক্রমণ হইত। হিন্দু রাজার দেশে বহুদিন অবস্থান হেতু, তথা-কথিত এই মুসলমান সাধুর কাছে হিন্দু রাজ্যের সব খবর জানা থাকিত, তাহাতে মুসলমান সেনার পক্ষে হিন্দুদের জয়ে সহায়তা মিলিত। বাঙ্গালাদেশে ও অন্যত্র বহু হিন্দু রাজ্য মুসলমান অধিকারে আসার কাহিনী এই ধরণের। এইরূপ মুসলমান "সাধক"কে অবশ্য পরলোক-সর্বস্ব সত্যকার স্থফী বলা চলে না। আবার আর এক শ্রেণীর সাধু ছিল, যাহারা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকের কাছে হিন্দু অনুষ্ঠানের, হিন্দু শাস্ত্রের এবং শাস্ত্রালোচনার নিন্দা করিত; কেবল বসিয়া বসিয়া নাম-জপ কর—শাস্ত্র-মত পূজা-পাঠ তীর্থ-যাত্রা প্রভৃতির কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহার ফলে, বহু সময়ে সাধনা না হইয়া সাধনার আভাস মাত্র দেখা দিত, এবং দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি, যাহা সংস্কৃত সাহিত্যকে, ও তীর্থ-যাত্রার উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকে আশ্রয় করিয়া ছিল, তাহার উপরে আঘাত লাগিত। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে সাধনার দিকে যাঁহাদের ঝোঁক ছিল, তাঁহাদের মধ্যে তুলসীদাস-প্রমুখ সাধক ছিলেন—বিশেষ-ভাবে সংহত এবং শক্তিশালী মুসলমান রাজশক্তির সমক্ষে হিন্দু discipline বা পরিপাটী অথবা নিয়মানুবর্তিতাকে নষ্ট হইতে দিতে তাঁহারা চাহেন নাই। এই শ্রেণীর 'স্থফী' সাধকদের দ্বারাও হিন্দু-সমাজের ভিতরে ভাঙ্গন ধরাইতে সাহায্য হইয়াছিল। হিন্দুজনগণের মধ্যে এইরূপ স্থফী সাধকদের প্রভাব কতকটা নিশ্চয়-ই হইতেছিল। ইহার-ই প্রতিক্রিয়ার ফল—হিন্দু-সমাজে ভক্তিবাদের পুনঃপ্রচার, এবং সারা ভারত জুড়িয়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের ভাষানুবাদের সাহায্যে প্রাচীন সংস্কৃতির সংরক্ষণের চেষ্টা। কিন্তু তাহা হইলেও, স্থফী প্রচারকদের মধ্যে সত্যকার জ্ঞানী ও দরদী সাধক, ঈশ্বরানুভূতি-যুক্ত বা দিব্যোন্মাদ-যুক্ত মহাপুরুষ কিছু-কিছু নিশ্চয়-ই ছিলেন। ইঁহারা-ই প্রকৃত-পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান চিন্তার সমন্বয়-কার্য্যে জ্ঞাত-সারে বা অজ্ঞাত-সারে আত্মনিয়োজিত হন। ব্যবহারিক জীবনে স্থফীদের সব-চেয়ে বড়ো কথা ছিল—"সুলহ্-ই-কুল্ল্" অর্থাৎ 'বিশ্বমৈত্রী'। কেবল কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র, অন্য ধর্মের মানুষের

সে সৌভাগ্য হইতে পারে না,—ঈশ্বরের অবমাননাকর এরূপ বিশ্বাস বা বোধ বা বিচার তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা নিজেরা অনেকেই অনুষ্ঠানিক-ভাবে ইসলামের সমস্ত নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম পালন করিতেন—ওজু, নামাজ, রোজা, সম্ভব হইলে জাকাত ও হজ, সব-ই করিতেন; কিন্তু অন্যধর্মাবলম্বী যাহারা তাহা করিত না, ভাবশুদ্ধির সঙ্গে যাহারা নিজেদের ধর্ম পালন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে ইঁহারা সহৃদয়তা ও উদার-ভাব পোষণ করিতেন। এই ভাবের ভাবুক হওয়ায়, সত্যকার স্বফীদের চেষ্টায়, এবং উদারচেতা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, 'সন্ত', ভক্ত, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের সহযোগিতায়, প্রথম হইতেই ধীরে-ধীরে ভারতের পুণ্যভূমিতে একটি সত্যকার "মজ্‌মাউ-ল্‌-বঃহ্‌রৈন্‌" অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সংস্কৃতি ও সাধনার 'মহাসাগরের সঙ্গম' হইতেছিল। কাশ্মীরের স্বলতান জ়য়্‌নু-ল্‌-আবেদীন (১৪২০-১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে), মোগল সম্রাট্‌ আকবর ও তাঁহার কয়েকজন সভাসদ্‌, রাজকুমার দারা শেকোহ্‌, সন্ত কবীর, ভক্ত নানক, সন্ত দাদূ প্রভৃতি, ইঁহারা ছিলেন এই সমন্বয়ের নেতা। "তুর্কানা ঢঙ্গ"-এর অবসান কিন্তু এখনও হয় নাই; মুসলমান বলিয়া বিশেষ অধিকার যাহারা চায়, তাহারা সর্বদাই এই তুর্কানা ঢঙ্গকেই ভারতের মুসলমান সভ্যতার, মুসলমান রাজ্যের, মুসলমান জীবনের একমাত্র কথা বলিয়া, এই উৎকট আদর্শকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। ধর্মকে ইহারা বরাবর-ই অনুচিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পথ বলিয়া দেখিয়াছে, এবং সেই ভাবেই ধর্মকে অপমান করিয়াছে। এই মনোভাবেরই অবশ্যম্ভাবী বা সহজ পরিণতি ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এদেশে আসিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া, দফর খাঁ ত্রিবেণীতে বিজেতা তুর্কী রাজার জাতির সম্মানিত ব্যক্তি হইয়া বসিলেন। ধর্মের দিকে তাঁহার প্রাণের টান ছিল, সেই জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বাস-মতো মূর্তি-পূজার মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ তুলিলেন। মোহম্মদীয় ধর্মের শাস্ত্রের জ্ঞান প্রচারিত হউক, এই উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাসা স্থাপিত করিলেন, তাহার নাম দিলেন "দারু-ল্‌-খয়্‌রাৎ", অর্থাৎ 'পুণ্যকার্য্যের স্থান'। এই লেখে নিজেকে এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—"মুরব্বীউ-ল্‌-অরবাবি-ল্‌-য়কীন", অর্থাৎ যাঁহারা নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী, "তরীকা" বা ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথের পথিক যাঁহারা,

তাঁহাদের মুরব্বী বা পৃষ্ঠপোষক। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে আকর্ষণের পরিচায়ক। জনশ্রুতি অনুসারে, তিনি গাজী অর্থাৎ তুর্কানা পথের যোদ্ধা হইতে, শেষে পীর অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার সাধক, প্রেমের সাধক, সুফী হইয়া যান। তখন তাঁহার কাছে হিন্দুর লৌকিক পূজার নূতন অর্থ প্রতিভাত হয়; হিন্দুর দেবতাবাদের সঙ্গে হিন্দুর দার্শনিক এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধারণার বিরোধ যে নাই, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশে একটি প্রধান তীর্থের শ্রেষ্ঠ মন্দির তিনি-ই হয়তো ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে মসজিদ বানান। কিন্তু অহরহঃ তাঁহার সমক্ষে সেই ত্রিবেণী তীর্থে হিন্দু ধর্ম-জীবনের, হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসের, সৌন্দর্য্য-সুষমাময় হিন্দু-ধর্মানুষ্ঠানের স্রোত, সম্মুখে প্রসারিত গঙ্গার স্রোতের মতোই প্রবাহিত ছিল। মনের গাঁঠ খুলিয়া গেলে সব-ই সহজ হয়; বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক ও রূপক যে বিভিন্ন ভাষারই মতো, এই উপলব্ধি তাঁহার আসিয়া যায়—গঙ্গা-ভক্তিকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারা যায়। এই সহানুভূতির ফল, এই মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভাষা-পরিবর্তনের ফল কি গঙ্গার স্তুতিময় শ্লোক—"সুরধুনি মুনিকন্যে"? ইহা অসম্ভব নহে যে, গঙ্গাষ্টকের শ্লোকগুলি কোনও সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দুর রচনা, পীর দফর খান্ গাজীর প্রতি রচয়িতা শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নামে এইগুলি তিনি প্রচারিত করেন;—সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু এই প্রশ্ন স্বতঃ মনে জাগে—তুর্কী বিজেতা খান্ দফর খান্ গাজী, বাঙ্গলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্থায়ী অধিবাসী হইয়া, পরিণত বয়সে কি জলালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ্ গাজীর অথবা আন্তোনি ফিরেঙ্গীর পূর্বাভাস-স্বরূপ হইয়াছিলেন? তাই কি তিনি গঙ্গার ভক্ত-রূপে বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন?

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৪]

মণিপুর-পুরাণ

আমাদের ভারতীয় হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা, এদেশে আগত আর্য্য এবং নানা অনার্য্য জাতির ধর্ম ও সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা এবং হোমাদি অনুষ্ঠান লইয়া, ইন্দ্র-অগ্নি-মিত্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজক আর্য্যগণ কবে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না—বিভিন্ন পণ্ডিত এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন ও করেন। কিন্তু যে-মতটি আমার নিকট যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে এই যে, আর্য্যেরা মেসোপোতামিয়া বা আধুনিক ইরাক দেশ হইয়া, পারস্য বা ঈরান ও আফগানিস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া, খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-এর পরে কোনও সময়ে ভারতে প্রবেশ করিতে থাকেন। ভারতে যে সমুদয় অন্-আর্য্য জাতির মানুষের সঙ্গে এই নবাগত আর্য্যদের সংঘর্ষ বা সংঘাত ও পরে মিলন ও মিশ্রণ ঘটিল, তাহারা ছিল তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর অথবা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ—[১] দ্রাবিড় (দাস বা দস্যু ও শূদ্র নামে আর্য্যদের দ্বারা অভিহিত); [২] নিষাদ (নিষাদদের উত্তর-পুরুষ পরে কোল্ল, ভিল্ল অর্থাৎ কোল ও ভীল নামে পরিচিত হয়—ইহাদের বংশধর হইতেছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোররা, হো, বীর-হড়, খাড়িয়া, ভূমিজ, কোর্‌কু, গদব, শবর এবং ভীল প্রভৃতি মধ্য- ও পূর্ব-ভারতের "আদিবাসী" জাতি); এবং [৩] কিরাত (ইহারা মোঙ্গোল-জাতীয়, ইহাদের নানা ভাষা হইতেছে ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—নেপালের ও হিমালয়ের সানুদেশের আদিম অধিবাসী নেবার, মগর, গুরুঙ্, কনাররী, টীমাল, কিরান্তী, তামাঙ্, লেপ্‌চা, আবর, আকা, মিরি, ডফ্‌লা প্রভৃতি, এবং উত্তর-বঙ্গ ও আসামের তথা ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসিগণ—বোডো, মিকির, মিশ্‌মি, নাগা, কুকি, মেইতেই বা মণিপুরী প্রভৃতি এবং আসামে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আগত অহমগণ—ইহারা হইতেছে কিরাত-জাতীয় মানুষ। নিষাদগণ বোধ হয় ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী—ইতিহাস-পূর্ব যুগ হইতে ইহারা এদেশে বাস করিতেছে, ইহাদের-ই সত্যকার "আদিবাসী" বলা যায়। নিষাদগণের পরে পশ্চিম এশিয়া

হইতে দ্রাবিড়দের আগমন হয়—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০-এর পূর্বেই পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিরাট্ নাগরিক সভ্যতা (যাহার ধ্বংসাবশেষ এখন আমাদের বিস্মিত করিতেছে) খুব সম্ভব এই দ্রাবিড়-ভাষী মানুষের সৃষ্টি। নিষাদগণ ও দ্রাবিড়গণ প্রায় সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে কিরাতদের উপস্থিতির কথা আমরা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ হইতে জানিতে পারি; অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসরের পূর্ব হইতে কিরাতগণ আসাম ও হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালে, উত্তর-বিহারে, উত্তর- ও পূর্ব-বঙ্গে এবং আসামে উপনিবিষ্ট হইতে থাকে।

প্রভুশক্তিসমন্বিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুধীর এবং কল্পনাশীল আর্য্যগণ উত্তর-ভারতে দ্রাবিড, নিষাদ ও কিরাতগণের সংস্পর্শে আসিল, তাহাদের বিজেতা-রূপে। প্রথমটায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বলিয়া ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, যাহার আভাস আমরা ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাই। পরে আর্য্যগণ এদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বসিবার সঙ্গে-সঙ্গে, দেশের আদিম অধিবাসীরা আর্য্যদের ভাষা গ্রহণ করিতে থাকে,—দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং কিরাত গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষার মধ্যে ঈপ্সিত ও আবশ্যক যোগসূত্র রূপে আর্য্যভাষার বিশেষ উপযোগিতা বা কার্য্যকারিতা ছিল বলিয়া, আর্য্যভাষা সহজেই প্রসার লাভ করিতে থাকে। এক-ই আর্য্যভাষা লইয়া যখন আর্য্য, দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং উত্তরে হিমালয়-অঞ্চলে ও পূর্বে উত্তর-বিহারে ও উত্তর-বঙ্গে এবং পূর্ব-বঙ্গে ও আসামে একটি সমভাষিক জনগণ বা রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছিল, তখন হইতে জন-সমাজের অলক্ষ্যে ইহাদের ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত মিলন ঘটিতে থাকে। এই-সকল জাতির মধ্যে নিশ্চয়-ই এমন লোক কিছু-কিছু ছিল, যাহারা অন্য জাতির ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত মিশ্রণ চাহিত না। কিন্তু আর্য্যভাষী ব্রাহ্মণাদি চিন্তানেতাদের মনীষা, তাঁহাদের উদারতা ও সুবুদ্ধি, এই সাংস্কৃতিক মিলনকে একটি পরিপূর্ণ নবীন সংস্কৃতির গঠনের পথে চালিত করিতে সমর্থ হয়। অনার্য্য দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাতের প্রাচীন দেব-বাদ ও পুরাণ-কথা, আর্য্য দেব-বাদ ও পুরাণ-কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত হইয়া, ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়া, হিন্দু পুরাণ-কথায় পরিণত হয়।

প্রাচীন-ভারতে হিন্দু ধর্মে এই দুই ধারার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সচেতন ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র ও অনুষ্ঠানকে দুইটি মুখ্য ভাগে ভাগ

করেন—বৈদিক শাস্ত্র বা "নিগম", এবং বেদেতর বা অবৈদিক শাস্ত্র বা "আগম" ; বেদান্ত শাস্ত্রও "নিগমান্ত বিদ্যা" নামে পরিচিত। হিন্দু মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনার্য্য জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহাদের নিজস্ব দেবতাদের ও প্রাচীন রাজাদের কাহিনী—এক কথায়, তাহাদের পুরাণ-কথা—নূতন মিলিত আর্য্যানার্য্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া, কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া, সংস্কৃত ভাষায় নব-কলেবর প্রাপ্ত হয়, ও তদনন্তর নিখিল ভারতের গ্রহণযোগ্য হয়। এই ভাবে বিশাল অরণ্যানীবৎ হিন্দু-জগতের পুরাণ-কথা সংস্কৃত রামায়ণে, মহাভারতে ও অষ্টাদশ মহাপুরাণে ও উপপুরাণে, দ্রাবিড় দেশের নানা স্থল-পুরাণে, "স্বয়ম্ভু-পুরাণ" প্রভৃতি নেপালের বৌদ্ধপুরাণে, এবং প্রাকৃতে ও আধুনিক আর্য্য ভাষায় নিবদ্ধ, তথা বিভিন্ন অনার্য্য ভাষায় মৌখিক কাহিনীরূপে প্রচারিত, সমগ্র ভারতের পুরাণ-কথা গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহার একটা বড়ো অংশ প্রাচীন কালেই (অর্থাৎ এদেশে তুর্কীদের আগমনের পূর্বে) এবং কিছু পরেও সংস্কৃত পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, বহু স্থলে একটি সমগ্র অনার্য্য-ভাষী জাতি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া দুই-তিন পুরুষের মধ্যে হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে আমাদের চোখের সামনে বহু দ্রাবিড়-গোণ্ড জাতির লোক, কোল-জাতির লোক, এবং নেপালে ও অন্যত্র কিরাত-জাতির লোক হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মানুভূতি এবং পুরাণ-কথা যথারীতি সংস্কৃতে বিধৃত হইয়া, বৃহত্তর হিন্দু-পুরাণের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; বহুশঃ সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত হওয়ার ফলে, এই প্রকার অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও পুরাণ নিখিল-ভারতের দ্বারাও গৃহীত হইয়াছে।

বহুস্থলে আবার দেখা যায়, এইরূপ অনার্য্য পুরাণ আর্য্যানার্য্য বা হিন্দু পুরাণের প্রভাবে আসিয়া গেলেও, তাহার নিজের একটি সংস্কৃতেতর আদিম-গন্ধী রূপও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। মধ্য-ভারতের বিভিন্ন দ্রাবিড়- ও কোল-ভাষী জাতির মধ্যে, এবং এখন আর্য্যভাষী হইলেও যাহার মূলতঃ দ্রাবিড়- ও কোল-ভাষা বলিত এমন (হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে গৃহীত) নানা জাতির মধ্যে, যে-সকল পুরাণ-কথা প্রচলিত আছে, সেগুলির সংগ্রহ ও

বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ Verrier Elwin ভেরিয়ার্ এল্‌উইন্ এ বিষয়ে লক্ষণীয় কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গত নভেম্বর মাসে (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) আমি মণিপুরে যাই—কেবল দুই দিনের "ঝাঁকী দর্শন" এবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কিছু বই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, মণিপুরের ইতিহাস ও folk-lore অর্থাৎ "লোকযান" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়নও করিয়াছি, এবং স্থানীয় দুই-চারিজন সুধী ও পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপও করিয়াছি। মণিপুরীরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, খ্রীষ্টিয় ১৫০০-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রসার লাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আদি কালের ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মণিপুরী হিন্দু-ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট হইতে আগত বাঙ্গালী হিন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন: ইঁহাদের অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর নগর, মণিপুরে হিন্দু সংস্কৃতির একটি প্রাচীন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। মণিপুরী (বা মেইতেই) জাতি, বিরাট্ কিরাত-জাতির ভোট-ব্রহ্ম-শাখার অন্তর্গত কুকি (বা চিন, অথবা কুকি-চিন) প্রশাখার এ৲টি বিশিষ্ট উপজাতি। সৌন্দর্য্য-বোধে এবং কর্ম-কুশলতায়, তথা চিন্তাশীলতায় ও মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত-জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজেদের প্রাচীন দেব-কথা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই; ইহা একাধারে ইহাদের রক্ষণশীলতার ও জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আনুষঙ্গিক আত্মসম্মান-জ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক। আবার ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হিন্দু-পুরাণের সঙ্গে নিজেদের পুরাণ-কথাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টাতেও, অজ্ঞাত-সারে আর্য্যানার্য্য-সম্মেলনের মহৎ কাজে ইহাদের অংশ-গ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মণিপুরের প্রচলিত হিন্দু ধর্মে এক দিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতির সম্মানপূর্ণ স্থান আছে, অন্য দিকে তেমনি বিশিষ্ট মণিপুরী দেব-কাহিনী ও হিন্দু-পূর্ব যুগের নানা রীতি-নীতি অনুষ্ঠান পদ্ধতি ইহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অনেকটা জুড়িয়া আছে। মণিপুরের চিন্তাশীল নেতৃবর্গের আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, এই উভয়ের মধ্যে

পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা, এবং মণিপুরের জীবনে হিন্দু দর্শন ও উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ কথাগুলিকে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলা। মণিপুরকে নিখিল-ভারতের অংশ রূপেই ইঁহারা দেখেন। মণিপুরে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণ প্রচারে যিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, "মণিপুরী পুরাণ" ও সংস্কৃত পুরাণকে একত্র গ্রথিত করিয়া দিতে যিনি নিজ পাণ্ডিত্যের পূর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং যিনি মণিপুরী ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের সেবার জন্য নিখিল ভারতের সাধুবাদ পাইয়াছেন, মণিপুরের সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আতোম্‌বাপু শর্মা সাহিত্যরত্ন পণ্ডিতরাজের নাম এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরের দেব-কথা ও মণিপুরের ইতিহাস, কি ভাবে হিন্দু ভারতীয় দেব-কথা ও ইতিহাসের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, কি ভাবে মণিপুরের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের টানার উপরে ভারতীয় মিশ্র আর্য্যানার্য্য হিন্দুদের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের পড়িয়ান আনিয়া, মণিপুরী হিন্দুত্বের অভিনব ধূপছায়া বস্ত্র বয়ন করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই ভাবে, মিশ্র মণিপুরী (মেইতেই বা কুকি-চিন্) ও হিন্দু-শাস্ত্রীয় পুরাণ-কাহিনীকে আমরা "মণিপুর-পুরাণ" আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি। বলা বাহুল্য, এই পুরাণ-কথা সংস্কৃত ভাষায় অথবা বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ হয় নাই—আংশিক-ভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইংরেজীতে ইহা আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা এখনও মণিপুরীতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আসামের শান-গোষ্ঠীর অহম বা অসম জাতির পুরা-কথা লইয়া তেমনি একখানি অলিখিত "অসম-পুরাণ"-ও আছে। বাঙ্গালার ভগিনী, আর্য্য অসমীয়া ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ত-সার পাওয়া যায়। অনুরূপ অলিখিত "ত্রিপুর-পুরাণ" সম্ভবতঃ ত্রিপুরা বা টিপ্‌রা জাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতগণের মধ্যে ("চন্তাই"-গণের মধ্যে) অনুসন্ধান করিলে মিলিবে; এবং কাছাড়ীদের "হিড়িম্বা বা হেরম্ব-পুরাণ", এবং খাসিয়া ও জৈন্তিয়াদিগের "জয়ন্তী-পুরাণ"-ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া আছে।

নিম্নে এই "মণিপুর-পুরাণ"-এর কতকগুলি লক্ষণীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

মণিপুরীদের প্রাচীন দেবতারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবতাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হন। "মৈ" হইতেছেন ব্রহ্মা, "ইশিঙ্" হইতেছেন বিষ্ণু, ও "মুঙ্‌শিৎ" শিব ; তেমনি "শোরারেল্" বা "শোরারেন্" হইতেছেন ইন্দ্র, "মার্জিঙ্" কুবের, "খোরিফাবা" বরুণ, "বাঙ্‌ব্রেল্" যম, "ইরুম্" অগ্নি, এবং "তাওরোইনাই" হইতেছেন নাগ-রাজ অনন্ত।

শিব ও পার্বতী বিশেষ করিয়া মণিপুরে অবস্থানের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মণিপুরে "নোঙ্‌মাইজিঙ্" বা নীলকণ্ঠ-গিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কতকগুলি পর্বত বাসের জন্য তাঁহাদের মনঃপূত হইল। এই পর্বতগুলি এখন মণিপুরের বিভিন্ন তীর্থ-রূপে পরিচিত, এই-সব স্থানে সহস্র-সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। মণিপুরে শিব নূতন করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার একটি নূতন নাম হইল—"পোইরেইতোন্" অর্থাৎ 'যিনি নূতন স্থানে আসিয়াছেন'।

শিব মণিপুরে আসিয়া সপ্তশীর্ষ "সানাজিঙ্" বা স্বর্গভূমি হইতে সাত জন দেবতার আবির্ভাব ঘটাইলেন। ইঁহারা সাতটি গ্রহের রূপে বিদ্যমান আছেন—(১) "নোঙ্‌মাইজিঙ্" বা সূর্য্য, (২) "নিঙ্‌থোউকাবা" অর্থাৎ চন্দ্র, (৩) "লেইপাক্‌পোকু" অর্থাৎ মঙ্গল, (৪) "য়ুম-সাইকে-সা" অর্থাৎ বুধ, (৫) "সাগোলসেন্" অর্থাৎ বৃহস্পতি, (৬) "ইরাই" অর্থাৎ শুক্র, ও (৭) "থাঙ্‌জা" অর্থাৎ শনি। ইঁহাদের মধ্যে মঙ্গলের মহিষমুণ্ড, বুধের গজমুণ্ড, বৃহস্পতির হরিণমুণ্ড ও শুক্রের ব্যাঘ্রমুণ্ড।

শিব ও পার্বতী তৎপরে মণিপুর রাজ্যের ঈশান-কোণে (উত্তর-পশ্চিমে) অবস্থিত "কোউ-ব্রু" বা কুমার-পর্বতে গিয়া অবস্থান করিলেন। মণিপুরে ইঁহাদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইঁহারা এখানে আসিয়া রাস-নৃত্য করিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাস-নৃত্য করিতেছেন, তখন গোপেশ্বর শিব ও দেবী রাস-মণ্ডপের বাহিরে দ্বারে দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত। ভিতরে রাস-নৃত্যের বাদ্য ও ধ্বনি শুনিয়া দেবীর আকাঙ্ক্ষা হইল যে, তিনিও রাস-দর্শন করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি শিব ও উমাকে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে গিয়া নিজেরা যাহাতে রাস-নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নির্দেশ করিলেন। মহারাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ইঁহারা মণিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন ;

এবং "কোউ-ব্রু"পাহাড় রাসের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া, শিব ও উমা বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু দেশটি নানা নদীর জন্য জলময় ছিল। যাহাতে দেশটি শুষ্ক হইয়া যায়, তজ্জন্য শিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন আগমন করিলেন; একটি বিশেষ অঞ্চল জলশূন্য হওয়ায় উহা "বিষ্ণুপুর" নামে পরিচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সঙ্গে দশ জন দেবতা আসিলেন—"হাওবা শোরারেল" বা ইন্দ্র, "মারজিঙ্" বা কুবের, "রাঙ্ব্রেল্" বা যম, "খোরিকাবা" বা বরুণ, "ইরুম্-নিংখৌ" বা অগ্নি, "থাঙ্জিঙ্" বা অশ্বিনীকুমার অথবা নির্ঋতি, "চিঙ্খেই-নিঙ্থোই" বা ঈশান, "লোইয়া-লাকৃপা" বা বায়ু, এবং "নোঙ্সোবা" ও "কোঙ্বা-মেইরোম্বা"। ইঁহাদের চেষ্টায় সমস্ত দেশটি আর্দ্রতা হইতে মুক্ত হইল, এবং এই দশজন দেবতার প্রথম আটজন, অষ্ট দিকপাল হইলেন, কেবল "নোঙ্সাবা" ও "কোঙ্বা-মেইরোম্বা" ইন্দ্রের সহিত পূর্বের অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিলেন। মণিপুরে শিব ও পার্বতী আসিয়া পর্বতের অধিবাসী-রূপে কেবল কিরাত-জাতীয় লোকেদের দেখা পান।

দেশটি পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত হইলে পরে, শিব ও উমার রাস-নৃত্যের আয়োজন হইল। জগৎপিতা ও জগন্মাতার মহারাস উপলক্ষ্যে দেবতারা নানা বাদ্য-যন্ত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্ত-নাগ নিজের মাথার মণির দ্বারা সাত দিন সাত রাত ধরিয়া, মহারাসের অবসান পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশ আলোকিত করিয়া রাখিলেন; সেই জন্য দেশটার নাম হইল "মণিপুর"। মণিপুর এই ভাবে সৃষ্টির উষঃকাল হর-পার্বতী রাস-নৃত্যে দ্বারা পবিত্র হইল; দেবতারা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং মণিপুরের ভূমিকে আশীর্বাদ করিলেন—চিরকাল এই দেশ হরিদ্বর্ণ থাকিবে, এবং পরমেশ্বরের প্রতি দেশবাসীর অচলা ভক্তি থাকিবে। পূর্বে শিবের নাম অনুসারে দেশের নাম হইয়াছিল "শিব-নগর," মহারাসের পর হইতে ইহা "মণিপুর" নামেই প্রসিদ্ধ হইল।

দেবতারা শিবকেই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু শিব অনন্ত-নাগকে দেশের রাজা করিলেন। বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে মণিপুরের ভূমিতে এক স্থানে একটি সুরঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পার্শ্বে একটি পাহাড়ের উপরে অনন্ত-নাগের রাজপাট ও সিংহাসন স্থাপিত হইল। কার্ত্তিকেয় ও গণেশের মূর্তি রাজবাটীর সিংহদ্বারের দুই পাশে স্থাপিত হইল।

রাজবাটী স্থাপনের পরে, সময় নির্দেশের জন্য একটি তালমান-যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল। অনন্ত-নাগ দেবতাদের প্রীতির জন্য নৌকা লইয়া বাইচ-খেলার প্রবর্তন করিলেন। এই বাইচ-খেলায় দেবতা ও অপ্সরোগণ যোগ দিয়া আমোদ পাইলেন। দোড়ি টানিয়া শক্তি-পরীক্ষা খেলার পরিবর্তে, লম্বা দণ্ড লইয়া টানাটানি খেলারও প্রবর্তন হইল। "মারৃজিঙ্" বা কুবের-দেব, "কাঙ্-জেই" অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া পোলো-খেলা আবিষ্কার করিলেন; দেবতারা সাত জন সাত জন করিয়া দুইটি প্রতিযোগী দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম এইরূপ ক্রীড়া করিলেন। এই পোলো-খেলার দ্বারা দেবতারা প্রীত হন; সেইজন্য দেশে কোনও মহামারী দেখা দিলে, মণিপুরীরা দেবতাদের নামে পোলো-খেলার লাঠি ও গোলা উৎসর্গ করিয়া থাকে।

এই ভাবে মণিপুরের প্রথম রাজা হইলেন অনন্ত-নাগ। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া তিনি মণিপুর হইতে তাঁহার নিজ রাজ্য পাতালে ফিরিয়া গেলেন। অনন্ত-নাগ মণিপুরের প্রথম রাজা ছিলেন বলিয়া, মণিপুরের রাজাদের বিশেষ লাঞ্ছন হইতেছে, মুকুট মাথায় জটিল গ্রন্থির আকারে বিন্যস্ত নাগ-মূর্তি; এই মূর্তির চিত্র তাঁহাদের রাজকীয় পতাকায় অঙ্কিত থাকে।

অনন্ত-নাগের পরে মণিপুরের রাজা হন চিত্রভানু নামে গন্ধর্ব। কি ভাবে তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সম্বন্ধে মণিপুরের প্রাচীন পুরাণ-কথায় কিছু-ই উল্লিখিত নাই।

মণিপুরের প্রথম মানুষের সৃষ্টি কি করিয়া হয়, সে সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটিকে হিন্দু-পূর্ব বা আর্য্য-পূর্ব যুগের মেইতেই বা মণিপুরী সৃষ্টি-কথা বলিতে পারা যায়। মণিপুরী ভাষার পুরাণ ("লৈথাক্-লৈখারোল্") অনুসারে, শিব এই সৃষ্টি-কথা প্রথমে গণেশকে শুনান। এই সৃষ্টি-কথা হইতেছে এই প্রকার।

পরমেশ্বর "আতিয়া-গুরু-শি-দবা", স্বর্গে যাঁহার বাস ("আতিয়া" অর্থে আকাশ বা স্বর্গ, "গুরু" সংস্কৃত শব্দ, "শি-দবা" অর্থে অমর), তিনি মানব সৃজন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্বীয় দেহ হইতে "কোদিন্" নামে এক দেবতার সৃষ্টি করিলেন। কোদিন্‌কে আজ্ঞা দেওয়া হইল, এমন একটি প্রাণী সৃজন করিতে, যে জন্ম হওয়ার কারণেই মৃত্যুর অধীন হইবে। কোদিন্ তখন সাতটি ভেক ও সাতটি বানর সৃজন করিয়া, শি-দবা গুরুর সমক্ষে স্থাপিত

করিলেন। শি-দবা গুরু কিন্তু ইহাতে খুশী হইলেন না ; এই জীবগুলির জ্ঞান-বিচার এবং অনুভব-শক্তি ছিল না। তিনি কোদিন্‌কে বলিলেন—"দেখ, আমি এই দাঁড়াইয়া আছি ; আমার রূপ বা ছায়া ধরিয়া কোনও প্রাণী সৃজন কর।" কোদিন্ তখন তদনুসারে নূতন একটি রূপ বা আকার গঠন করিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রাণ-শক্তি দেওয়া কোদিন্-এর সাধ্যের বাহিরে ছিল। তখন শি-দবা গুরু তাহাতে প্রাণ-বায়ু সঞ্চারিত করিলেন, এবং এইভাবে মানুষের উদ্ভব হইল। ভেক সাতটিকে তিনি জলে ছাড়িয়া দিলেন, ও বানর সাতটিকে পাহাড়ে পাঠাইলেন ; মানুষ আসিয়া উপত্যকায় বাস করিতে লাগিল।

ইহার পরে আতিয়া-গুরু-শি-দবা মানবের রূপে সূর্য্য ("নুমিৎ") ও চন্দ্র ("থা") সৃজন করিলেন ; সূর্য্যের নাম হইল "কোজিন্-তু খোকৃপা" ও চন্দ্রের "আশিবা"। ইহার পরে গুরু শি-দবা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন।

আতিয়া-গুরু-শি-দবা পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে একটি সুরঙ্গ-পথ দিয়া, প্রথম প্রকট হন। এই সুরঙ্গ-পথ বা গহ্বর বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে প্রস্তুত হইয়াছিল। শি-দবা গুরুর সঙ্গে সাতজন অপ্সরা বা দেবীও পৃথিবীতে আসেন। এই সাতজন দেবী (মণিপুরী ভাষায় ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম আছে) সাত গ্রহ-দেবতার সহিত বিবাহিত হন ; এবং এই সাত দেব-দম্পতীর প্রত্যেকের একটি করিয়া পুত্র হয়। সেই পুত্রেরা মণিপুরী জাতির সাতটি "শালৈ" অর্থাৎ উপজাতির অথবা গোত্রের পূর্বপুরুষ। আর্য্য বা হিন্দু গোত্রের সহিত এই সাতটি গোত্রের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যথা—(১) "অঙোম্" =ভারদ্বাজ, মতান্তরে কৌশিক ; (২) "নিঙ্‌থৌজা" = শাণ্ডিল্য ; (৩) "লুয়াঙ্" =কাশ্যপ ; (৪) "খুমোল্" বা "খুমোন্" = মৌদ্‌গল্য (এই গোত্র-নাম কচিৎ "মধুকুল্য" রূপেও বিকৃত হইয়াছে) ; (৫) "খাবা-ঙাঙ্‌বা" = নৈমিষ্য, মতান্তরে ভারদ্বাজ ; (৬) "মোইরাঙ্" = আত্রেয় ; এবং (৭) "চেঙ্‌লোই" =ভারদ্বাজ। গুরু শি-দবা পরমেশ্বরের দ্বারা সাতটি গোত্রের আদি-পুরুষ নির্ধারণের কথা, হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র সপ্তর্ষি হইতে নানা ঋষি বা আর্য্য গোত্রের উদ্ভবের কথার অনুরূপ। মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আবার এই সপ্ত "শালৈ" বা গোত্রের আদি পুরুষগণের উদ্ভব হয় গুরু শি-দবার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে—সপ্ত গ্রহদেবের

সহিত সপ্ত দেবী ও অপ্সরোগণের বিবাহের ফলে নহে। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস মত, যেমন ব্রহ্মার বা ঋগ্বেদোক্ত "পুরুষ"-এর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উদ্ভব হয়, তেমনি গুরু শি-দবার দক্ষিণ চক্ষু ও বাম চক্ষু, দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণ, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র ও বাম নাসারন্ধ্র, এবং দন্ত হইতে এই সাত "শালৈ"-এর আদি পুরুষগণ আবির্ভূত হন।

মণিপুরী পুরাণ "লৈথাক্-লৈখারোল্" গ্রন্থে অন্যত্র মণিপুরের আদিম দেবতাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটি হইতেছে "পাখাঙ্‌বা" (বা "সেন্‌ত্রেঙ্‌") ও "শেনামাহি" (বা "কুপ্‌ত্রেঙ্‌") দেবতাদ্বয়ের উপাখ্যান, ইঁহারা পরমেশ্বর গুরু শি-দবার পুত্র। ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইঁহারা পিতার অনুমতি লইয়া মণিপুরে আসিলেন। পিতার প্রতি ইঁহাদের ভক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে, গুরু শি-দবা মৃত গাভীর আকার ধারণ করিয়া বিজয়া-নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। সেন্‌ত্রেঙ্‌ দেব অনুমানে বুঝিলেন যে এই মৃত গাভী আর কেহ-ই নহে, গুরু শি-দবা। দুই ভাইয়ে তখন মৃত গাভার দেহ টানিযা ডাঙ্গায় তুলিলেন। গুরু শি-দবা গাভীর দেহ হইতে বাহির হইয়া স্বরূপে দেখা দিলেন ও পুত্রদেব বলিলেন যে, তিনি তাহাদের পিতার প্রতি শ্রদ্ধা দর্শনে তুষ্ট হইয়াছেন—সেন্‌ত্রেঙ্‌-কে তিনি নূতন নাম দিলেন "পাখাঙ্‌বা" অর্থাৎ 'যে পিতাকে চিনে' ("পা" = পিতা, "খাঙ্‌বা" = চেনা, জানা)। দুই ভাই মৃত গাভীর শরীর কাটিযা, সাত "শালৈ" বা গোত্র-পতির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। একজন পাইলেন চোখ দুইটি ও অধোদেহের কিছু অংশ, একজন মাথার খুলি, একজন হৃৎপিণ্ড, একজন চারিটি পা, ইত্যাদি। গোরুর চামড়া একস্থানে শুখানো হইল, সেই স্থানের নাম "কাঙ্‌লা" ("কাঙ্‌বা" = শুখানো হইতে)। সাত গোত্রপতি তখন মৃত গাভীর দেহের অংশ লইয়া অগ্নিতে যজ্ঞ করিলেন। এই প্রাচীন কুকি-উপাখ্যানে এই যজ্ঞের কথার অবতারণা করিয়া, ইহাতে হিন্দু বৈদিক ধর্মের হাওয়া একটু বহানো হইয়াছে।

গুরু শি-দবা বলিলেন, দুই ভাইদের মধ্যে যে প্রথম সারা জগৎ ঘুরিয়া আসিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি রাজা করিয়া দিবেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে কুপ্‌ত্রেঙ্‌ (বা শেনামাহি) জগৎ-পরিক্রমা করিবার জন্য কাঙ্‌লা হইতে

বিনির্গত হইলেন, কিন্তু "লেইমারেন্‌-শিদাবি" নামে দেবতার পরামর্শে সেন্‌ত্রেঙ্‌ (বা পাখাঙ্‌বা) পিতার সিংহাসনের চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। গুরু -শি-দবা ইহাতে প্রীত হইলেন, এবং সেই প্রদক্ষিণকেই তিনি জগৎ-পরিক্রমার অনুরূপ স্থির করিয়া, পাখাঙ্‌বা-কে রাজা করিয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বজগৎ ঘুরিয়া আসিয়া কুপ্‌ত্রেঙ্‌ দেখিলেন যে, ভাই রাজা হইয়া বসিয়াছেন। (মাতা পার্বতীকে পরিক্রমণ করা-ই জগৎ-পরিক্রমার তুল্য, এইরূপ একটি উপাখ্যান আমাদের মধ্যেও আছে—গণেশ এইভাবে কার্ত্তিককে বোকা বানান।) ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কুপ্‌ত্রেঙ পাখাঙ্‌বাব সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। পাখাঙ্‌বা ভয় পাইয়া অপ্সরা বা দেবকন্যাদের আশ্রয় লইলেন। দেবকন্যারা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, ও "আউগ্রিহাঙেল্‌" নৃত্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। কুপ্‌ত্রেঙ্‌ বা শেনামাহি তখন পাখাঙ্‌বার বিনাশের জন্য ভূমির উপরে নিজের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়া চাপ দিলেন। ইহাতে পাতাল হইতে গুরু শি-দবা বাহির হইয়া আসিলেন। পাতালের অনন্ত-নাগ ("তাওরোই-নাই") ছিলেন তাঁহার বাহন। গুরু শি-দবা দুই ভাইয়ের বিরোধ শান্ত করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, পর-পর এক-এক বছর করিয়া দুইজন রাজত্ব করিবেন। যিনি রাজত্ব হইতে বিরত থাকিবেন, তিনি মণিপুরের প্রত্যেক ঘর হইতে লেইমারেন্‌-শিদাবি দেবতার সঙ্গে মিলিত-ভাবে রাজার যোগ্য পূজা পাইবেন। ইহার পরে গুরু শি-দবা অন্তর্হিত হইলেন, লেইমারেন-শিদাবি দুই ভাইকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গুরু শি-দবা হইতেছেন পরমাত্মা পরমেশ্বর। তখন ভগবান্‌ শিবও পঞ্চানন-রূপে দেখা দিলেন; এবং সূর্য্যদেব জলন্ত অগ্নির রূপে অতি উজ্জ্বল মূর্তিতে প্রকট হইলেন।

পূর্বে বর্ণিত অনন্ত-নাগ ও দুই ভাই দেবতা পাখাঙ্‌বা ও শেনামাহির রাজত্বের পরে, গন্ধর্ব চিত্রভানু মণিপুরের রাজা হন। মণিপুরের আদি পুরাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের ও মহাভারতের সামঞ্জস্য করিয়া, অভিনব মণিপুর-পুরাণ গ্রথিত হয়। নারায়ণের নাভিকমল-জাত ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন মরীচি মুনি, তৎপুত্র কশ্যপ মুনি, কশ্যপের পুত্র সূর্য্যদেব, সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণ মুনি, তৎপুত্র চিত্রকেতু, তৎপুত্র চিত্রধ্বজ, তৎপুত্র চিত্রবীজ, তৎপুত্র চিত্রসর্ব, তৎপুত্র চিত্ররাজ, তৎপুত্র চিত্রভানু। চিত্রকেতু হইতে চিত্রভানু পর্য্যন্ত সকলেই গন্ধর্ব ছিলেন। অপুত্রক চিত্রভানুর একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদা

তৃতীয় পাণ্ডব মহাভারতের নায়ক অর্জুনের পত্নী হন ; চিত্রাঙ্গদার ও অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন, বভ্রুবাহনের পুত্র সুপ্রবাহু, তৎপুত্র যবিষ্ঠ।

অর্জুনের আগমন-সম্পর্কে মণিপুরের কতকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-কথার সহিত এখানে মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলন ঘটানো হইয়াছে। মণিপুরের ইতিকথায়, ব্রাহ্মণ্য ও মণিপুরী পুরাণ মিলাইয়া প্রাচীন রাজাদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিন্তু ঐতিহাসিক স্থিরতা নাই। একটি মত অনুসারে, বভ্রুবাহনের পৌত্র যবিষ্ঠ, অন্য মত অনুসারে বভ্রুবাহনের পরে তেরো জন রাজা, তৎপরে যবিষ্ঠ। এই তেরোজনের মধ্যে প্রথম দুইজনের মাত্র সংস্কৃত নাম, তাহার মধ্যে একটি অতি আধুনিক ছাঁদের "কলাপচন্দ্র", অন্যটি "শক্তি" ; বাকী ১১টি মণিপুরী ভাষার। যবিষ্ঠের মণিপুরী নাম হইতেছে "পাখাঙ্‌বা" ; উপরে বর্ণিত গুরু শি-দবার পুত্র দেবতা ও রাজা পাখাঙ্‌বার নাম অনুসারে ইঁহার এই মণিপুরী নাম হয়। সম্ভবতঃ মণিপুরী ঐতিহ্যের নামী রাজা পাখাঙ্‌বার সহিত, গন্ধর্বরাজকুমারী ও পাণ্ডব অর্জুনের উত্তর-পুরুষ রাজা যবিষ্ঠকে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাখাঙ্‌বার সম্বন্ধে কতকগুলি লোকপ্রিয় উপাখ্যান আছে। মণিপুরী তারিখ-গণনার মতে, পাখাঙ্‌বা হইতেছেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মানুষ—৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নাকি তিনি মারা যান। রাজা "ইঙেউ-পানবা" ইঁহার পিতা। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। জন্মকালে ইঁহার নাম দেওয়া হয় "মেইদিঙু", পরে নাম দেওয়া হয় "পাখাঙ্‌বা"। পাখাঙ্‌বার রাজত্ব নানা কারণে মণিপুরীদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সময়ে মণিপুরী গোত্র এবং গোত্র-জাত বিভিন্ন বংশ বা পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, সামাজিক নানা নিয়ম বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত করা হয় (যেগুলি মণিপুরীদের সমাজে এখনও কার্য্যকর হইয়া আছে)। পাতলা কাঁসার খণ্ডের এক প্রকার মুদ্রা ইঁহার সময়ে প্রচলিত হয় ; এই মুদ্রার নাম "শেল্"। "চেইথারোল্-কুম্বাবা" নামে বর্ষপঞ্জী লিখিবার রীতি ইঁহার-ই রাজত্ব-কালে প্রবর্তিত হয় বলিয়া কথিত। "মাকেঙ্"-গোত্রের জনৈক সরদারের কন্যা "লাই-স্রা"-র প্রেমে পড়িয়া তাঁহাকে ইনি বিবাহ করেন—পাখাঙবা ও লাইস্রাকে লইয়া মণিপুরের পুরাণে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে।

পাখাঙ্‌বার পর হইতে মণিপুরের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রথম কতকগুলি রাজার সুদীর্ঘ রাজত্বের কথা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই ইতিহাস পুনর্গঠিত হইবার কালে কতকগুলি নাম পাওয়া যায় নাই। এই রাজাদের রাজত্ব-কালে প্রধান-প্রধান ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকলেরই দুইটি করিয়া নাম মিলে—একটি সংস্কৃত, অন্যটি মণিপুরী। যেমন "কোইবা-তোম্বা" বা ক্ষেমচন্দ্র, "কোম্বোউবা" বা কবিচন্দ্র সিংহ, "অয়াংবা" বা অখণ্ড-প্রতাপ সিংহ। খ্রীষ্টীয় ১১২৭ থেকে ১১৫৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন "লোয়াম্বা" বা লবঙ্গ সিংহ; ইঁহার-ই রাজত্বকালে মণিপুরের বিখ্যাত প্রেমমূলক উপাখ্যানের নায়ক "খাম্বা" ও নায়িকা রাজকুমারী "থোইবি" জীবিত ছিলেন—ইঁহাদের উপাখ্যানকে মণিপুরীদের 'জাতীয় উপাখ্যান' বলা যাইতে পারে; এই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা—বীর যুবক খাম্বা-র নানা বীরকার্য্য দেখাইয়া, শত্রুর নানা ষড়যন্ত্র ও বিরোধকে ব্যর্থ করিয়া, রাজকুমারী থোইবিকে বিবাহ করা, ও শেষে খাম্বা-র নির্বুদ্ধিতায় উভয়ের মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত গাথা মণিপুরীরা এখনও গান করিয়া থাকে; এবং এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক মণিপুরী কবি নাটক লিখিয়াছেন, ও আধুনিক মণিপুরের প্রধানতম কবি স্বর্গীয় হিজম্ আঙাঙ্‌হাল্ সিংহ ৩৯,০০০ ছত্রের এক বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। খাম্বা-থোইবির উপাখ্যান মণিপুরীদের সম্বন্ধে প্রামাণিক ইংরেজী গ্রন্থ T. C. Hodson হড্‌সন্-রচিত The Meitheis (London, 1908)-তে পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয় তাঁহার "বিচিত্র মণিপুর" পুস্তকে (২য় সংস্করণ, ১৩৫৩) ইহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন।

পুরাণ ছাড়িয়া আমরা মণিপুরের ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া পঁহুছাই রাজা কিয়াম্বা বা ক্যাম্বার সময়ে (রাজত্বকাল, খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকে; ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন)। ইঁহার সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় প্রকারের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মণিপুর রাজবংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যায়। মণিপুরে ব্রাহ্মণের বাসও হইতে থাকে। "পাম্‌হেইবা" বা গরীব-নিরাজ অথবা গোপাল সিংহ অষ্টাদশ শতকে (১৭০৯-১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে) বিশেষ প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। ইনি রামানন্দী গোঁসাই সন্তদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, মণিপুরে রামচন্দ্রের উপাসনা প্রবর্তিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে

"মোরাম্বা" বা গৌরশ্যাম সিংহ মণিপুরের রাজা হন। ইঁহার নাম হইতে বুঝা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গৌরশ্যামের পরে, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ (বা "চিঙ্‌আঙ্‌-থাম্বা"), ১৭৫৯ হইতে ১৭৯৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার আমলে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম রাজার, রাজবংশের ও জনসাধারণের ধর্ম রূপে গৃহীত হয়। নবদ্বীপ হইতে গোস্বামী ও ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মণিপুরের বৈষ্ণব ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন।

মণিপুরের প্রাচীন দেবতা-বিষয়ক উপাখ্যানগুলি পূর্ণভাবে আলোচিত হয় নাই। আদিম মণিপুরী পুরাণ সমস্ত-ই প্রাচীন মণিপুরী ভাষায় লিখিত। "নুমিৎকাপ্পা" বলিয়া একটি প্রাচীন পুরাণ-কথা হড্‌সন্‌ সাহেব তাঁহার বইয়ে প্রাচীন মণিপুরীতে, আধুনিক মণিপুরী ও ইংরেজী অনুবাদের সহিত, প্রকাশিত করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত নলিনী ভদ্র ইহার বাঙ্গালা করিয়া দিয়াছেন। মণিপুরী ভাষা কবে প্রথম লিখিত হয়, তাহা জানা যায় না। প্রাচীন মণিপুরী বর্ণমালায় এই-সমস্ত পুরাণ-কথার পুথি পাওয়া যায়, সেগুলির আলোচনার সূত্রপাত-ও ভালো করিয়া হয় নাই। এই বর্ণমালা বাঙ্গালা ও নাগরীর আধারের উপরে গঠিত হইয়া, কয়েক শত বৎসর পূর্বে হিন্দুধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে মণিপুরী ভাষার জন্য গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে মণিপুরীরা বাঙ্গালা লিপি গ্রহণ করিয়াছে; এখন মণিপুরী ভাষা বাঙ্গালা লিপিতেই লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে—কিন্তু কয়েকজন মণিপুরী লেখক ও স্বজাতীয়-সংস্কৃতি-প্রিয় অন্য ব্যক্তি, পুরাণো বর্ণমালাকে আবার ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন। *

[বঙ্গাব্দ ১৩৫৪]

* এই প্রবন্ধ মুখ্যতঃ শ্রীযুক্ত মুতুম ঝুলন সিংহ-রচিত মণিপুরী ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

শিল্প-কলা

॥ শ্রীঃ ॥

॥ ওঁ নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ॥

তোমাকে নমস্কার; তুমি চিৎ বা জ্ঞান-শক্তি; সমস্ত
রূপ বা নেত্র-গ্রাহ্য সৌন্দর্যের আভ্যন্তর আত্মা তুমি ॥

পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের পরিচালকগণ আমাকে কলা-বিভাগের সভাপতি নির্বাচন করিয়া আমায় বিশেষ-ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার আলোচ্য বিদ্যা বা ব্যবসায় মুখ্যতঃ হইতেছে ভাষা-তত্ত্ব—এই বিদ্যা বা বিজ্ঞানের সহিত সুকুমার শিল্প বা কলার কোনও সংযোগ বাহ্যতঃ দৃষ্ট হয় না; ভাষা-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা, আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পর-বিরোধী বলিয়া-ই মনে হয়। শিল্প-কলার সহিত আমার পরিচয় গভীর নহে, এবং আমার পরিচয় বিশেষজ্ঞের পরিচয় নহে—শিল্প-কলা আমার মুখ্য উপজীব্য বা আলোচ্য বিষয় নহে। তবে আমি শিল্প-কলার একজন অনুরাগী—শিল্প-কলার চর্চাকে আমার জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দ-রূপে গণ্য করিয়া থাকি, এমন কি ইহাকে আমার একটি ব্যসন বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। ব্যবসায়ীর পরিবর্তে আপনারা ব্যসনীকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং ব্যসনী কেবল বিষয়ের প্রতি আন্তরিক প্রীতির বলেই এই গুরুভার গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছে। অনধীতশাস্ত্র অব্যবসায়ীর আলোচনায় শাস্ত্র ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে; যদি এক্ষেত্রে শাস্ত্রের ব্যত্যয় ঘটে, তাহা অশ্রদ্ধা-প্রসূত হইবে না—সুধীগণ তাহাকে অজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

* * *

ঘরবাসী-ই হই আর পরবাসী-ই হই, আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে ভালোবাসি। সাহিত্য, অর্থাৎ ভাষায় রচিত কাব্য নাটক উপন্যাস প্রবন্ধাদি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিবিধ প্রকাশের মধ্যে অন্যতম মাত্র। ‘সাহিত্য’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘সংযোগ’, ‘সঙ্গ’ বা ‘সংসর্গ’; ব্যাকরণ, অলংকার ও

ছন্দঃশাস্ত্রের 'সহিত' আলোচিত হয় বলিয়া-ই কেবল ভাষা-নিবদ্ধ রস-রচনার যে 'সাহিত্য' সংজ্ঞা আলংকারিকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাকে আমরা আধুনিক যুগে ধীরে-ধীরে আরও ব্যাপক করিয়া লইয়াছি। এখন জীবনের সহিত মিলিত হইয়া, জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাহা কিছু বিদ্যমান, সে-সমস্তের প্রকাশ যদি বাঙ্ময় রূপে দেখা দেয়, তাহা হইলে সেগুলিকেও 'সাহিত্য' নামে আমরা অভিহিত করিয়া থাকি ; গীতি-কবিতা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও অন্য গদ্য রচনা প্রভৃতি 'সুকুমার সাহিত্য'-ই কেবল সাহিত্য-পদবাচ্য নহে—বাঙ্ময় ইতিহাস, দর্শন, মানব-জীবনের বিশেষ কতকগুলি দিকের সহিত সম্বন্ধ রাখে এমন বিজ্ঞান (অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বাকৃতত্ত্ব প্রভৃতি), এগুলিকেও আমরা ব্যাপক-ভাবে সাহিত্যের পর্য্যায়েই ফেলিয়া থাকি। ভাষাশ্রিত সাহিত্য বা 'বাঙ্ময়' ভিন্ন, মানব-সংস্কৃতির আরও অন্য নানাপ্রকারের প্রকাশ আছে, যেমন—সংগীত ; নৃত্য ; বাদ্য ; নানাপ্রকারের অনুষ্ঠান ; এবং শিল্প-কলা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এগুলি বাঙ্ময়ের সহিত জড়িত (যথা, সংগীত) ; অথবা শ্রোত্রগ্রাহ্য বাঙ্ময়ের স্থলে, এগুলি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নেত্র-গ্রাহ্য এবং স্থিতিশীল রূপময় প্রকাশ (শিল্প-কলা—বাস্তুশিল্প, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা) ; কিংবা শ্রোত্র- ও নেত্র-গ্রাহ্য অথবা কেবল নেত্র-গ্রাহ্য গতিশীল ছন্দোময় বিকাশ (অভিনয়, নৃত্য)। কেবল বাঙ্ময়ের আলোচনায় সমগ্র সংস্কৃতির বোধ হয় না ; এই জন্য, বাঙ্ময়কে মুখ্য করিয়া ধরিলেও, কোনও জাতির সংস্কৃতিকে সব দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে, বাঙ্ময়ের সহিত আনুষঙ্গিক-ভাবে দর্শন ও বিজ্ঞান, সংগীত ও শিল্প, অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন বাঙ্গালীর সমগ্র সংস্কৃতির আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। সেই হেতু, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে আমরা অতি সহজ-ভাবে রসানুভূতি-গ্রাহ্য বঙ্গীয় বাঙ্ময়ের সঙ্গে-সঙ্গে, বঙ্গভাষার সাহায্যে দর্শন বিজ্ঞান আদি বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়েরও প্রসঙ্গ করিয়া থাকি, শিল্প-কলা ও সংগীতের আলোচনাকেও বর্জন করি না।

* * *

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'শিল্প-কলা'। বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তু-জগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ—এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের অনুকৃতি এবং রূপের মাধ্যমে

অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্প-সৃষ্টি। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা আধিমানসিক জগৎ—ইহাদের বিরোধ কল্পনা করিলে, রূপ-শিল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কেবল অনুকৃতিতে শিল্প হইতে পারে না; এবং ভৌতিক জগতের আধারে বিদ্যমান চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রতীককে আশ্রয় না করিলে, আধ্যাত্মিক বস্তুর শিল্পময় প্রকাশও অসম্ভব। অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তি—প্রতিস্পর্ধন ও প্রকাশ—এই দুইটি-ই শিল্পের মৌলিক বা মুখ্য প্রেরণা। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জাতি ও সভ্যতার পারিপার্শ্বিক অনুসারে শিল্প-রচনা বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে বিভিন্ন কালে নানা বিশিষ্টতা বা স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়। কিন্তু এই বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও, মূল প্রেরণাদ্বয় এক অখণ্ড মানব-জাতির মধ্যে সর্বত্র-ই মিলে বলিয়া, এবং অনুকৃতি ও অভিব্যক্তি বিষয়ে সমগ্র মানব-জাতি এক-ই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া, মানবের মনের শিল্পময় প্রকাশও অখণ্ড এবং এক। তদনুসারে, সার্থক শিল্প দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ নহে—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, সকল দেশের রসিক-জনের আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। মানব-সমাজের কৃত্রিম জাতি-বিভাগের ঊর্ধ্বে যেমন সাধারণ একটি মানবিকতা বিদ্যমান, তেমনি বিভিন্ন জাতিতে ও কালে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন নানা প্রকারের শিল্পের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে, শ্রেষ্ঠ শিল্প-রচনার মধ্যে একটি সার্বজনীনতা বিদ্যমান আছে, তাহার অস্তিত্ব এবং প্রভাব এত অধিক যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্পগুলিকে পরস্পর-বিরোধী পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। মানসিক অন্য নানা ব্যাপারের মতো, শিল্পকে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্ত্য', Greek and Gothic, Western and Oriental', Ancient and Modern. প্রভৃতি বিভিন্ন বিরোধী শ্রেণীতে রাখা কঠিন। শিল্পের প্রকাশ-ভঙ্গী নানা প্রকারের, কিন্তু ইহার মুখ্য প্রাণ-বস্তু এক এবং দেশ-কালাতিগ—কোনও জাতির শিল্প আলোচনার কালে, বিশেষ করিয়া একাধিক জাতির শিল্পের তুলনা-মূলক আলোচনার কালে, আমাদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে।

* * *

শিল্প অনুকৃতিময় হইবে কিংবা ছন্দোময় হইবে, অথবা প্রতীকময় হইবে কিংবা ভাবময় হইবে, অথবা এই একাধিক প্রকাশ-ভঙ্গীর মিশ্রণ-জাত হইবে—ইহা নির্ভর করে, শিল্পের আবশ্যকতা, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের উপর।

অনুকৃতি ও প্রকাশ, এই মৌলিক প্রেরণাদ্বয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তৃতীয় প্রেরণা-রূপে আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনকে উল্লেখ করিতে হয়। সকল যুগে বা সকল জাতির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজন এক-ই প্রকারের থাকে না। আদিম প্রত্ন-প্রস্তর যুগে মানুষ যখন হাড় বা শিঙের উপরে পাথরের ছুরি চালাইয়া হরিণ, মাছ বা বুনো ঘোড়ার ছবি খুদিত, রঙ দিয়া পাহাড়ের গায়ে ঘোড়া, গোরু, মহিষ বা শূকরের ছবি আঁকিত, তখন তাহার যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য আজকালকার পরের মুখ চাহিয়া যাহাকে থাকিতে হয় না এমন প্রচুর-বৈভবশালী স্বাধীন শিল্পস্রষ্টার নহে; এবং যাহাকে ফরমাইশ-মতো বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ইহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক্। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিল্পী মূর্তি খুদিত বা ছবি আঁকিত, এই মূর্তি বা ছবির magic বা মায়াজাল বিস্তার করিয়া বন্য পশুকে সহজে মৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে; ছবির জাদুতে বা সম্মোহনী শক্তিতে পশু-মৃগয়াকে সহজ করিয়া আহার্য্য সুলভ করা-ই ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পীর মুখ্য প্রেরণা—ইহা-ই নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। কিন্তু মৃগয়ার জন্য মায়াজাল বুনিবার উদ্দেশ্য একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিতে পারে নাই—অলংকরণ এবং সৌন্দর্য্য-বোধের প্রেরণাও যে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীর মনে ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত আছে। উত্তর-কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মানুষের হাতের কাজ শিল্প-বস্তুতে, সম্মোহনী ও সৌন্দর্য্য-বোধ, উভয় প্রকারের তাগিদ, পৃথক্ বা মিলিত-ভাবে শিল্প-রচনায় কাজ করিয়া আসিয়াছে। আদিম যুগে যে জাদু বা সম্মোহনীর প্রয়োজন শিল্প-প্রাণের বা শিল্প-রচনার আবাহন করিয়াছিল, পরবর্তী কালে মানবের আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই জাদু বা সম্মোহনী, দেবপ্রতীকের এবং ধর্মানুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় শিল্প-চেষ্টায় উন্নীত হইল। আদিম মানবের জাদুবিদ্যার প্রয়োগে যে বাদ্য, যে মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত, তাহার আধারের উপরে সংগীত—বিশেষ করিয়া ধর্ম-সংগীত এবং স্তোত্রাদি আধ্যাত্মিক সাহিত্য—গঠিত হইল। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষের হৃদয় ও মন—মানুষের ভাব-জগৎ—অপার্থিব অনুভূতির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সংগীত, পাঠ ও অনুষ্ঠানের ন্যায়, শিল্প-ও হইল ধর্মের সেবায় আত্ম-নিয়োজিত।

সৌন্দর্য্য-বোধ দ্বারা উদ্বোধিত অপার্থিব সত্তার অনুভূতি অথবা অনুভূতির আভাস—সুসভ্য জন-সমাজে এখন ইহা-ই হইতেছে শিল্পের চরম উদ্দেশ্য। শিল্পের এই উদ্দেশ্য প্রাচীন মিসরে, বাবিলনে, এবং বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীসে, ভারতবর্ষে ও বৃহত্তর ভারতে—বৌদ্ধ চীন ও জাপানে, এবং মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতে দেখা যায়। যে-সকল জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং লক্ষণীয় শিল্প রচনা করা যাহাদের দ্বারা সম্ভবপর হইযাছিল, তাহাদের মধ্যে শিল্পের আদর হইয়াছে ধর্মের বা আধ্যাত্মিক সাধনার পথ হিসাবে। তাহারা মানব-জাতির গৌরব-স্বরূপ বিভিন্ন শিল্প-শৈলী বিশ্বমানবকে উপহার দিযা গিয়াছে। যে-জাতি বাস্তব সভ্যতায় পিছনে পড়িযা আছে, তাহার মধ্যেও শিল্পের আকষণ দেখা যায়—ধর্মানুভূতি তাহাদের মধ্যেও শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে ; যেমন আফ্রিকার নিগ্রো-জাতীয় লোকেরা। কিন্তু সভ্যতার পথে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর য়িহুদী ও আরবদের মধ্যে ধর্ম-সাধনায রূপ-শিল্পের স্থান সংকুচিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই হওয়া সম্ভব যে, য়িহুদীদের ও আরবদের আদি পুরুষ উত্তর-আরবের মরুবাসী শেমীয জাতির মধ্যে আদিম যুগেই তাহার ধর্ম-বোধে প্রতীকের ভীতি আসিয়া যায। শেমীয জাতির মধ্যে প্রাচীনতম কালে সভ্যতার উন্নতি তেমন হয় নাই, তাই শিল্প-কলা তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই ; শিল্প-সম্বন্ধে অক্ষমতা, এই জাতির মনে প্রতীক বা মূর্তির সম্মোহনী শক্তি বিষযে একটা ভযও আনিযা দিযাছিল ; এবং আদিম মনোভাবের পরিচায়ক এই ভয, পরে কল্পনান্তর-অসহিষ্ণু দেবকল্পনা-বিশেষের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে, আরও সুদৃঢ় হইযা, মূর্তি-প্রতীকের বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। অহৈতুক ভয হইতেই অহৈতুক বিদ্বেষের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, এবং কচিৎ নাসিকা—এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের সহযোগে আমরা চিত্তকে উর্ধ্বমুখী করিয়া লইতে পারি। এইজন্যই ধর্মানুষ্ঠানে মূর্তি বা চিত্রের এবং সংগীত বা পাঠের স্থান অল্প-বিস্তর সকল ধর্মেই স্বীকার করিয়া লইযাছে, মন্দিরে ও দেবায়তনে ধূপ-ধুনা, সুগন্ধি কুসুম প্রভৃতির ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ধর্ম-সাধনায যাঁহারা মূর্তি বা রূপ-শিল্প বর্জন করিতে চাহেন, অথচ সংগীত বা পাঠ বজায় রাখেন, ধূপ-ধুনার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রোত্র ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে প্রশ্রয় দিয়া নিতান্ত অযৌক্তিকতার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়কে পরিহার করেন।

শিল্প-সম্বন্ধে সুসভ্য হিন্দু, গ্রীক ও চীনা জাতির (এবং এই তিন জাতির শিষ্য-স্থানীয় আরও কতকগুলি জাতির) মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক্—এই তিন প্রাচীন জাতি রূপ-শিল্পকে মানবের এক প্রধান কৃতিত্ব বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। গ্রীক-জাতির শিল্প-প্রাণতার কথা আমরা সকলেই জানি; বিশ্বমানবকে গ্রীক-জাতির প্রতিভা অপরূপ শিল্পের মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। চীনা ও জাপানী জাতিদ্বয়ের শিল্প-চেতনাও পৃথিবীতে অপূর্ব, এবং আধুনিক জগতে একক। ভারতবর্ষে শিল্প সেদিন পর্য্যন্ত জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া-ই ছিল—দৈনন্দিন জীবন হইতে শিল্পকে পৃথক্ করিয়া দেখা হইত না। তাই, ভারতীয় জনগণের শিল্প-বোধ স্বত-উৎসারিত হইয়া-ই বিদ্যমান থাকিত, তাহার পৃথক্ বিশ্লেষের জন্য পণ্ডিতগণ চেষ্টিত হন নাই। সাহিত্য-বিচারে, দর্শনে ও অন্য কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের চিন্তানেতৃগণ যেমন শক্তি দেখাইয়াছেন, রূপ-শিল্পের চর্চায় তেমন শক্তি দেখান নাই। গুপ্ত-যুগে ভারতীয় শাস্ত্রের ও শিল্পের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ভরত, দণ্ডী, মম্মট প্রভৃতির মতো রূপ-শিল্পের সমালোচক পণ্ডিত দেখা দিলেন না। এইখানে ভারতীয় সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশের একটা দিক্ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

* * *

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্য-বোধ ও শিল্প-চেতনা সম্বন্ধে ভারতীয় বাঙ্ময় একেবারে নীরব নহে। সৌন্দর্য্য-বোধ ভারতের আর্য্যজাতির মধ্যে যথেষ্ট ছিল—এবং সুসভ্য অনার্য্য জাতিগুলির মধ্যেই যে ভারতের রূপ-শিল্প জন্ম গ্রহণ করে, ও প্রথম বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করে, আজকাল একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। জগতে কোনও কিছুকে ভালো বা লক্ষণীয়, প্রধান বা তুলনায় উৎকর্ষযুক্ত হইতে হইলে, তাহার প্রধান উপলব্ধি-যোগ্য গুণ থাকিবে, তাহার সৌন্দর্য্য; ভারতের আর্য্যজাতির সুপ্ত চেতনায় সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষের পরস্পরের সংযোগ সম্বন্ধে এই প্রকার বোধ বা বিচার ছিল। সেই জন্য 'শ্রী'-শব্দ হইতে সাধিত, 'শ্রী'-র তারতম্য- বা অতিশায়ন-বাচক দুইটি শব্দ 'শ্রেয়স্, (শ্রেয়ান্, শ্রেয়সী, শ্রেয়ঃ)' এবং 'শ্রেষ্ঠ', সংস্কৃত ভাষায় সর্ববিধ উৎকর্ষের, এমন কি চরম বা পরম উৎকর্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। 'শ্রী' শব্দের প্রধান ও প্রাচীনতম অর্থ, নেত্রের সাহায্যে দর্শনীয় দ্যুতিমান্ সৌন্দর্য্য;

যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে এই 'শ্রী' বা 'সৌন্দর্য্য' আছে, তাহা-ই 'শ্রেয়স্', তাহা-ই 'শ্রেষ্ঠ'—সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ দুই যেন মিশিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু, কোনও পদার্থ 'সুন্দর' হইলেই মঙ্গলময় হইবে—এই বোধেই সৌন্দর্য্য-বাচক 'কল্যাণ (কল্য)'-শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'সুন্দর' (যে অর্থ 'কল্য'-শব্দের গ্রীক প্রতিরূপ kalos, kallos-এ পাই), 'মঙ্গল, ক্ষেমংকর' এই অর্থে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যের মনোভাব যেন গ্রীক আর্য্যের মতোই ছিল—গ্রীকদিগের kaloskagathos আদর্শের অনুরূপ—'যাহা সুন্দর, তাহা-ই ভালো'। আবার, যাহা ভালো করিয়া বুঝা যায়, চিৎশক্তির দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা-ই 'চিত্র (চিৎ-র') অর্থাৎ 'সুন্দর'। এইরূপ কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করিয়া জরমান পণ্ডিত Oldenberg ওল্‌ডেনব্যার্গ ভারতের আর্য্যজাতির চিত্তে অন্তঃসলিলা ফল্গু-নদীর মতো একটি সৌন্দর্য্য-বোধের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সহজ সৌন্দর্য্য-বোধের স্রোতস্বতী আর্য্য ও অনার্য্য নির্বিশেষে ভারতের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনো অবলুপ্ত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান তাহার মূর্তি- বা রূপ-বিরোধী ভাব-সম্পুট ভারতে লইয়া আসিলেও, রূপ-রসিক পারস্যের প্রভাবে ইতিপূর্বেই এই ধর্মের রূপ-বিরোধিতা অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তুর্কী, ঈরানী ও অন্য বিদেশীয় মুসলমানের আগমনে এদেশে রূপ-শিল্পের ধ্বংস ঘটে নাই ;—বরঞ্চ, পারস্যের মুসলমান সভ্যতার সহিত ভারতের হিন্দু মনোভাবের আশ্চর্য্য সাহচর্য্য ঘটায়, ভারতে মোগল চিত্রকলার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।

*　　*　　*

শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যুগের ঋষিদের চিন্তা বা ধারণা যে কত উচ্চ ছিল, তাহা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের এই বচনটি হইতে অনুধাবন করা যাইবে—

॥ আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে ॥ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ পঞ্চিকা, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম মন্ত্র)।

নিশ্চয়-ই, শিল্প-সমূহ আত্ম-সংস্কৃতির কারণ। যজমান বা শিল্পানুষ্ঠাতা নানা প্রকার শিল্পের দ্বারা নিজ আত্মাকে পরিপূর্ণ-রূপে ছন্দোময় করিয়া থাকেন॥

মানুষকে উন্নত ও উন্নীত করিতে যে শিল্পেরও সামর্থ্য আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ স্বীকার করিয়াছেন। উপরে প্রদত্ত মন্ত্রাংশের পূর্বে ঋষি বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন—'হস্তী. কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্'—হাতীর দাঁতের কাজ (মূর্তি, ফলক প্রভৃতি), কাংস্য বা তামা, কাঁসা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্য, বিচিত্র বসন, স্বর্ণালংকার ও নানাপ্রকার স্বর্ণ-শিল্প, অশ্বতরী-যুক্ত রথ—এই প্রকারের শিল্প। এই সব শিল্প-রচনায় বা দর্শনে মানুষের মনকে সংস্কৃতিযুক্ত করে, উদার করে, বিশ্বাত্মার সহিত মিলিত-ভাবে ছন্দোময় করে।

জগতে নিসর্গ-জাত বস্তুর পরেই, মানুষের হাতের শিল্প-রচনাকে ভগবানের সত্তার এবং তাহাতে নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্য্যের অংশ-স্বরূপ বলা যায়। গীতায় বলা হইয়াছে—

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ (১০।৪১)

তুমি ইহা জানিও যে, বিভূতি- বা ঐশ্বর্য্য-যুক্ত, শ্রী- বা শোভা-যুক্ত এবং শক্তিমান্ বা প্রভাব-শালী যে-যে পদার্থ আছে, সে-সমস্ত-ই আমার-ই তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন॥

—এ কথা শিল্প-সম্বন্ধেও বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

* * *

ব্যক্তি-গত ও সমাজ-গত জীবনে শিল্পের প্রভাব লইয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে, অনেক কথা বলা যায়। আমি নিজ ব্যক্তি-গত কথা দুই-একটি বলিতে চাহি। সৎ বা উচ্চ কোটির শিল্প আমার কাছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস আনয়ন করে। যাঁহারা সহজ ভক্তি অথবা দার্শনিক বিচারের দ্বারা পরমার্থ বা শাশ্বত সত্তাকে জীবনে উপলব্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন—'বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্'—তাঁহাদের চরণে আমাদের প্রণাম। কিন্তু আমাদের মতো অনেকে আছে, যাহাদের উপলব্ধি বা অনুভূতি হয় নাই এবং যাহারা বিচার এবং তত্ত্বালোচনার পথ উন্মুক্ত রাখিয়া অনুভূতির আবাহন করিতেছে, যাহাদের কাছে তত্ত্ব গুহানিহিত হইয়া-ই আছে, উপলব্ধি বা অনুভূতি তাহাদের কাছে জ্ঞান বা বিচারের সিংহদ্বার দিয়া আসিতে চাহে না, emotion বা ভাবাবেগ অথবা রসাবেশের খিড়কি-দ্বার দিয়া-ই তাহাদের চিত্তে অনুভূতির ছায়া বা আভাস কখনও চকিতের ন্যায়

উঁকি দিয়া চলিয়া যায়। এই emotion বা ভাবাবেগকে দৌর্বল্যের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃতি-জাত এবং দেহেন্দ্রিয়াশ্রয়ী emotion বা ভাবরাজিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায়, প্রায়-ই দেখা যায় যে, প্রতিক্রিয়ার ফলে আধ্যাত্মিক বা মানসিক কুফল ঘটিয়া থাকে। বরং ইহা-ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কী করিয়া চিত্তের ভাবরাজিকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনে শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের পথে, শাশ্বত বস্তুর উপলব্ধির পথে চালিত করিতে পারি। এই ভাবরাজিকে শোধন করিয়া লইতে একমাত্র সুকুমার কলাই সমর্থ হইয়া থাকে।

নয়ন ও শ্রবণের পথ দিয়া সংগীত ও সুন্দর দর্শনীয় বস্তুর সহায়তায় যে চিত্তের ভাবসম্পুট উন্মুক্ত হয়, কবি কালিদাস শকুন্তলা-নাটকে তৎসম্বন্ধে অতি সুন্দর-ভাবে বলিয়াছেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥ (৫ম অঙ্ক)

রম্য বস্তু দর্শনে, কিংবা মধুর শব্দ শ্রবণে, সুখিত ব্যক্তিরও চিত্তে যে উৎকণ্ঠা জন্মে, তাহা বুদ্ধিপূর্বক না হইলেও নিশ্চয়-ই জন্মান্তর ণ স্থির সৌহার্দ্যের ফল॥

একটু অন্যভাবে এই কথাটা বলা যায় যে, শিল্প-কলা ও প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতি দর্শনের দ্বারা, এবং সংগীতাদি মধুর ধ্বনি শ্রবণের বা, মনে যে সুখময় ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষা জন্মে. তাহা আমাদের অজ্ঞাতে লোকাতিগ অবস্থার আভাস আমাদের অনুভূতিতে জাগরিত করিয়া দেয়।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

অথবা—

ধুনি সুনি মোহি রহ্যৌ ন জায।
ঘায়ল-সী ঘুমত রহৌঁ। ঘর মেঁ রঁ মোহি কছু ন সুহায॥

ধ্বনি শুনিয়া আমার আর রহা যায় না
আহতের মতন আমি ঘুরিয়া বেড়াই—ওগো, ঘরে আমার কিছু-ই ভালো লাগে না।

শাশ্বত বস্তুর সঙ্গে মিলনের জন্য এই যে আকুতি, এই যে দিব্যোন্মাদের অবস্থা—ইহার আধার বা উৎপত্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রম্য বস্তু বা মধুর ধ্বনি।

সংগীতকে তাবৎ সুকুমার কলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশীশক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল বর্ণনা করিয়াছেন। সংগীত বা বাদ্য শ্রবণে মানুষের চিত্ত বাস্তব হইতে ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বা উদাহরণ আছে, এ বিষয়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। ধ্রুপদ চৌতাল সংগীত শ্রবণে অনেকের ভাবাবেশ হয়, দেবারাধনার এবং দেব-সান্নিধ্যের অনুভূতি আইসে; বৈষ্ণব কীর্তনে বা সুফী গজলে ভক্ত বা মজজুব জনের 'হাল' বা 'দশা'-প্রাপ্তি ঘটে। স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুরে সংস্কৃত বা লাতীন বা আরবী মন্ত্র উচ্চারণে, অথবা ইংরেজী বা অন্য আধুনিক ভাষায় পাঠে, অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য মনের উন্নয়ন ঘটিতে দেখা যায়।

* * *

সংগীতে যাহা হয়, শিল্প-কলা বা রূপ-কলার দ্বারাও তাহা-ই হয়। শ্রেষ্ঠ গ্রীক বা ভারতীয়, চীনা বা জাপানী ভাস্করের কৃতিত্ব কোনও দেব-মূর্তি; চীনা বা জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যপট; বিজান্তীয় মোসাইক কাজ; পারস্য-দেশীয় গালিচার অপূর্ব চিত্র এবং বর্ণসমাবেশ; মধ্যযুগের হিন্দু অথবা খ্রীষ্টানী চিত্র-কলা; এবং পার্থেনন, তাজ-মহল, শার্ত্র্-এর গির্জা, সান্-মার্কোর গির্জা—প্রভৃতি বাস্তু-শিল্পের বিরাট্ কীর্তি;—এ-সমস্ত দর্শনে ও অনুধ্যানে অনেক সময়ে প্রার্থনার দ্বারা ভাবরাজির উদ্বোধনের মতো মনকে আবিষ্ট করে। তখন শিল্প-জগৎকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায়—

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি'।

* * *

শিল্পের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা লইয়া কিছু বলিলাম—এই জন্য যে আমাদের দেশে পণ্ডিতগণের মনে শিল্পের উপযোগিতা-সম্বন্ধে অবিশ্বাস বা সন্দেহ আছে। শিল্প একটা বাহুল্য, এবং জীবনে একটা অনাবশ্যক অথবা অপ্রধান বস্তু—সাধারণতঃ আমরা এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকি। শিল্প-চর্চা কেবল অবসরের চিত্ত-বিনোদনের জন্য, ইহাতে গভীর বস্তু কিছু-ই নাই, সংগীতের মতো কেবল মেয়েদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে—এই প্রকার প্রাকৃত-জনোচিত মনোভাবও প্রবল। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, শিল্পের প্রকৃষ্টভাবে আলোচনা মানব-চিত্তের সাধারণ-ভাবে উৎকর্ষ-বর্ধনের এক প্রধান পথ। শিল্পের মধ্যে জাতির উৎকর্ষের, জাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং

জাগতিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ ভাবধারা কী ভাবে একটি বিশিষ্ট জাতির শিল্পকে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করিল, ইহাকে পুষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিল; যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির জাতীয় শিল্পে লক্ষণীয় ভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্য কী; কী ভাবে শিল্প হইতে জাতির সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করিল, কিংবা জাতির চরিত্র ভ্রষ্ট বা বিক্ষিপ্ত হইল; জাতির মৌলিক প্রকৃতি তাহার শিল্পের মধ্যে কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং এই মৌলিক প্রকৃতি কী উপায়ে বিদেশীয় অথবা ভিন্ন জাতির প্রকৃতি-জাত শিল্প-রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত—প্রবর্ধিত বা ব্যাহত—হইল; বিভিন্ন যুগের সামাজিক, ধর্মীয় এবং বাস্তব সভ্যতা কী ভাবে শিল্পে প্রকটিত হয়;—এই-সমস্ত বিষয় লইয়া বিচার, জাতির রাষ্ট্রনৈতিক বা দার্শনিক, সমাজনৈতিক বা অন্যবিধ ইতিহাস আলোচনা অপেক্ষা কম উপযোগী এবং চিত্তের পরিপোষক বিদ্যা নহে। বিদ্যালয়ে আমরা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করি, কিন্তু জাতির আত্মার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের ক্ষেত্র-স্বরূপ তাহার শিল্প-কলার আলোচনা-সম্বন্ধে আমাদের কোনও উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা নাই। অথচ, জাতির মধ্যে উদ্ভূত দ্রব্য অবলম্বনে আমরা সহজেই সুন্দর-ভাবে তাহাব ইতিহাসের ও চিন্তার, সভ্যতার ও নৈপুণ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে পারি। নানা যুগের শিল্প-দ্রব্য দর্শনে এই পরিচয় ঘটিতে পারে, সুতরাং ইহা মনের উপরে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায়, ভাসা-ভাসা থাকিতে পারে না।

আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্পেতিহাস এবং শিল্পাস্বাদন উভয়-ই অল্প-বিস্তর পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মানসিক সংস্কৃতির পথে এই বিষয় দুইটি অপরিহার্য্য। বিদেশে নানা স্বাধীন জাতির মধ্যে শিক্ষা-জগতের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের চিত্ত এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—Art Education-কে সকলেই সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিতেছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও তেমন উৎসাহ নাই। দেশের বা বাহিরের শিল্প-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, এরূপ 'শিক্ষিত' ব্যক্তি এ দেশে প্রচুর। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দুই-চারিজন শিল্প-রসিক পণ্ডিত ভারতীয় শিক্ষা-নেতাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াস অরণ্যে রোদন মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয়, প্রথমটায় কেবল ইতিহাস বা মানব-সভ্যতার

অঙ্গ-স্বরূপ শিল্পেতিহাসের চর্চা আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে প্রবর্তিত হইতে পারে। তৎপরে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি পড়িতে পারে, এবং সাধারণ উচ্চ শিক্ষার মধ্য দিয়া, কাব্যাস্বাদনের সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পাস্বাদন করাইবারও চেষ্টা হইতে পারে।

* * *

আমাদের দেশের শিল্পের ধারাটি, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্যিক ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে, সংক্ষিপ্ত আকারে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত আবশ্যিক পাঠ্য-বিষয় করিতে পারা যায়। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাট্রিকুলেশনের নূতন-গৃহীত পাঠ্য-বিষয়-সমূহের মধ্যে, 'শিল্প-রীতি পর্য্যালোচন, এবং চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা' এই দুইটি বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবল মেয়েদের জন্য হইয়াছে, পুরুষ পরীক্ষার্থীরা এই দুইটি বিষয় গ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশেষে এইভাবে শিল্প-শিক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে—ইহা-ই যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—যথাকালে শিল্পেতিহাসও দেশের ইতিহাসের অংশ-স্বরূপ বিবেচিত হইয়া যেন সকল ছাত্রের আলোচ্য বিষয়-রূপে গৃহীত হয়।

* * *

ভারতের শিল্পের ঐতিহাসিক যুগের ধারাটি—অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতের শিল্প-কাহিনী—মোটা-মুটি আমরা ধরিতে পারিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আলেক্সান্দর কানিঙ্হাম, জেম্‌স্ ফর্গুসন, ঈ. বী. হাভেল্, আনন্দ কুমারস্বামী, গ্র্যুন্‌ভেড্‌ল্, ফুশে, গোলুবিএভ্, বাখ্‌হোফর্, জন্ মার্শাল, গ্রিফিথ্‌স্, স্পুনর, পার্সি ব্রাউন্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উইলিয়াম্ কোন্ ডিএট্‌স্, গ্যোট্‌স্, গোপীনাথ রাও, স্তেল্লা ক্রামরিশ, ফোগেল্, ড্যোরিঙ্, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, আলীস্ গেটি, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নানালাল চমনলাল মেহ্‌তা, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, ঝ.ভো-দ্যুব্রোয়াই, কৃষ্ণশাস্ত্রী, রয়টার, র‍্যনে গ্রুসে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সত্তার খয়্‌রী, নরম্যান ব্রাউন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায়, ভারতের প্রাচীন- ও মধ্য-যুগের শিল্পের ইতিহাসের গতি আমাদের সমক্ষে

উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু সব কথা জানা যায় নাই। ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তির কথা, এবং ইহার প্রাথমিক অর্থাৎ মৌর্য্য-পূর্ব যুগের ইতিহাস—সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনও স্পষ্ট ধারণা এখনও হয় নাই। অতীতের অন্ধতমিস্রামমর প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্-কোন্ জাতির রক্ত মিশিয়া প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল ;—অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল, সম্ভবতঃ ফিন্নো-উগ্রীয় বা উরালীয়, এবং আর্য্য জাতি,—ভারতের হিন্দু সভ্যতার গঠনে কে কোন্ উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এ-সমস্ত তথ্য এখন অজ্ঞাত, অবলুপ্ত। আদিত্তনল্লুর ও মোহেন্-জো-দড়োর যুগ হইতে মৌর্য্য-যুগ পর্য্যন্ত তিন-চারি হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাস এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এই কার্য্যে ভারত এবং ইউরোপের নৃতত্ত্ববিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ, প্রত্নবিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ এবং ঐতিহাসিক-গণের সমবেত চেষ্টা অপেক্ষিত। কত দিনে ভারতের প্রাচীন শিল্পের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ দিগ্‌দর্শন ঘটিবে, তাহা আমরা জানি না। বস্তুর অভাবে এখানে বিচারের বিশেষ অবকাশ নাই।

* * *

ভারতের অংশীভূত আমাদের বঙ্গদেশের শিল্পের কথাও আমরা তেমন জানি না। বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া তাহার ভাষার ইতিহাস লইয়া কাজ করিতেছে—সুফলও তাহাতে যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় বাঙ্ময়ের অতিরিক্ত, বঙ্গদেশের বাস্তব-সংস্কৃতির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি না। বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে, আমরা বাঙ্গালী জাতির কল্পনা করিতে পারি না। আমার মনে হয়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি যখন বঙ্গ ও মগধে পাল-রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটিল, তখন বাঙ্গালা ভাষাও মাগধী-অপভ্রংশ হইতে আর একটু পরিবর্তিত হইয়া, আদিম-বঙ্গভাষার রূপ ধারণ করিল; তখন হইতেই বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষী জাতির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। এই নব-সৃষ্ট বা সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি প্রথম হইতেই মানসিক ও বাস্তব উভয় প্রকার সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয়। বঙ্গদেশের তুর্কী-পূর্ব যুগের সংস্কৃত-চর্চা ভারতের সংস্কৃত-বিদ্যার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে—বঙ্গদেশের

পণ্ডিতদের "গৌডী-রীতি"-র রচনাকে সারা ভারতবর্ষও সম্মান করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতেই বৌদ্ধ আচার্য্যগণ ভোট-দেশ বা তিব্বত, সুবর্ণভূমি বা বর্মা, এবং দ্বীপময় ভারতে গিয়া বৌদ্ধধর্মকে সংস্কৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও শৈব সাধকেরা সারা উত্তর-ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তীর্ণ করেন। শিল্প-জগতেও নিখিল-ভারতের জাতীয় শিল্প—ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলা—এই দুইটিকেই নূতন ভাবধারায় অভিষিক্ত করিয়া, বঙ্গীয় শিল্পিগণ একটি নূতন শিল্প-ধারার প্রবর্তন করেন,—ষোড়শ শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথ সে-কথা আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন, এবং রীতি-প্রবর্তক দুইজন প্রধান শিল্পীর নামও আমাদের বলিয়া গিয়াছেন—বীতপাল ও ধীমান্। পাল-যুগের গৌড়-মগধ শিল্প ভারতীয় ভাস্কর্য্যে এক নবীন বস্তু আনয়ন করিল, ভারতের শিল্প-জগতে ইহা পূর্ব-ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, বিশিষ্ট দান। পাল ও সেন যুগের বিষ্ণু, হরগৌরী, দুর্গা, সূর্য্য, বুদ্ধ, বোধি-সত্ত্ব, তারা, মারীচি প্রভৃতি মূর্তির মতো ধ্যান-স্থির দেবতা-মূর্তির এমন অপরূপ ভাব-শুদ্ধ বিলাস মধ্য-যুগের ভারতের শিল্পে আর কোথায় পাওয়া যায়? এই গৌড-মগধ শিল্পের প্রভাব বাঙ্গালা ও বিহারের বাহিরে, দেশ-দেশান্তরে প্রসৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ধ্যানময় দেব-মূর্তি, নেপালে, এবং ভারতের বাহিরে ভোট-দেশে, ব্রহ্মে, চীনদেশে, যবদ্বীপে, সমস্ত বৌদ্ধ- ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী দেশে, ভক্ত ও সাধকগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতের শিল্পের এই অভিনব ধারা গৌড-মগধ শিল্প, বৃহত্তর ভারতের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

* * *

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির প্রথম যুগের এই বিশিষ্ট এবং মনোহর প্রকাশ লইয়া বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কলা-রসিক সার্থক গবেষণা করিযাছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, বাঙ্গালার এই প্রাচীন মূর্তি-শিল্পের প্রেরণা এবং রচনা-ভঙ্গীর মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্য্য, আভ্যন্তর তত্ত্ব এবং বাহ্য স্বরূপ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে ইংরেজ জে. সী. ফ্রেঞ্চ, অষ্ট্রিয়া-দেশীয়া স্তেল্লা ক্রামরিশ, ফরাসী র‍্যনে গ্রুসে এবং

ওলন্দাজ শিল্পবিদ্ বের্নট্-কেম্পর্স-এর অনুশীলন ও গবেষণাও এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য।

কিন্তু প্রথম যুগের শিল্প-কলার আলোচনা এই-সকল রসজ্ঞ শিল্প-তত্ত্ববিদ্-গণের চেষ্টায় সুস্থাপিত হইলেও, পরবর্তী কালের বাঙ্গালীর শিল্পময় প্রকাশ সম্বন্ধে এখনও আমরা অবহিত হইতে পারি নাই। তুর্কীদের আগমনের পূর্বের যুগের বঙ্গদেশীয়—গৌড-মগধ-জাত—শিল্প-রীতির মধ্যে, বাঙ্গালার বাস্তু-শিল্প প্রাচীন মন্দিরাদির তেমন আলোচনা হয় নাই। মুসলমান-পূর্ব যুগের পাথরের বা ইটের তৈয়ারী যে অল্প কয়টি মন্দির বাঙ্গালার বাস্তু-শিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ বিদ্যমান আছে, সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া, প্রথম যুগের বাঙ্গালার গৃহ-শিল্পের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এখনও হয় নাই। মুসলমান বাদশাহদের আমলে পাথরে দেউল-তোলার পাট বাঙ্গালাদেশের হিন্দুদের মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গেল—পাথরের স্থাপত্যের সঙ্গে-সঙ্গে পাথরের ভাস্কর্য্যও প্রায় শেষ হইয়া গেল। মন্দির ও ইমারতের ইট কাটিয়া, নূতন ধরণের পোড়া-মাটির ভাস্কর্য্য আরম্ভ হইল—হিন্দু মন্দিরের দেব-দেবী নর-নারী পশু-পক্ষী লতা-পাতা প্রভৃতির ছবি, মুসলমান মস্‌জিদে নানা রকমের নকাশী কাজের অলংকার। বাঙ্গালার এই নবীন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের চর্চা, বা ইহা লইয়া গবেষণা, এখনও হয় নাই; যে স্থাপত্য পশ্চিম-বঙ্গের বিষ্ণুপুরের সুন্দর মন্দিরাবলী, উত্তর-বঙ্গের কান্তনগরের মন্দির, এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অন্য নানা মনোহর মন্দিরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আলোচনা—এবং বাঙ্গালী কলাবিদের হাতে তাহার আলোচনা—না হওয়া লজ্জার কথা। বাঙ্গালীর মধ্য-যুগের চিত্র-শিল্প ও মূর্তি-শিল্প রাজসভায় আদৃত মহিমময় শিল্প-স্বরূপ এখন আর বিদ্যমান নাই—ইহা এখন পল্লী-অঞ্চলে অনাদৃত অখ্যাত গ্রাম্য শিল্পের কোঠায় নীত হইয়া, স্বদেশী ও বিদেশী ছাপা ছবি এবং সেলুলয়েড পুতুলের প্রতিযোগিতায় আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার চিত্র-শিল্প লইয়া—পুঁথির পাটার ছবি, পট, চাল-চিত্র ও অন্য ছবি, এবং কালীঘাটের পট প্রভৃতি বাঙ্গালীর বিশিষ্ট শিল্প-প্রকাশের নিদর্শন লইয়া বাঙ্গালী শিল্পবিদ্‌গণের আলোচনা এখনও অপেক্ষিত। বাঙ্গালার গ্রাম-শিল্পের আধারে বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের শেষ-পাদে কলিকাতায় একটি ইউরোপীয়-ভাব-মিশ্র নূতন

শিল্প-ধারা ধীরে-ধীরে প্রবর্তিত হয়। পাথরে-ছাপা রঙ্গীন দেবদেবী-চিত্রে এবং পৌরাণিক ও কচিৎ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্রে ইহার একটি লক্ষণীয় এবং সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইহারও সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে কাগজের উপরে ছাপা এই-সব রঙ্গীন লিথোগ্রাফের ছবি এখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য—আধুনিক যুগের বাঙ্গালীর একটি বিশেষ শিল্পময় আত্মপ্রকাশের নিদর্শন এইরূপে প্রায় অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। বহু প্রাচীন পবিবারে পুরাতন আমলের ছবি-রূপে ফ্রেমে বদ্ধ হইয়া এই-সব ছবি এখনও দুই চারিটা থাকিতে পারে—এগুলিকে রক্ষা করিয়া, সংগ্রহ করিরা রাখিবার জন্য অবহিত হওয়া উচিত।

*　　*　　*

বাঙ্গালীর গ্রাম-শিল্প বা লোক-শিল্পের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের—প্রাচীন বাঙ্গালা পট, পুঁথির পাটা, হাতে-আঁকা ছবি, মাটির মূর্তি ও পুতুল প্রভৃতির সংগ্রহে ইনি নিযুক্ত হন। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত নবীন-ভারতীয় শিল্প-সংঘের মধ্যেও, অজণ্টা এবং রাজপুত ও মোগল চিত্র-প্রণালীর মতো কালীঘাটের পটের চর্চা এবং প্রভাব দুই-ই বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-ও বাঙ্গালার লোক-শিল্পের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হন, এবং তিনি এই লোক-শিল্পের প্রাণ-বস্তু ও ইহার ভঙ্গিমা দুই-ই আয়ত্ত করিয়া এবং নিজ প্রতিভার দ্বারা ইহাদের মণ্ডিত করিয়া কতকগুলি অতিসুন্দর চিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় বাঙ্গালার গ্রাম-শিল্পের ভাষাকেই তাঁহার শিল্প-রচনার বাহন করিয়া লইযাছেন—বাঙ্গালার এই লৌকিক-শিল্পের সবল রেখা-বিন্যাসের মধ্যেই তিনি তাঁহার সব-কিছু বলিবার ভাষা পাইয়াছেন।

বাঙ্গালার লোক-শিল্পের—মধ্য-যুগের বাঙ্গালার যাবতীয় শিল্পের—আদর করিবার লোক বিরল নহে। বাঙ্গালার লোক-নৃত্যের মধ্যে অমৃতময় প্রাণের সন্ধান যিনি পাইয়াছেন, এবং এই অপূর্ব জিনিস দিয়া বাঙ্গালীকে জীয়াইয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার ব্রতচারীদের মারফৎ যিনি সারা বাঙ্গালা-ময় ইহার প্রচার করিতেছেন, বাঙ্গালা ছাড়িয়া ভারতের অন্য প্রদেশে, এমন কি সুদূর বিলাতেও যিনি বাঙ্গালার লোক-নৃত্যের বাণী পঁহুছাইয়াছেন, সেই ভাবুক ও কর্মী শ্রীযুক্ত গুরুসদয়

দত্ত মহাশয়ও বাঙ্গালার লৌকিক শিল্প-কলার একজন অনুরাগী সংরক্ষক ও সমালোচক। তাঁহার মতো রসজ্ঞ সংগ্রাহক ও বিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালার লৌকিক শিল্প লইযা ধারাবাহিক ও রীতিবদ্ধ-ভাবে পূর্ণ আলোচনা প্রার্থনা করিতে পারি। বিখ্যাত গুণজ্ঞ শিল্প-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ও বাঙ্গালার লোক-শিল্পের আলোচনা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও বাঙ্গালীর শিল্পের—বিশেষ করিয়া মধ্য-যুগের এবং আধুনিক লৌকিক শিল্পের—পরিচয় বহু চিত্র-যোগে তাঁহার "বৃহৎ বঙ্গ" গ্রন্থে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা বা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের মতো, বাঙ্গালার শিল্পের পূর্ণ ইতিহাসের যে অভাব আমাদের আছে, তাহা মোচনের জন্য বাঙ্গালা দেশের তরুণ গবেষকগণ বদ্ধপরিকর হউন। উপস্থিত আবশ্যক—বিভিন্ন যুগের শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করা। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান-মিউজিয়মে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহশালায, রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহে, এবং ঢাকার মিউজিয়মে, ও অন্যত্র কতকগুলি ব্যক্তি-গত সংগ্রহে, পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্য্যের বহু সুন্দর নিদর্শন আছে। পরবর্তী কালের গৌড-বঙ্গের শিল্পের জন্য একটি বিরাট্ ও ব্যাপক কেন্দ্রীয় সংগ্রহ-শালা স্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ মুসলমান ও আধুনিক যুগের বাঙ্গালা-শিল্প বিষয়ে নগণ্য; কিন্তু এই সংগ্রহকে, অথবা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন স্থাপিত আশুতোষ-ভারতীয়-কলাশালার ক্ষুদ্র সংগ্রহকে অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালীর শিল্পের পূর্ণ পরিচয় যেখানে পাওয়া যাইবে এমন একটি সংগ্রহ গাড়য়া তুলিতে চেষ্টা করা উচিত।

* * *

বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ প্রাচীন-কালে চর্য্যাপদের গান এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ, এবং মধ্য-কালে চণ্ডীদাস, মঙ্গলকাব্যকারগণ, বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ ও অন্য কবিদের রচনা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক-রূপে চলিয়া আসিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে, ইউরোপের মনের সহিত সংস্পর্শ বাঙ্গালীর চিত্তে সোনার কাঠির স্পর্শ দিল, তাহার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিল—আধুনিক যুগে বাঙ্গালী তাহার বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইল সাহিত্যে; ভারতবর্ষ তথা বিশ্বকে বাঙ্গালী দান করিল—বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ।

যে বাঙ্গালীর মধ্যে গৌড়-মগধ শিল্প-রীতি সৃষ্ট এবং পুষ্ট হইয়া ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রকে প্রভাবমণ্ডিত করিয়াছে, সেই বাঙ্গালীর শিল্প-প্রতিভা বিগত সাত শত বৎসর ধরিয়া ম্লান হইয়াই ছিল ; মন্দিরের মূর্তি-শিল্প, পট, পাটা—এই-গুলিতে তাহার যে পরিচয় পাই, তাহা পাল ও সেন যুগের মহিম-মণ্ডিত কৃতিত্বের পার্শ্বে নিতান্তই গ্রাম্য ও লৌকিক বলিয়া প্রতিভাত হয়। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক জাগরণের শতবর্ষ পরে, কতকগুলি চেষ্টা ও অপচেষ্টা এবং অপূর্ণ কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া, খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর শিল্প-বোধ এবং শিল্প-চেষ্টা নূতন পথ পাইল। বাহিরের স্পর্শ এ ক্ষেত্রেও কার্য্যকর হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা ও ঈ. বী. হাভেল প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা প্রাচীন ভারতের শিল্পের চর্চা এবং প্রতিস্পর্ধী ইউরোপীয়—রেনেসাঁস ও গ্রীক—শিল্পের পার্শ্বে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা, ভারতের শিল্পীদের আর একবার অন্তর্মুখী হইতে উৎসাহ দিল। নিজ জাতীয় শিল্পের রক্ষা বিষয়ে জাপানের চেষ্টাও ভারতীয় শিল্পীদের উৎসাহ এবং অনুপ্রাণনা আনিয়া দিল। ইহার ফলে, আশার বাণী এবং কৃতকারিতার গৌরব লইয়া দেখা দিলেন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ; আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক জাগরণে তাঁহার নাম চিরকাল ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবে। গুরুর আবাহনে যে শিল্প-দেবতা জাগরিত হইলেন, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যানুশিষ্যেরা তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন, এবং এইরূপে যথাশক্তি ভারতের সংস্কৃতির শাশ্বত গৌরবকে আরও মহনীয় করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত হইলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের মধ্যে, 'সিদ্ধশিল্পী' 'রূপপতি' নন্দলাল বসু, নিজ গুরুর সহিত মিলিত-ভাবে বিশ্ব-শিল্পসভায় ভারতের আসন আবার উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় ও বিশ্ব-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে স্থান, আমার মনে হয়, ভারতের ও বিশ্বের শিল্পকলায় নন্দলালের সেই স্থান ; আদিম যুগ হইতে পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে বাঙ্গালার নন্দলাল অন্যতম। গুরু-নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নন্দলাল একাধারে প্রাচীন শিল্পের প্রাণ-রস ও তাহার শক্তিটুকু আহরণ করিয়াছেন, এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সত্যতম এবং সুন্দরতম রূপময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিব-উমার যে মহনীয় কল্পনা ভারতীয় ধর্মোপলব্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং যাহা বিশ্বের তাবৎ দেব-কল্পনার মধ্যে উদার, বিরাট্, গভীর, গম্ভীর ও

সর্বাঙ্গর ভাবে অতুলনীয়, সেই গরিমময় কল্পনাকে রূপ দিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা—ধারাপুরী বা এলিফাণ্টায়, এলোরায়, মহাবলিপুরে, চোল-যুগের ধাতু-মূর্তিতে, কাঙ্গড়ার রাজপুত চিত্রে; নন্দলালের হাতে সেই মহনীয় কল্পনা, নূতন ভাবে আবার প্রকাশিত হইয়াছে, শিব-উমা যেন নন্দলালের সমক্ষে সাক্ষাৎ প্রকটিত হইয়াছেন;—নন্দলালের শিব-উমার পরিকল্পনা, মহত্ত্বে ও সৌন্দর্য্যে প্রাচীন ভাস্করদের ও চিত্রকরদের সৃষ্টির পার্শ্বে গৌরবের সহিত স্থান পাইবার যোগ্য। নন্দলালের কৃতিত্ব বাঙ্গালীর এবং ভারতবাসীর গৌরব এবং গর্বের বিষয়। নন্দলালের সতীর্থ ও অনুগামী শিল্পীরা ভারতের অন্যত্র বঙ্গদেশের এই নব শিল্পাদর্শ এবং শিল্প-চেষ্টাকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন এমন শিল্পী আছেন, আধুনিক ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে যাঁহাদের নাম সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইযা থাকে। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের শিষ্যদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ গুণবত্তা দেখাইবার পর অকালে পরলোকগমন করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার—ইঁহাদের কতকগুলি মনোহর রচনা, এবং বিশেষভাবে অসিতকুমারের নানামুখী প্রতিভা—ভারতীয শিল্প-জগতে ইঁহাদের অমর কবিয়া রাখিবে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্র-শিল্পী-রূপে সর্বাজনাদৃত কতকগুলি রচনায় কৃতিত্ব দেখাইবার পরে, বাস্তু-শিল্পে একটি নূতন এবং অতি মনোহর ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন; এ বিষযে তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনা ও কুশলতা দেশবাসীর নিকটে সুপরিচিত হওয়া উচিত। আধুনিক বঙ্গীয় তথা ভাবতীয গুণীদের মধ্যে ভাবুক শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের আসন একটু বিশিষ্ট স্থানে। ইউরোপীয় এবং পুনরুজ্জীবিত আধুনিক ভারতীয়, উভয় প্রকার শিল্প-রীতি সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া, ইনি এখন বাঙ্গালার গ্রাম-শিল্পের কতকগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গীর আধারে নিজ শিল্পময় প্রকাশের অভিনব ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালা গ্রাম-শিল্পের সবল রেখা এবং পরিস্ফুট বর্ণসমাবেশ যে কত শক্তির পরিচায়ক, তাহা যামিনীরঞ্জনের রচনায় বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন গৌড়-মগধ শিল্পীরা দেব-মূর্তি রচনায় প্রতিমা-লক্ষণ শাস্ত্রকে মানিয়া লইয়া, ঐ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া, অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। যামিনীরঞ্জনও তেমনি মধ্য-যুগের বাঙ্গালা চিত্রের রেখা ও

বর্ণবিন্যাসের ধারার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্ধন করিয়া, এই সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যেই অরূপের আবাহন করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বল্পভাষী রচনায় মহাভারত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যামিনীরঞ্জনের শিল্প-কলা আধুনিক বাঙ্গালা তথা ভারতে এক অপূর্ব বস্তু ; ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য, স্বল্পভাষিতার সহিত বাগ্মিতা, দুই-ই ইহাকে এক নূতন বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। নন্দলাল গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব উভয়েই অতুলনীয়, এবং তিনি তাঁহার বহুবিধ রচনায় আমাদের অরূপের রূপ দেখাইয়াছেন ও রূপাতীতের বাণী শুনাইয়াছেন ; যামিনীরঞ্জন দৃঢ় রেখা ও পরিস্ফুট বর্ণের অতলে ডুব দিয়া অরূপ-রত্নের অন্বেষণ করিতেছেন—মনে হয়, তাঁহার ছবিতে এই অরূপ-রত্নের জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়াছে।

* * *

বাঙ্গালা দেশের শিল্পীরা আধুনিক ভারতের শিল্প-চেতনায় এবং শিল্প-সৃষ্টির রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন—ইহা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এক গৌরবের বিষয়। কিন্তু বাঙ্গালী শিল্পীর নবীন চেষ্টার মধ্যে, সব সময়েই শক্তি বা কৃতকারিতা দেখা যায় না। প্রাচীন শিল্পের প্রতি একটা অন্ধ শ্রদ্ধা আসিয়া পড়ায়, বহুশঃ জীবন্ত সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাণহীন অনুকরণ-চেষ্টাই দেখা যায়। দর্শন-শক্তিযুক্ত চক্ষু এবং শিল্পদৃষ্টি-নিযন্ত্রিত অকম্পিত হস্ত—এই দুই-ই বিশেষ সাধনার অপেক্ষা রাখে। সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষা শিখিতে গেলে, ব্যাকরণ-চর্চা অপরিহার্য্য ; প্রাচীন ভারতের শিল্পের প্রাণটুকু আধুনিক রচনায় ফুটাইয়া তোলা, অসাধারণ শক্তি ও সাধনার দ্বারাই সম্ভব। আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীদের অনেকে প্রাচীনের চিন্তা-ধারার সহিত পরিচয় রাখেন না, আধুনিক জীবনও ভালো করিয়া জানেন না। তাঁহারা কেবল গুরু-নির্দিষ্ট পথ—গুরুর আচরিত পদ্ধতি—অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই কর্তব্য শেষ হইল মনে করেন। সত্য-দর্শনের চোখের অভাব, আবার সঙ্গে-সঙ্গে সবল রেখা-পাতের উপযোগী হস্ত-নিয়ন্ত্রণ শক্তিরও অভাব। সুতরাং ফিকা রঙের কোয়াসায় অক্ষম রেখাপাতকে আবৃত করিয়া, ততোঽধিক অক্ষম কল্পনার প্রকাশ, তথা-কথিত "ভারতীয় পদ্ধতি"র আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পীর রচনায় অত্যন্ত সাধারণ। বাঙ্গালা কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে যে গতানুগতিকতা, যে অনুকরণ, যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিদেশী ভাব বা রীতির অনুবর্তন

দেখা যায়, "ভারতীয় শিল্প-রীতি" অনুসারে যে-সকল বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আঁকেন, তাঁদের অনেকের ছবিতে সেই-সেই অবগুণ পাওয়া যায়। চারিদিকের জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের যোগের অভাব, প্রাচীন শিল্পের বাহ্য ভাষাটুকুকে একমাত্র পুঁজী করিয়া লইবার চেষ্টার সহিত মিলিত হইয়া, ইঁহাদের অনেকের শিল্প-রচনাকে নিতান্ত মূক ও প্রাণহীণ করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃত বা ফারসী বা হিন্দী যদি বলিতে না পারি, বাঙ্গালা বলিতে চেষ্টা করা উচিত; যদি খাঁটি বাঙ্গালাও না আসে, ভাষা দুরুস্ত করিয়া লইয়া তবে তাহাতে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা উচিত; এমন কি, নিজ বক্তব্য যদি সুবোধ্য করিয়া ইংরেজী-বাঙ্গালা-মিশ্র চল্‌তি ভাষায় বলা যায়, তাহা অবোধ্য ব্যাকরণাশুদ্ধ প্রাচীন ভাষা বা অন্য প্রদেশের ভাষা ব্যবহার অপেক্ষা কার্য্যকর হইবে। আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সম্মিলিত না রাখিয়া, কেবল কাব্য ও শিল্পের উপজীব্য রূপে প্রাচীন দেব-কল্পনাকে—দেব-মূর্তি ও দেব-চরিত্রকে—ব্যবহার করিলে, কল্পনা ক্ষুণ্ণ হয়; আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও দর্শন হইতে উদ্ভূত বিরাট্ রূপ-সৃষ্টি তাহাতে কেবল বিলাসে পরিণত হয়; এবং সে বিলাস প্রীতিকর হইলেও, প্রাণের পরিচায়ক চিরন্তন শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আধার শিল্প-পদবাচ্য হইতে পারে না। গ্রীসের শিল্পের ইতিহাসে আমরা এই ভাবটি-ই দেখিতে পাই। গ্রীক জাতি জেউস্, দেমেতের্, আপোল্লোন্, আর্তেমিস্, দিওনুসস্, আথেনা, হের্মেস্, আফ্রোদীতে, আরেস্ প্রভৃতি দেবতাগণে বিশ্বাস হারাইল—এই দেবতাদের বিরাট্ আধ্যাত্মিক স্বরূপ খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতক হইতে তাহাদের জীবনে আর প্রতিস্পন্দন জাগাইল না; অথচ তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম খ্রীষ্ট-পূর্ব শতকে, এবং তাহার পরেও রোমান যুগে, এই-সব দেবতাদের লইয়া মূর্তি-গঠন ও সাহিত্য-রচনা চলিল; পরবর্তী আস্থাহীন শিল্পীদের হাতে, দেব-মূর্তি-রচনায় ব্যাপৃত গ্রীক শিল্প, আপাত-নয়নাভিরাম থাকা সত্ত্বেও, decadent বা ক্ষয়িষ্ণু এবং পতিত হইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশেও এ যুগে যেন ইহার-ই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি।

* * *

আধুনিক বাঙ্গালী শিল্পী, যে শিব ও উমা, কৃষ্ণ ও রাধার কল্পনার আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থা পোষণ করেন না, কিংবা এই-সকল কল্পনার

গভীরত্ব ও গাম্ভীর্য্য যথাযথ উপলব্ধি করেন না, অথচ রাজপুত বা মোগল অথবা অজণ্টার ছবির ভঙ্গীর হাস্যকর অনুকরণের উপরে জাপানী হালকা রঙের পোঁছ লাগাইয়া সেই শিব-উমা, কৃষ্ণ-রাধার লীলার ছবি আঁকিবার চেষ্টা করেন—মনে করেন, "ভারতীয় শিল্প" হইতেছে। ইহা অপেক্ষা, সোজাসুজি বাস্তবানুকারী ইউরোপীয় ভঙ্গীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়কে, শিল্পে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টার মূল্য অধিক হইবে। এ স্থলে অক্ষম রেখাপাত ও ধোঁয়াটে' বর্ণ-সমাবেশের সুবিধা নাই—রচনায় ব্যাকরণ-দোষ সহজেই ধরা পড়ে।

* * *

আধুনিক ইউরোপীয় technique—বাস্তবানুকারী চিত্রণ-পদ্ধতি—লইয়া যে-সকল বাঙ্গালী শিল্পী কাজ করিতেছেন, বাঙ্গালার শিল্প-জগতে তাঁহাদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এইরূপ শিল্পীদের মধ্যে চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু এবং চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অতুল বসু ও দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর কৃত কতকগুলি প্রতিকৃতিময় চিত্র ও মূর্তি বাঙ্গালার শিল্পেতিহাসে সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইবে।

* * *

বাঙ্গালা তথা ভারতের শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে সহজ ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিবর্তে, অত্যধিক দেশাত্মবোধ দ্বারা দুষ্ট Orientalism বা 'প্রাচ্যবাদ'—'আর্য্যামি'-র জ্ঞাতি-হিসাবে যে 'প্রাচ্যবাদ'কে আমরা 'প্রাচ্যামি'ও বলিতে পারি—সেই 'প্রাচ্যামি' আসিয়া গিয়াছে। শিল্প-জগতে যদি অনুচিত দেশাত্মবোধ আসে, তাহা শিল্পের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে না। ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্প-রসিকেরা আমাদের শিল্পকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে—আমরাও করিয়াছি; এতদিনে এই অবহেলার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আমরা Indian Spirituality vs. Western Materialism, 'ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা বনাম ইউরোপীয় ইহলোক-সর্বস্বতা'—এই বুলি আওড়াইতেছি, এবং এই বুলিতে বিশ্বাসও করিতেছি। সেইজন্য আমরা এখন এই কথাটি শুনিতে বা বলিতে ভালোবাসি যে, ভারতীয় শিল্প আধ্যাত্মিকতার

রসে ভরপূর, ইউরোপের শিল্প (কি গ্রীক, কি বিজান্তীয়, কি গথিক, কি রেনেসাঁস, কি আধুনিক—সব আমরা এক কড়ায় চড়াইয়া দেই) মানবিকতার পূজায় মত্ত। এই প্রকার বিশ্বাস বা বিচারের বশবর্তী হইয়া, আমরা এখন (অন্ততঃ বাহিরে) প্রাচ্যের পূজারী হইয়া পড়িতেছি;—আভ্যন্তর প্রেরণা হইতে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির জোরে আর খাঁটি প্রাচ্য থাকিতেছি না; বাহিরের জগতের চাপে ভিতরে আমরা যত-ই ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি, তত-ই আমরা 'প্রাচ্যামি'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বাহ্য-জীবনে ইহার ছিটাফোঁটা লাগাইয়া, আমাদের অবস্থায় যে অস্বস্তি আমরা অনুভব করি সেই অস্বস্তিকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছি। শিল্পে আমাদের এই 'প্রাচ্যামি'ও দেখা দিতেছে; এবং 'কস্‌মেটিক্'-এর বিজ্ঞাপনের ছবিতে, অজণ্টার যুগের মেয়েদের অনুকরণে বুকে গামছা বাঁধিয়া, গামছা বা খাটো লুঙ্গী পরিয়া, ইউরোপীর সুন্দরীরা যে আধুনিক বাঙ্গালী ঘরের শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা শিল্প-বিষয়ক এই 'প্রাচ্যামি'র একটা প্রকাশ মাত্র। ইউরোপীয় প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের ফোটোগ্রাফের নকলের অনুরূপ ভঙ্গীতে রাধা-কৃষ্ণের ছবি আঁকা—ইহাও এই 'প্রাচ্যামি'র এক অপকৃষ্ট বিকার মাত্র। শিল্পকলায় এই বাহ্য প্রাচ্যামি একটা ভাণ মাত্র; ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা মনে-প্রাণে না বুঝিয়া, দৈনন্দিন জীবনে ইহাকে কার্য্যকর করিবার কোনও চেষ্টা না রাখিয়া, শিল্প-সৃষ্টিতে ইহার বিলাস প্রদর্শন করা একটা মিথ্যাচার—একটা প্রাণহীন ভঙ্গী-মাত্রতে পর্য্যবসিত হয়। ইহাতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, মাত্র নামে এবং বাহ্য অপ্রধান দুই-একটি বস্তুতে ব্যতীত, আর কিছুতেই বিদ্যমান নাই। এই-সমস্ত জিনিস যেন, 'পরশুরাম'-দৃষ্ট, বঙ্গদেশের আধুনিক শিক্ষিত লোক এবং এমন কি 'জজ মেজিষ্টর মহামহোপাধ্যায়'গণের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত 'রেগুেজ্‌ ভোঁস্' 'আংগ্লোমোগলাই কেফ্'-এর 'নবতম অবদান'—'কচি ভাইটো-পাঁঠার ইষ্টু', 'মুরগির ফ্রেঞ্চ মালপো,' অথবা 'ডবল-ডিমের রাধাবল্লভী'; কিংবা অতি-আধুনিক বাঙ্গালী সংগীত-স্রষ্টার 'ধ্রুপদী গজল' অথবা 'ঠুমরীর 9th Symphony.'

* * *

আকাঙ্ক্ষা না হইলে পূর্তি হয় না। দেশের লোকের মধ্যে চাহিদা না থাকিলে, শিল্প অথবা অন্য কোনও বস্তুর-ই প্রসার বা উন্নতির সম্ভব হয় না।

ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে, শিল্পের সমঝদার এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, উভয়েরই অভাব। শিল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সমর্থ, অধিকাংশ স্থলে তাঁহার রুচি বিকৃত, এবং স্বদেশী শিল্পী ও শিল্প-দ্রব্য দুই-ই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে প্রায়-ই বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প-শিক্ষারও অভাব; এবং দেশ নিতান্ত দরিদ্র। উপস্থিত অবস্থায় দেশের রাজশক্তির নিকট শিল্প-কলা বিশেষ কোনও সহায়তা পাইবার আশা করিতে পারে না—শিল্প এখন অবহেলিত। অন্যান্য সভ্য ও স্বাধীন দেশে, নগর ও জাতীয় সৌধাবলীর শোভা বর্ধনের জন্য শিল্পী সর্বত্রই আহূত হন। কিন্তু ভারতবর্ষে এতদিন এই রীতি প্রায় অজ্ঞাত ছিল; সম্প্রতি দিল্লীতে স্বল্প পরিমাণে শিল্পের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইহা আরও অজ্ঞাত ছিল। পোস্টার বা প্রাচীর-বিজ্ঞাপন, এবং গল্প ও ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তকের ছবির রেওয়াজ আসিয়া না গেলে, অধিকাংশ শিল্পীকে অনাহারে থাকিতে হইত। অধুনা কলিকাতার দুই-একটি সিনেমা-প্রেক্ষাগৃহে বাঙ্গালী শিল্পীরা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইবার কথঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছেন। যাহা বাঙ্গালায় গভর্ণমেণ্ট বা তদনুরূপ প্রতিষ্ঠান করিলেন না, সেই শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা বিষয়ে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ভারত-ইতিহাসের যে ভিত্তি-চিত্রমালা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় ব্যাপার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত বহুশঃ অনুকৃত হইলে, বাঙ্গালাদেশের শিল্পীদের মধ্যে নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ দেখা দিবে। সুখের বিষয়, কলিকাতায় দুই-চারিজন গুণগ্রাহী ও শিল্প-রসিক ব্যক্তি এইরূপে বাঙ্গালার শিল্পী ও শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা আরম্ভ করিয়াছেন।

বাঙ্গালীর শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে, বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যে নিহিত সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, আদর্শবাদ ও বাস্তবিকতা—এই সমস্তকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ফুটাইয়া তোলার সার্থকতা থাকিবে—অজণ্টা বা মোগল শিল্প, অথবা পুঁথির পাটার ছবির ভঙ্গীতে নহে, ইহার অন্তর্নিহিত সত্য-দর্শনের মধ্যে এবং শক্তিময় প্রকাশের মধ্যে। "যে হউক

সে হউক ভাষা—কাব্য রস লয়্যা"—কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-বিষয়ে এই উক্তি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ভঙ্গী যাহা-ই হউক না কেন—সারল্য ও সততা-ই হইতেছে সার্থক শিল্পের প্রাণ। বাঙ্গালীর জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আশঙ্কার মধ্যে যদি কিছু বড়ো জিনিস থাকে—এমন জিনিস যাহা সত্য-সত্যই সমগ্র জাতির দেহ মন ও প্রাণকে নাড়া দেয়, তবে সর্বদর্শী এবং কৃতী শিল্পী থাকিলে তাহার উপযুক্ত শিল্পময় প্রকাশ হইবেই। আর বাঙ্গালীর জীবন যদি ক্ষুদ্র ও নগণ্য থাকে, হাজার অজণ্টার ভারত বা রেনেসাঁস ইটালী, আধুনিক ইউরোপ বা জাপানের অনুপ্রেরণা তাহাকে শিল্পে বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। শিল্প ও সাহিত্য, এ সমস্ত-ই জীবনের অংশ—এ কথা আমাদের অহরহঃ মনে রাখিতে হইবে। বাঙ্গালী শিল্পী বাঙ্গালীর জীবনে মহাকাব্যের অনুরূপ রচনার বস্তু না পাইতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরোয়া জীবন লইয়া, ওলন্দাজ শিল্পীদের মতন অথবা জাপানী Ukiyo-ye 'উকিয়ো-য়ে' শিল্পীদের মতন এক অভিনব গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন-সংপৃক্ত চিত্রণ-রীতি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে হওয়া উচিত নহে। এখানেও সততা ও সত্যদৃষ্টি চাই, চোখ ও হাত চাই।

* * *

বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন অরাজকতা চলিতেছে; ইউরোপীয় সাহিত্যের কতকগুলি নূতন জিনিস বাঙ্গালার সাহিত্যে এবং সমাজে চালাইবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। বাঙ্গালা শিল্প-ক্ষেত্রেও এখন কোনও আদর্শ, কোনও বিশেষ রীতি নাই; জাতীয়তার নামে, Indian Art-এর দোহাই পাড়িয়া, ইউরোপীয় নকল-শিল্পের উপরে এক পোঁছ প্রাচ্যামির রঙ লেপিয়া, এখন সাধারণতঃ বাঙ্গালী শিল্পী আত্মপ্রকাশ বা আত্ম-বঞ্চনায় ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে একমাত্র দিগ্‌দর্শন আসিতে পারে,—প্রথমতঃ, শিল্পীদের মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্ধনে—শিল্পেতিহাসের আলোচনায়, মিসরীয়, গ্রীক, বিজান্তীয়, প্রাচীন ভারতীয়, গথিক, চীনা, জাপানী, রেনেসাঁস প্রভৃতি শিল্পের বড়ো-বড়ো সৃষ্টির অনুধ্যানে; দ্বিতীয়তঃ—বহুবর্ষব্যাপী সাধনার দ্বারা সৌন্দর্য্যগ্রাহী দিব্যদৃষ্টি লাভে, এবং দিব্যদৃষ্টির প্রকাশক তুলিকা বা ছেদনী চালনার শক্তি অর্জনে। দেশের শিল্পের ধারাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজ প্রচেষ্টাকে তাহা

হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে না দিলে, দেশের মাটি হইতে রস পাইয়া তবে শিল্প প্রাণবন্ত থাকিবে। যুগ-প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ, সিদ্ধ-শিল্পী রূপপতি নন্দলাল, ভাবুক রূপকার যামিনীরঞ্জন—নবীন বাঙ্গালার শিল্প-জগতের এই ত্রয়ী শক্তির অনুপ্রেরণা, তরুণ বাঙ্গালী শিল্পীকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারিবে, মানসিক ও শিল্প-বিষয়ক সংস্কৃতি ও উপলব্ধি, শক্তি ও দৃঢ়তা, সত্য-দর্শন ও সত্য-প্রকাশনের সাধনায় তাহার জন্য যুগোপযোগী পথ নির্দেশ করিতে পারিবে॥

[বঙ্গাব্দ ১৩৪৪]

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"

(বৈদিক উর্বশী, গ্রীক আফ্রোদীতে, সূফী বিশ্বপ্রিয়া)

রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী" কবিতাটি বাঙ্গালা ভাষায় কল্পনার ও উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-রূপে বিদ্যমান, এবং বিশ্বসাহিত্যেও এইরূপ কবিতা সুদুর্লভ। বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও মানব-জীবন উভয়েরই মাধ্যমে কার্য্যকর, জীবনের আধার এবং পটভূমিকা-রূপে শাশ্বত সত্তা ও সত্য, নানা ভাবে আপান-ই মানুষের কাছে দেখা দেয় ও ধরা দেয়—মানুষ-ও নানা ভাবে তাহাকে দেখিতে চায় ও ধরিতে চায়। মানুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, রুচি ও আকাঙ্ক্ষা সংখ্যাতীত; শাশ্বত সত্যও বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সংখ্যাতীত পৃথক্-পৃথক্ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। সুফী দার্শনিক এই ভাবের কথা-ই বলিয়াছেন —"তুরুকু-ল্লাহি ক-অদদি অন্‌ফাসি-ল্-মখ্‌লুকাতি" অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু-সমূহের নিঃশ্বাসের সংখ্যার মতো-ই ঈশ্বরের প্রকাশ-লীলা অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের মনে এই শাশ্বত সত্তা যে ভাবে নিজেকে ধরা দিযাছিল, তাঁহার যৌবন-কালের "জীবন-দেবতা" পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতে (মুখ্যতঃ "সোনার তরী" ও "চিত্রা"-র এবং "উৎসর্গ"-র কতকগুলি কবিতায়, এবং প্রকীর্ণ অন্য কতকগু া কবিতায) তাহা অদ্ভুত মনোহর ভাবে প্রকাশিত হইযাছে। ভাব ও তাহার প্রকাশ উভয়-ই চিরন্তন, এবং একাধারে নবীন ও প্রাচীন। নানা দেশে, নানা যুগে, নানা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে, শাশ্বত বস্তুর প্রকাশ, বহুধা অর্থাৎ বহু বিভিন্ন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে একটি নূতন ভঙ্গী আনিয়া দিয়াছেন; তাহাতে এই চিরন্তন সত্তা আবার নূতন রূপে আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং আমাদের আকুল করিতেছে। এই বিশ্বজনীন আবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিগত উপলব্ধির রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া, যেন বিশেষ-ভাবে রবীন্দ্রনাথের-ই সত্যদর্শন ও অনুভূতির বাণী বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

*　*　*　*

একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিষয়টির আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন ডচ্-ইণ্ডিয়া বা ইন্দোনেসিয়া অর্থাৎ দ্বীপময় ভারতে (যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে) ভ্রমণ করিতে যান, তখন আমাকেও তিনি সঙ্গে লইয়া যান। যবদ্বীপের বাতাবিয়া নগরে দুই তিন-দিন থাকিবার পরে আমরা সুরাবায়াতে যাই, এবং সেখান হইতে আমাদের বলিদ্বীপ-যাত্রা হয়। বিকাল বেলায় আমরা সুরাবায়াতে জাহাজে চড়ি, তাহার পরের দিন ভোরে উত্তর-বলিদ্বীপের বন্দর বুলেলেঙ্-এ পৌঁছিবার কথা। সন্ধ্যার প্রথমেই জাহাজের যাত্রীদের সায়মাশ সম্পন্ন হইল। রবীন্দ্রনাথ উপরের খোলা ডেকে আসিয়া বসিলে, ওলন্দাজ ও ইন্দোনেসীয় অনুরাগী সহযাত্রিগণ চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সদালাপ চলিতে লাগিল। আমি একটি ইন্দোনেসীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করিতে-করিতে ডেকের উপরে পায়চারি করিতেছি। একটু দূরে, খোলা ডেকের উপরেই, একটি ছোট টেবিলের সামনে দুইখানি চেয়ারে একটি দম্পতী উপবিষ্ট—পোশাকে পুরুষটিকে আমেরিকান পাদ্রি বলিয়া মনে হইল। আড় চোখে চাহিয়া দেখিলাম, স্বামীটি একটু ভালো-মানুষ গোছের, সরল-প্রাণ ব্যক্তি। স্ত্রীটির ইচ্ছা, স্বামী গিয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটু আলাপ জমান, কিন্তু স্বামীটি মিশুক নহেন, ইতস্ততঃ করিতেছেন। শেষটায় দেখিলাম, বেচারা পাদ্রি, স্ত্রীর তাড়ায় উঠিয়া, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে আমার কাছেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পরিষ্কার আমেরিকান নাকী টানের ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, Sir, are you travelling with Tagore, the poet? আপনি কি ঠাকুর কবির সঙ্গে যাইতেছেন? আমি বলিলাম, Yes; what can I do for you? হাঁ; আপনার জন্য কী করিতে পারি? পাদরি তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—Can I have a talk with him for two minutes by the clock—ঘড়ী ধরিয়া মাত্র দুই মিনিটের মতন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পারি কি? আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। পাদ্রির সঙ্গে আমি যে কথা কহিতেছি, কবি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, ভদ্রলোকটি "ঘড়ী ধরিয়া, দুই মিনিট মাত্র" আপনার সঙ্গে কথা কহিতে চান। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ওটি? পাদ্রি মনে

হইতেছে। আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, পাদ্‌রি বটে, আমেরিকান পাদ্‌রি। এখন বিশেষ করিয়া 'আমেরিকান পাদ্‌রি' শুনিয়া, রবীন্দ্রনাথ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নোবেল পারিতোষিক পাইবার পরে যখন আন্তর্জাতিক নামযশ তাঁহার হইল, তাহার পরে জাহাজে ভ্রমণ-কালে দুই-দুই বার আমেরিকান পাদ্‌রি তাঁহার উপরে চড়াও হয়—তাঁহাকে যদি খ্রীষ্টান করিতে পারা যায় এই চেষ্টায়। ঘর-পোড়া গোরু সিন্দুরে' মেঘ দেখিয়া ডরায়—রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থা। আমি বলিলাম—যদি বেআদবী করে, তাহা হইলে সরাইয়া লইয়া যাইব। তখন কবি নিরুপায় ভাবে বলিলেন, আচ্ছা, ডেকে নিয়ে এসো। রবীন্দ্রনাথের সামনে আসিয়াই, খাস আমেরিকান কায়দায় হৃদ্যতা দেখাইয়া খুব জোরে তাঁহার হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া, পাদ্‌রিটি বলিলেন, Glad to make your acquaintance, Sir. After all, we follow the same religion—মহাশযের সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখী হইলাম—আমরা তো মোটামুটি ভাবে এক-ই ধর্ম পালন করি। ধর্ম-বিষয়ে বিচারের উদ্দেশ্যে একেবারে সোজা মুখপাত। কবি শুধাইলেন—How's that? সেটা কী রকম? পাদ্‌রি ব্যাখ্যা করিলেন—Aren't our ideas about God the same? ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি এক ধরণের নয়? কবি উত্তর দিলেন, I doubt it very much—সে বিষয়ে আমার খুব-ই সন্দেহ আছে। তখন পাদ্‌রি বলিলেন, Why, don't we both worship God as Father? কেন, আমরা দু-জনেই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পূজা করি না? আমি দেখিলাম—এই বার God as Father বা "পিতা ঈশ্বর" আমন্ত্রিত হইলেন, ইহার পরে নিশ্চয়ই God the Son বা "পুত্র ঈশ্বর" এবং God the Holy Ghost বা "পবিত্র আত্মা ঈশ্বর" আসিবেন—সেইজন্য তাড়াতাড়ি কবি কিছু বলিবার আগেই বলিলাম—Yes, we worship God as Father; we also worship God as Mother, as Son, as Friend; we also worship him as Lover; and we dare worship him even as Sweetheart—আমরা পিতা-রূপে ঈশ্বরের আরাধনা করি, তা-ছাড়া মাতা-রূপেও করি, পুত্র আর মিত্র-রূপেও করি; আমরা ঈশ্বরকে প্রণয়াস্পদ রূপে-ও আরাধনা করি; এমন কি তাঁহাকে প্রণয়িনী রূপে-ও আরাধনা করিবার সাহস

রাখি। "সদা-প্রভু পরম পিতা" পরমেশ্বরের সঙ্গে এ কি সৃষ্টি-ছাড়া সম্বন্ধের কল্পনা! পাদ্‌রিটি আমার কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন—কিন্তু কবি নির্বাক্‌, নিশ্চল, স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন, আমার কথার প্রতিবাদ করিলেন না। তখন পাদ্‌রিটি কিছু না বলিয়া হঠাৎ স্থান-ত্যাগ করিয়া, একেবারে গট্‌গট্‌ করিয়া গিয়া অপেক্ষমাণা স্ত্রীর পাশে চেয়ারে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন—বোধ হয় স্ত্রীকে যাহা বলিলেন তাহা এই ধরণের কথা-ই হইবে—গিন্নী! এরা বলে কী! লোকগুলা উন্মাদ!

* * * *

এই যে God the Sweetheart-এর কল্পনা, এটি একটি নূতন বস্তু নয়। মানব যখন হইতেই ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্তার সহিত নিজের ব্যক্তিগত যোগের বা আকর্ষণের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সামাজিক পরিবেশের প্রসার বা উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ঐ সত্তার সহিত সে নানাবিধ সম্পর্কের কল্পনা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক, পতি-পত্নী রূপে বা প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে যখন romantic অর্থাৎ রমন্যাস বা অনুরাগ-রঞ্জিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, দেহাশ্রয়ী সম্পর্ক যখন আতিদৈহিক পর্য্যায়ে sublimated বা উন্নীত হইল, বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা, এবং বিশ্বাতিগ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরাৎপরের সঙ্গে এই প্রকারের অনুরাগ-রঞ্জিত নিবিড়তম সংযোগকে তখন মানুষ অন্যতম চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা পরমার্থ বলিয়া চিন্তা করিতে শিখিল। মানব-সমাজে এক দিকে যেমন শাশ্বত সত্যের সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিতেছিল, এবং সেই সচেতনতাকে অবলম্বন করিয়া সত্যের বা পরমার্থের উপলব্ধি বা অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্ম-সাধনার রূপে প্রকট হইতেছিল, তেমনি অন্য দিকে নর-নারীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও জীবনের অন্যতম প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ বলিয়া পরিগণিত হইয়া, শ্রেয়ের প্রতীক বা সাধন-রূপে কবিদৃষ্টি-যুক্ত মানব-মনের নিকট প্রতিভাত হইল। জ্ঞানের পথে ও কর্ম্মের পথে যেমন শাশ্বত সত্তার উপলব্ধির চেষ্টা আরম্ভ হইল, তেমনি পরে এই অনুরাগের পথও আবিষ্কৃত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধও জাগ্রত হইল। সমাজে সব বিষয়ে নেতা বা পরিচালক ছিল পুরুষ, এবং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী-ই সব বিষয়ে ছিল প্রবল—এমন কি মেয়েরাও অবস্থাগতিকে পড়িয়া পুরুষের চোখেই সমস্ত বিষয় দেখিতে অভ্যস্ত হয়। নারী-সম্বন্ধে পুরুষের

ধারণা যেমন-যেমন romantic বা অনুরাগের পর্য্যায়ে উঠিতে লাগিল, পুরুষ-ও তেমনি-তেমনি কবিতায়, গানে, কাব্যে, ও শিল্পে তাহার উচ্ছ্বসিত ও পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে লাগিল। নারী তো নর-সমাজে পরিবার ও গৃহের পত্তনেব সঙ্গে-সঙ্গে, গৃহধর্মের সহধর্মিণী রূপে প্রথম হইতেই ছিল। তাহার উপবে, নারী-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাঙ্গল্য, শ্রী ও কল্যাণ আসিয়া, ভাবুক পুরুষের কাছে নারীর মর্য্যাদা আরও উঁচুতে তুলিয়া ধরিল। বাস্তব ও কল্পনা, জৈব আকর্ষণ এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতে তাহার উন্নয়ন—এই দুইয়ে মিলিয়া পুরুষের কল্পনার কেন্দ্র করিয়া তুলিল নারীকে। অপর, যে শাশ্বত বস্তুর সম্বন্ধে মানুষ এই ভাবে সচেতন হইল—

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি ;
বিশ্ব-বিহীন বিজনে বসিযা বরণ করি ;
তুমি আছো মোর জীবন মরণ হরণ করি"—

মানবী আকৃতিতে তাহাব যেন নানা রূপাযণ মানব-চিত্তে ঘটিল, নাবী-মূর্তি-ও তাহারও মধ্যে পুরুষ-আকৃতিব প্রতিস্পর্ধী হইয়া দেখা দিল। নাবী একাধাবে প্রণযিনী ও জননী ; নাবী আবাব একদিকে নর্মসখী ও অন্যদিকে কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী। পুরুষেব complementary বা পবিপূবক আবাব নাবী। সুপ্রাচীন যুগ হইতেই সব দেশের পুরুষ, সে যাহা আন্তরিক ভাবে কামনা কবে তাহাকে নাবী-প্রতীকেই পাইবাব আকাঙ্ক্ষা করিযাছে। The World's Desire অর্থাৎ "বিশ্ব-বাসনা" নিজ বিকশিত রূপ লাভ করিয়াছে নারী-মূর্তিতে ; কবির এই উক্তি মানব-সাধারণ—"অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।"

কিন্তু তাই বলিয়া সর্বত্রই যে নারী-প্রতীকে বিশ্বসত্তার বা শাশ্বত সত্যেব আবাহন হইযাছে, তাহা নহে। বিভিন্ন জন-সমাজের সামাজিক পারিপার্শ্বিকের আধারে এ বিষযে সেই সমাজের চেতনাও গডিযা উঠিয়াছে। Patriarchal অর্থাৎ পিতৃনিষ্ঠ সমাজে মাতার স্থান পিতার পরে ; আবার তেমনি Matriarchal অর্থাৎ মাতৃনিষ্ঠ সমাজে পিতার স্থান নগণ্য, মাতা-ই সেখানে রাণী, মাতা-ই পরমা দেবী। পৃথিবী বা ধরণী বা ধরিত্রী—সকলকে ধরিয়া আছেন, ক্রোডে করিয়া আছেন এই প্রশস্ত ভূমিময় জগৎ—প্রায় সর্বত্র মাতা-রূপে কল্পিত—আমাদের "পৃথিবী মাতা," "ধরতী মা"। এই মনোভাবও আদিম মানবের মনোভাব। পিতৃনিষ্ঠ ও মাতৃনিষ্ঠ উভয় পারিপার্শ্বিকের মিলনের ফলে আর্য্যদের

"দ্যৌষ্ পিতা" ও "পৃথ্বী মাতা" উভয়ের মিলিত কল্পনা গড়িয়া উঠে। এবং প্রাগ-আর্য্য যুগের পশ্চিম-এশিয়া খণ্ডের আর্য্যেতর জাতি-সমূহের মধ্যে শিব-উমা বা শিব-শক্তির দর্শন-মূলক প্রতিষ্ঠা ঘটে। অন্যান্য নানা জাতির মধ্যে-ও এইরূপ নর-নারী বা পিতা-মাতার অথবা পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্ম কল্পনা দেখা যায়। ভারতের আদিবাসী কোল-জাতির মধ্যে "সের্মা" (Serma) বা আকাশ ও "অতে" (Ote) বা পৃথিবী, "আপা-এঙা" (Apa-Enga) বা পিতা-মাতা রূপে কল্পিত। পোলিনেসীয় জাতির মধ্যে "পাপা-রাঙি" বা "পাপা-লাঙি" অর্থাৎ পৃথিবী (Papa) ও স্বর্গ বা আকাশ (Langi, Rangi), চীনাদের মধ্যে Yang "য়াঙ্" বা পুরুষ ও Yin "য়িন্" বা প্রকৃতি, এইরূপে বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত।

এইরূপে দেখা যায় যে, শাশ্বত সত্তার সহিত মানব অন্তরঙ্গ-ভাবে নানা সম্বন্ধের কথা স্থির করিয়াছে—প্রভু, পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, পতি, প্রণয়িনী প্রভৃতি। এইরূপ নানা প্রকারের সম্বন্ধ মানুষ যে করিয়া থাকে, মানুষ করিতে বাধ্য, তাহা প্রাচীন ভারতে অতি সহজ-ভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের "একং সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি," উপনিষদের "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব", এবং "ত্বং স্ত্রী ত্বম্ পুমানসি, ত্বম্ কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" প্রভৃতি বচনে, এবং গীতার "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং বিধানম্ বীজম্ অব্যয়ম্॥" প্রভৃতি শ্লোকে, এই বিশ্বতোমুখ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে বৈষ্ণব চিন্তায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই কয় পর্য্যায়ে এই ব্যক্তিগত সংযোগ শ্রেণী-নিবদ্ধ হয়। সময় বা অবস্থা অনুসারে এক-ই ব্যক্তি, একাধিক সম্পর্কের ভাবনা করিতে পারে ও করিয়া থাকে।

* * * *

আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে, এই রসাত্মক বা অনুরাগময় মধুর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং সর্বোচ্চ কোটির বলিয়া স্বীকৃত। এই সম্পর্কে, মানব অথবা মানবাত্মা হইতেছে 'শাশ্বত নারী' এবং পরম সত্য বা চরম সত্তা হইতেছেন পুরুষ—'পুরুষোত্তম'; গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ, এই দুই প্রতীকে এই সম্পর্ক বৈষ্ণব দর্শনে ও অনুভূতিতে রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

এই মধুর রসের বা অনুরাগের সম্পর্কের সাধনায়, চিরকাল ধরিয়া. ভারতবর্ষে সর্বত্র সব শ্রেণীর সাধক, যাঁহারা শুষ্ক জ্ঞান ও বিচারের পথের বাহিরে প্রধানতঃ রসানুভূতির পথ গ্রহণ করিয়াছেন, 'মানবাত্মা নারী-প্রকৃতিক ও পরমাত্মা পুরুষোত্তম', এই ভাবের-ই ভাবুক হইয়াছেন। অবশ্য, একাত্মবোধের অবস্থায় নারী বা পুরুষ কাহারো এই বিভেদ-বুদ্ধি থাকে না—বৈষ্ণব সাধক পদকার যেমন বলিয়াছেন, "না সো রমণ, না হম রমণী"—কিন্তু সাধাবণ ধারণায এই ভাবের সিদ্ধান্ত বা আরোপ প্রচলিত। অবশ্য এই সাধাবণ ধারণা বা বোধের ব্যত্যয়-ও ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতিহাসে আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন বা সংযোগকে, অথবা জীবাত্মা কর্তৃক নিজের মধ্যে পরমাত্মাব উপলব্ধি বা অনুভূতিকে, 'প্রিয়া স্ত্রী'র সঙ্গে পুরুষের মিলনেব সহিত উপমিত কবা হইযাছে (বৃহদারণ্যক —৪।৩।২১—"তদ্বাস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহত-পাপ্মাভযং রূপং—তদ্যথা প্রিয়যা স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্, এবায়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরং—তদ্বাস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।" ঋগ্বেদেও, কবি বা ঋষির কাছে বাগ্‌দেবীর আত্ম-প্রকাশকে-ও অনুরূপ প্রতীকে দেখানো হইয়াছে—

"উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্,
উতঃ ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥"

এবং উপনিষদে পাইতেছি—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বি বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে মধুর রসের সাধনায় পরমাত্মা বা শাশ্বত সত্তা হইতেছেন পুরুষ, এবং মানব বা মানবাত্মা হইতেছে নারী। ইহার বিপরীত ভাব পাওয়া যায় না—উপরের অনুচ্ছেদে উদ্‌ধৃত বৈদিক সাহিত্যের কতকগুলি উদাহরণ ভিন্ন। এমন কি মুসলমান সূফী-ভাবে প্রভাবান্বিত, ও স্পষ্ট করিয়া নিজেদের "সূফী" আখ্যা যাঁহারা দিয়াছেন, এমন মুসলমান ও হিন্দু কবিগণ, এই ভারতীয় কল্পনা-ই রক্ষা করিয়াছেন—ঈশ্বর পুরুষোত্তম, মানব যেন ঈশ্বরের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী। ঈরান ও আরবের সূফী মতে কিন্তু ইহার বিপরীতটি-ই

দৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হইতেছে। ভারতে সূফী আধ্যাত্মিক ধারণা ও প্রকাশ-ধারা যাঁহারা পূরাপূরি মানিয়া লইয়াছেন, এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে ফারসী সাহিত্যের আওতায় যাঁহারা পড়িয়াছেন, এমন কতকগুলি উর্দু-ভাষার কবি অবশ্য এই সনাতন বা বিশিষ্ট ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী গ্রহণ করেন নাই—ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে "মাশূকা" বা "মাশূক", অর্থাৎ প্রেমের পাত্রী অথবা প্রেমের পাত্র, এবং মানব বা জীব হইতেছে "আশিক্" অর্থাৎ প্রেমিক।

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"-বিষয়ক কবিতাগুলিতে কিন্তু ভারতীয় ধারার বিরোধী অন্য ভাবটি-ই পাইতেছি। এই "জীবন-দেবতা" কে? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চিন্তা বা ভাব-ধারার বিচার-বিশ্লেষণ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ এই জীবন-দেবতা যে শাশ্বত সত্তা, পরমাত্মা বা 'ঈশ্বর' নহে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত (সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, সাকার দেবতা প্রভৃতি) ঈশ্বরীয় সত্তার বিভিন্ন বর্ণনা অথবা দার্শনিক প্রকৃতি নির্ণয়ের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূত ও "জীবন-দেবতা" নামে অভিহিত এবং কবিতায় তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত সত্য-শিব-সুন্দর-স্বরূপ (এবং কবি-দৃষ্টির সামনে বিশেষ করিয়া সুন্দর-স্বরূপ) বিশ্ব-নিহিত ও বিশ্বাতিগ শাশ্বত সত্তার সম্পূর্ণ মিল না পাইয়া, এই "জীবন-দেবতা"-কে ঐশ্বরিক সত্তা হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন; এবং সেই বস্তুটি যে কী, তাহার নির্ণয়ের জন্য শব্দের মালা গাঁথিয়াছেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমার মনে হয়, যে বিশ্ব-শক্তি বা বিশ্বদেবতা ব্রহ্মাণ্ডময় লীলা করিতেছেন, মানব-জীবন সেই দেবতার অধিকারের বাহিরে নহে; "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে"—সেই দেবতা বা সত্তা বা শক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ক্রীড়া করিতেছেন, আবার মানুষের দেহ-পিণ্ডের অভ্যন্তরে তাঁহার-ই লীলা চলিতেছে; Macrocosm ও Microcosm, বৃহৎ বা ভূমা, এবং অণু বা কণা, উভয়-ই তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র, এবং সেই লীলার প্রকাশ বা ভঙ্গী-ও অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি, বিশ্ব-মানবের অনুভূতির রাজ্যে একান্ত-ভাবে তাঁহার নিজের দান—তাঁহার কাব্যময় কৃতির মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে এই বস্তুটি একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া বিদ্যমান; এবং চিরকাল ধরিয়া ইহা রসের অফুরন্ত উৎস হইয়া

থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা লোপ পাইলে বা ইহার আমূল পরিবর্তন ঘটিলে, এই বস্তুর প্রকাশ-সৌন্দর্য্য সাধারণ ভবিষ্যদ্-বংশীয়ের কাছে হয়-তো ঢাকা পড়িয়া যাইবে; কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে-ও তাহার রস-বৈচিত্র্য বা রস-বৈশিষ্ট্য একেবারে লুপ্ত হইবে না।

* * * *

অনুরাগ-রঞ্জিত এই দৃষ্টি বা অনুভূতি, বিশ্বের প্রেয়সী, এবং ব্যক্তি-গত ভাবে কবির প্রেয়সী এই যে সৌন্দর্য্যময়ী নারী-মূর্তিতে প্রকটিত শাশ্বত সত্য, কবির কাছে আসিল কী করিয়া? এ সম্বন্ধে কার্য্যকারণাত্মক বা ক্রম-বিচার-মূলক অনুসন্ধান চলিতে পারে; তাহাতে এই অপূর্ব রস-সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বা গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং ইহাকে সম্যক্ রূপে বুঝিবার পক্ষে সহায়তা-লাভ ঘটিতে পারে। Beauty in the Abstract, ভাবময় সৌন্দর্য্য, যাহা শাশ্বত সত্তারই রূপান্তর, তাহার সম্বন্ধে সূক্ত রচনা করিয়াছেন কবি তাঁহার "উর্বশী" কবিতায়। এই নামের দ্বারায়, কবির অনুভূতি- ও অনুভূতি-জাত রস-সৃষ্টির অন্যতম আধার বা প্রেরণাকে আমরা গোচরীভূত করিতে পারি। "উর্বশী"র প্রথম প্রকাশ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে—ঋগ্বেদের কবিতাময় পুরূরবা-উর্বশী সূক্তে, শতপথ-ব্রাহ্মণের গদ্য উপাখ্যানে। পরবর্তী কালে বিষ্ণু-পুরাণেও উর্বশীর কথা পাই। প্রাচীন আর্য্য জগতের আখ্যানটির মৌলিক সরলতা ও মনোহারিতা বিষ্ণু-পুরাণে কথিত গদ্যময় উপাখ্যান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে কালিদাসের নাটকে, তথা অন্য পুরাণে, এই উপাখ্যান বহুশঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া নিতান্ত অন্য ধরণের হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" পর্য্যায়ের কাব্য-সর্জনার মধ্যে, বৈদিক উর্বশীর কল্পনা একটি মূল-সূত্র রূপে বিদ্যমান।

"উর্বশী"-কবিতার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা হইতেছে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে—প্রাচীন গ্রীক প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী Aphrodite আফ্রোদীতে-র কল্পনা হইতে; প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, ও তাহার আদর্শে গঠিত আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি আছে, তাহা-ও ইহার দ্বিতীয় অনুপ্রাণনা। তৃতীয় অনুপ্রাণনা আমার মনে হয় কবি পাইয়াছিলেন, পরোক্ষ ভাবে—সূফী কবিতা হইতে। ঈশ্বরের বিভূতি-স্বরূপ কবির নিজের

দিব্য প্রতিভা, অবশ্য এই কবিতা-সর্জনার মূল উৎস। কিন্তু যে রঙ্গীন আলোক এই উৎস-ধারার উপর পড়িয়া তাহাকে এমন বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল করিয়াছে, অন্ততঃ তাহা অংশতঃ এই তিন বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়াছে।

উর্বশীর কল্পনার ও উপাখ্যানের মূল কথা—দেবকন্যার সহিত মানবের প্রেম। এইরূপ উপাখ্যান বা কল্পনা নানা জাতির মধ্যে আছে; কিন্তু মনে হয়. কল্পনাশীল ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি-আর্য্য) জাতির মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। আদি-আর্য্য (বা ইন্দো-ইউরোপীয়) জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে এইরূপ এক বা একাধিক myth বা দেব-কাহিনী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য, প্রাচীন ঈরানীয়, প্রাচীন গ্রীক, ইতালীয়, কেল্‌তিক, জর্‌মানিক ও স্লাব, ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সকল শাখার মধ্যেই এই ধরণের উপাখ্যান বা কথা পাওয়া যায়। অপ্সরা বা দিব্য-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত সুন্দরীকে দেখিয়া মানুষ প্রেমে পড়িল। অমানুষী নিজেকে মানুষের কাছে ধরা দিল; পরে পার্থিব জীবনে বিগত-রুচি হইয়া, দেবকন্যা বা সুর-সুন্দরীর তিরোধান; এবং শেষে ইহ-লোকেই অথবা পর-লোকে মানুষ ও অমানুষী প্রেমিক-যুগলের মিলন, ও মানুষের দেবত্ব-লাভ। এইরূপ উপাখ্যানে আবার কতকগুলি খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি আদি-আর্য্য জাতির মধ্যে উদ্ভূত এই myth বা দেব-কাহিনীর মূল রূপে বিদ্যমান ছিল। যেমন "আতি" বা swan অর্থাৎ রাজহংস রূপে অমানুষী অপ্সরোগণের বিচরণ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, অপ্সরা উর্বশী ও তাঁহার মানুষ প্রেমিক ও পতি রাজা পুরূরবার কথোপকথনাত্মক আঠারো ঋকের একটি সূক্ত আছে (ঋগ্বেদ, ১০।৯৫); শতপথ-ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে বর্ণিত গদ্য উপাখ্যান হইতে এই কথোপকথনের সূত্র ঠিক-মতো ধরা যায়।

অপ্সরা ও গন্ধর্ব বৈদিক দেব-জগতে Romance of the Supernatural অর্থাৎ অতি-প্রাকৃতের রমণীয়তার প্রতীক ও প্রকাশক। ঋগ্বেদের দেবতারা পুরাপুরি মানব-ধর্মী নহেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে নৈসর্গিক জগতের ছাপ বা ছোঁয়াচ বিদ্যমান—যদিও ইন্দ্র, উষা, সূর্য্য, অশ্বিদ্বয়, রুদ্র প্রভৃতি কতকগুলি দেবতার মধ্যে মানব-ধর্মিতা যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু গন্ধর্ব ও তাহাদের সহিত সংপৃক্ত অপ্সরোগণ—ইহাদের সম্বন্ধে যে কল্পনা, তাহা অন্য জিনিস। পৌরাণিক স্বর্গের মহামহিম সম্রাট্, অমাত্য- ও চাটুকার-পরিবেষ্টিত

রাজা ইন্দ্রের সভায় নাচুনী রূপে অপ্সরাদের অবনমন তখন-ও হয় নাই। অপ্সরোগণ জল স্থল, অরণ্য ও আকাশমার্গে বিচরণশীল স্বাধীন দেবযোনি, গন্ধর্বগণ অপ্সরাদের সহচর, পতি। স্বেচ্ছাবৃত্ত চিরযৌবনা অপ্সরোগণ, গ্রীক দেবলোকের Naiad, Dryad ও Nereid-দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের কেশি-সূক্তে (১০।১৩৬) দেখিতেছি, দীর্ঘ-কেশ-ধারী মলিন-কাষায়-বস্ত্র-পরিধানকারী শৈব যোগী, যিনি রুদ্রের সঙ্গে এক পাত্রে বিষপান করেন ("কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্ রুদ্রেণাপিবৎ সহ"), তিনি নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন—সিদ্ধি লাভ করেন ; তন্মধ্যে একটি কাম্য সিদ্ধি হইতেছে এই যে, তিনি অপ্সরা ও গন্ধর্ব এবং বন্য পশুর বিচরণ-ভূমিতে ইচ্ছামতো চলিয়া-ফিরিয়া বেড়ান ("অপ্সরসাং, গন্ধর্বাণাং, মৃগাণাং চরণে চরন্।")।

এই-রূপ এক অপ্সরা, উর্বশী ছিল যাঁহার নাম, তিনি ইলা-পুত্র রাজা পুরূরবাকে কামনা করিলেন, রাজা পুরূরবাব পত্নীত্ব স্বীকার করিলেন। উর্বশীকে রাজা পত্নী-রূপে পাইলেন, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার পক্ষে পালনীয় কতকগুলি তুচ্ছ প্রতিবন্ধ বা সময় বা শর্ত ছিল। উর্বশীকে আবার তাহাদের মধ্যে ফিরাইয়া পাইতে উৎসুক গন্ধর্বদের চেষ্টায়, সেই প্রতিবন্ধ পুরূরবা অনিচ্ছায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে উর্বশীও অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে রাজপত্নী উর্বশীর সন্তান-সম্ভাবনা। পুরূরবা প্রিয়া-বিরহে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে কতকগুলি অপ্সরা সহচরী সহিত কুরু-ক্ষেত্রের হ্রদে আতি বা রাজহংসের রূপে তাঁহাকে জলক্রীড়া করিতে দেখিলেন। উর্বশী পুরূরবার সহিত আলাপ করিলেন। উভয়ে পূর্বের দাম্পত্য জীবনের কথার অনুস্মরণ করিলেন। এবং ভবিষ্যতে পুরূরবার সহিত উর্বশীর আবার মিলন হইবে স্বর্গ-লোকে বা গন্ধর্ব-লোকে, এই কথার ইঙ্গিত করিয়া উর্বশী তিরোধান করিলেন।

এই তো উপাখ্যান। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্ত-সমূহে কতকগুলি বাক্য আছে, যেগুলিতে উর্বশীকে সামান্য একটি রূপকথার নায়িকার পদ হইতে মানুষের কামনার কেন্দ্রীভূত এক বিশ্বাবেশিনী নারী-রূপিণী সত্তা বা শক্তিতে পরিণত করিতেছে। এই সত্তাকে মানুষ পাইয়া-ও পাইতেছে না—অমানুষী এই শক্তিকে মানুষ সেবা করিয়াছে, লাভ করিয়াছে, ("পুরূরবো অহ তে

কেতমায়ং ; রাজা মে, বীর! তন্বঅস্ তদাসীঃ" ; "অমানুষীষু মানুষো নি ষেবে") ; কিন্তু এই শক্তি বা সত্তা এখন প্রথম উষার ন্যায় চিরতরে অন্তর্হিত, বায়ুর ন্যায় দুরাপনীয় ("প্রাক্রমিষম্ উষসাম্ অগ্রিয়েব···দুরাপনা বাত ইবাহমস্মি")। কিন্তু তবুও আশা মনের কোণে জাগিয়া থাকে ;—উর্বশী একবার দেখা দিয়া আবার চলিয়া যাইতেছেন, পুরূরবার আকুল কামনা—

"অন্তরিক্ষপ্রাং রজসো বিমানীম্
উপ শিক্ষামি উর্বশীং বসিষ্ঠঃ।
উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ ;
নি বর্তস্ব—হৃদয়ং তপ্যতে মে।"—

"অত্যন্ত কামনাযুক্ত হইয়া আমি উর্বশীকে আহ্বান করি—যে উর্বশী অন্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়া রাখে, ও আকাশ-মার্গকে পরিমাণ করে। আমার সমস্ত সুকৃতের বা পুণ্য-কর্মের ফল তোমাতেই পঁহুছাক্ ; ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় তপ্ত হইতেছে।"

এই পুরূরবা-উর্বশীর ঋক্গুলির মধ্যে, বিশেষ করিয়া উপরে উদ্ধৃত ঋক্‌টিতে, রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"-র মহীয়সী কল্পনার কতকগুলি বীজ যেন বিদ্যমান। "উর্বশী" নামটির মৌলিক অর্থ সম্ভবতঃ ইহা-ই ছিল—'উরু' অর্থাৎ প্রচুর বা পূর্ণ, 'বশ' অর্থাৎ কামনা যাহার, বা যাহার জন্য (উরু + √বশ্ + -ঈ)। প্রাচীন গ্রীক-ভাষায় ইহার প্রতিরূপ হইবে *Euru-wekia—*Eurekia। এই হিসাবে, "*উরু-বশী—উর্-বশী, উর্বশী" শব্দের অর্থ হইতে পারে the World's Desire,—রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বিশ্ব-বাসনা"।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের উর্বশী-পুরূরবা-সংবাদময় পঁচানব্বইয়ের সূক্তের উদ্ধৃত এই সতেরোর সংখ্যক উপান্ত ঋক্‌টিতে, অমানুষীর সহিত মানুষের প্রেমের কাহিনী বা রূপকথাটি, সাধারণ পার্থিব সত্তা বা জীবনের ঊর্ধ্বে একেবারে অতীন্দ্রিয় লোকে উন্নীত হইতেছে। এখানে, এমন কি মানুষের নৈতিক জীবনের সার্থকতা হইতেছে, জীবনের পিছনে অবস্থিত শাশ্বত সত্তাতে তাহার সমস্ত কর্মচেষ্টা, 'সমস্ত শুভ কার্য্য, সব সুকৃতের সমর্পণের মধ্যে-ই— "উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ"—এরূপ ইঙ্গিতও রহিয়াছে।

* * *

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার পরিকল্পনার মধ্যে, গ্রীক দেবী Aphroditē আফ্রোদীতে ও আফ্রোদীতেকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে (বিশেষ করিয়া গ্যোটে হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে) বিশ্ব-মধ্যে লীলায়িত সর্বসুন্দরী দৈবীশক্তির যে আবাহন ও অনুধ্যান চলিয়াছে, তাহার-ও প্রভাব আছে। আফ্রোদীতে প্রেমের ও কামের দেবী; তিনি মানব-সম্পর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অনৈতিক আকর্ষণ-শক্তি; জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের বিগ্রহ-স্বরূপা তিনি। ("আফ্রোদীতে" নামটির সংস্কৃত প্রতিরূপ "*অভ্রদত্তা" হইতে পারে—"অভ্র বা মেঘের দান", এই অর্থে; এবং মূলে হয়-তো ইনি অপ্-সরার মতো জল-মধ্যে বিচরণশীলা দেবী ছিলেন।) Sophokles সোফোক্লেস্, Euripides এউরিপিদেস্ প্রমুখ প্রাচীন গ্রীসের প্রধান কবিগণ, দেবী আফ্রোদীতে, এই নামের মধ্যে অবস্থিত Cosmic অর্থাৎ বিশ্বস্তব ও বিশ্বন্ধর ভাব বা কল্পনার পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রীক কবিদের দুই একটি উক্তি ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়—

My children, of a surety Cypris is
Not Cypris only, but bears many a name ;
Death is her name, and Might imperishable,
And maniac Frenzy, and unallayed Desire,
And Lamentation loud. All is in her ,
Impulse, and Quietude, and Energy ,
For in the bosoms of all souls that breathe
This Goddess is instilled. Who is not prey
For her ? She penetrates the watery tribe
Of fishes ; she is in the four-legged breed
Of the dry land ; in birds her wing bears sway,
In brutes, in mortals, in tne Gods on high......
......without spear,

Without a sword, Cypris cuts short all counsels,
Both human and divine.

(সোফোক্লেস্ হইতে, Sir George Young-এর অনুবাদ ;
Cypris = Kupris, Aphrodite আফ্রোদীতের অন্য নাম ।)

"বৎসগণ, নিশ্চয়-ই কুপ্রিস্-দেবী (আফ্রোদীতে) কেবল কুপ্রিস্-ই নহেন, কিন্তু তিনি বহুনাম-যুক্তা। তাঁহার নাম 'মৃত্যু', এবং অবিনশ্বর 'শক্তি', এবং 'উন্মাদনা', এবং অতৃপ্ত 'কামনা', এবং নিনাদিনী 'ক্রন্দসী' ; সব-কিছু তাঁহাতেই বিদ্যমান , 'আকাঙ্ক্ষা' এবং 'শান্তি', এবং 'কর্মদ্যোতনা'। শ্বাস-যুক্ত প্রত্যেক জীবের বক্ষো-মধ্যে দেবী আসীনা আছেন। এমন কে আছে যে তাঁহার শিকার নহে ? জলচর মৎস্য-কুলের মধ্যে তিনি চরণশীলা ; শুষ্ক পৃথিবীর উপরে চতুষ্পদ-কুলের মধ্যেও তিনি বিরাজমানা ; পক্ষিকুলের মধ্যে তাঁহার-ই পক্ষ কার্য্যকর। পশু, মানব, স্বর্গবাসী দেবতা, সকলেই তিনি। বর্ষা বা তরবারীর সাহায্য না লইয়া, কুপ্রিস্-দেবী মানব ও দৈব সর্বপ্রকার বিচার খণ্ডন করিয়া দেন।"

She ranges with the stars of eve and morn,
She wanders in the heaving of the sea,
And all life lives from her.—Aye, this is she
That sows Love's seed and brings Love's fruit to birth ;
And great Love's brethren are all we on earth !

(এউরিপিদেস্ হইতে, Dr. Gilbert Murray-র অনুবাদ।)

"সন্ধ্যা ও উষার তারকার মধ্যে দেবী বিচরণ করেন, সাগরের হিল্লোলে তিনি দোলায়িতা হন ; সমস্ত জীবন তাঁহা হইতে প্রাণ পায়। হাঁ, ইনি-ই তিনি, যিনি প্রেমের বীজ বপন করেন ও প্রেমের ফল উৎপাদন করেন। মহৎ প্রেমের-ই ভ্রাতৃরূপী আমরা সকলে—এই ভূমির উপরে।"

নারী-সম্বন্ধে মানুষের প্রেম ও কাম বিষয়ক সমস্ত বাসনা ও আগ্রহের নিয়ন্ত্রী রূপে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যে আফ্রোদীতের এইরূপ বহু উল্লেখ আছে। গ্রীক স্ত্রী-কবি Psappha প্সাপ্‌ফা বা Sappho সাপ্‌ফো-র কতকগুলি গীতি-কবিতার ভগ্নাংশের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করা যায়।

নূতন করিয়া এ যুগে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও ভাব-ধারার পুনরাবিষ্কারের পরে ও ইহার পুনরালোচনার ফলে, এই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী সৌন্দর্য্যময়ীর কল্পনা আধুনিক ইউরোপকে আবার নূতন দৃষ্টি, নূতন প্রেরণা দিয়াছে।

গ্যোটের জীবনব্যাপী জ্ঞান ও সাহিত্য-কলার সাধনার ফল Faust "ফাউস্ট্" নামক মহাকাব্য-রূপী নাটকের শেষ কথা—

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan—

"শাশ্বত নারী-রূপিণী আমাদিগকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিতেছে।"

ইংরেজ কবি A. C. Swinburne সুইন্‌ব্যর্‌ন্ গ্রীক ভাবের (বিশেষ করিয়া ইউরোপে খ্রীষ্টান-ধর্ম প্রসার লাভ করিবার পূর্বে যে প্রাচীন গ্রীক ধর্ম গ্রীসদেশে প্রচলিত ছিল তাহার চিন্তা-ধারার) পুনরানয়নের চেষ্টায়, আধুনিক ইংরেজী-সাহিত্যে গ্রীক দিব্যদৃষ্টি আনিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায়, যে-সব কবিতা ও যে-দুইখানি অপূর্ব নাটক রচনা করেন, সেগুলির মধ্যেও এই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী রমণীয়তার প্রশস্তি উদার ছন্দে ও উদাত্ত ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার Hertha কবিতা, The Last Oracle প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা; এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার গ্রীক রীতিতে রচিত নাটক Atalanta in Calydon-এ, আফ্রোদীতে-বন্দনাময় Chorus অর্থাৎ সমবেত-পাঠ—আধুনিক ইউরোপীয় ও বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি অপূর্ব বস্তু; সুইন্‌ব্যর্‌নের এই অনবদ্য সৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"তে আসিয়াছে বলিয়া কেহ-কেহ মনে করেন; এইরূপ মনে করা অযৌক্তিকও নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় প্রকাশে এবং বিশেষ করিয়া "জীবন-দেবতা"র কল্পনায়, ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বা প্রভাব কতটা ছিল, তাহার বিচার হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট্ প্রতিভা ও মনীষা ছিল সর্বগ্রাহী; সব-কিছু হইতেই তিনি ভাব ও প্রকাশ আত্মসাৎ করিবার শক্তি রাখিতেন। কিন্তু এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব যে, তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উপর তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জ্যোতি পড়িয়া, তাহাকে একেবারে তাঁহার নিজের জিনিস করিয়া দিয়াছে: In literature, a thing becomes his who says it best.

* * *

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"র কল্পনায় ও অনুভূতিতে আর একটি দিক্ হইতে কতকটা প্রভাব আসিয়া গিয়াছিল মনে করি—ইহা হইতেছে সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাত্মাকে মানবের বা মানবাত্মার প্রেমাস্পদ রূপে কল্পনা। সুফী সম্প্রদায়ের উদ্ভব, ইতিহাস ও সিদ্ধান্তের কথার সম্যক্ আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, আদিম বা প্রাথমিক ইস্‌লামের মধ্যে, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক এই-ভাবে কল্পিত হয়,—ঈশ্বর প্রভু, মানুষ তাঁহার দাস। ইহা-ই হইতেছে ইস্‌লামের প্রধান বাহ্য রূপ। আভ্যন্তর অনুভূতিতে, লোকোত্তর চরিত্রের মানুষ ঈশ্বরের সহিত সখিত্ব বা মিত্রতার কোঠাতেও পহুঁছিতে পারে, ইহা-ও প্রাথমিক ইস্‌লামের সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথম যুগের ইস্‌লামী (আরব) সাধকেরা একান্তে এই দাস্য-ভাবের সাধনা করিতেন; এবং তাঁহাদের এই বিবিক্ত সাধনার মধ্যে সুফী মতবাদের বীজ নিহিত ছিল। আদ্য ইস্লামের "মীরাবাঈ", আরব সিদ্ধা রাবিয়া (তিরোধানের সময়, খ্রীষ্টাব্দ ৮০১) দাস্য-ভাবের পরিবর্তে ঈশ্বর-প্রেম আনিয়া, সুফী মতবাদের ও উপলব্ধির মোড় ফিরাইয়া দিলেন—এই প্রেম ঠিক বৈষ্ণব মধুর রস বা অনুরাগ নহে, কিন্তু তাহার আভাস-স্বরূপ। রাবিয়া-র একটি প্রার্থনার অনুবাদ—

> O, my Lord; the stars are shining, and the eyes of men are closed, and kings have shut their doors, and every lover is alone with his beloved, and here am I, alone with Thee.
>
> "প্রভু আমার, উপরে তারকা-সমূহ জল্-জল্ করিতেছে; মানব-চক্ষু নিমীলিত; রাজারাও প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; প্রত্যেক প্রেমিক তাহার প্রেমিকার সঙ্গে একান্তে অবস্থান করিতেছে; আর আমিও এখানে একা, কেবল তোমার সঙ্গে।"

উত্তরকালে এই ধর্ম-সাধনার ধারায় আসিয়া মিলিত হইল গ্রীক নব্য-প্লাতোনীয় দর্শনের gnosis বা মা'রিফাৎ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, এবং ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের "শিবোঽহম্" বা "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি"। কিন্তু অনুরাগাত্মক সাধনা এবং অনুভূতিও চলিল। পরবর্তী যুগের ঋষি মন্‌সুর অল্-হল্লাজ (মৃত্যু-কাল ৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিক রূপে সুফী সাধকদের

পাইতেছি, যাঁহাদের চেতনায় ও কাব্যময় প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা"র-ই (আংশিক-ভাবে অন্ততঃ) পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া নাম করা যায় এই কয়জনের—হকীম আবুল মজ্‌দ্ মজদূদ্ সনাঈ—পারসীক (একাদশ শতক); ফরীদুদ্দীন 'অত্তার—পারসীক (খ্রীষ্টাব্দ ১১২০—১২৩০); 'ওমর ইব্‌নু-ল্-ফরীদ—মিসরীয় আরব (১১৮১—১২৩৫); মুহ্‌দীন ইব্‌নু-ল্-'অরবী—হিস্পান-দেশীয় আরব (১১৬৫—১২৪০); এবং জলালুদ্দীন রূমী—পারসীক (১২০৭—১২৭৩); শেখ সা'দী—পারসীক (১১৮৪—১২৯১); সা'দুদ্দীন মহমূদ শবিস্তরী—পারসীক (১২৫০—১৩২০?); মুহম্মদ শম্‌সুদ্দীন হাফেজ—পারসীক (মৃত্যু ১৩৯০); ও নূরুদ্দীন 'আব্দুর্-রহ্‌মান জামী (১৪১৪—১৪৯২)। ইঁহাদের সকলের অনুভূতির কাব্যময় প্রকাশে, ইঁহাদের "জীবন-দেবতা" হইতেছেন প্রেমাস্পদ—প্রেমের পাত্রী বা পাত্র, প্রেমিক পুরুষ নহেন;—এই প্রেমাস্পদ বা প্রেমের পাত্র, কচিৎ সুন্দরী তরুণী নারী-রূপিণী, কচিৎ (পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডের অধিবাসীদের সামাজিক জীবনের রীতি অনুসারে) সুন্দর কিশোর-রূপী। নারী-রূপে কল্পিত "জীবন-দেবতা" বা শাশ্বত সত্তাকে আরবী ভাষার "মা'শূকা" mā'shūqah (মা'শূকৎহুন্ mā'shūqathun) আখ্যা দেওয়া হয়, ও কিশোর-রূপী হইলে "মা'শূক্" mā'shūq' (মা'শূকুন্ mā'shūqun); এবং প্রেমিক জীবাত্মা বা মানব হইতেছে "'আশিক্" 'āshiq ('আশিকুন্ 'āshiqun)। এই শব্দগুলি আরবী "'শ্‌ক্" 'shq ধাতু হইতে গঠিত; এই ধাতুর অর্থ 'প্রেম করা, ভালোবাসা'।

সুফীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতবর্ষের মধ্য-যুগে খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতক হইতে আসিতে আরম্ভ করে। কবীর প্রভৃতি সন্তগণের অনুভূতিতে ও শিক্ষায়, ও নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপরে—আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধরিয়াও—এই প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ভারতের অনুভূতিতে শাশ্বত-সত্তা বা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত পুরুষোত্তমের কল্পনার পরিবর্তে, শাশ্বতী অনুরাগ-পাত্রী নারীসত্তমা বা নারী-শ্রেষ্ঠার কল্পনা গৃহীত হয় নাই;—পরবর্তী কালের ফারসী কবিতার অন্ধ অনুকারক উর্দু কবিগণ ভিন্ন, ভারতীয় সুফীগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, পুরুষোত্তমেরই আবাহন করিয়াছেন।

নিম্নে সুফী কবিদের দুই-চারিটি কবিতাংশ বাঙ্গালা অনুবাদে দেওয়া যাইতেছে—

"ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া, এই জগতের হাটে, আসিয়াছ তুমি কে ?
তোমার টানেই সমগ্র মানব-জাতি তোমার সঙ্গে চলিয়াছে !
তোমার সুন্দর তনুর একটি রশ্মি আমাদের
বিশ্ব-মানবকে উদ্ভাসিত করিয়াছে ;
তোমার বোনা ফসল প্রত্যেক গাছকে ফলবান্ করিয়াছে।"

—ফরীদুদ্দীন 'অত্তার।

"তাহার কেশগুচ্ছের রাত্রির মধ্যে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে ;
কালো নর্‌গিস্ ফুল লাল গোলাপকে শিশির-সিক্ত করিয়াছে।"

—ইব্‌নু-ল্-'অরবী।

"সে (মা'শূকা) যদি মনের মধ্যে ঠাঁই পায়, কল্পনা-ও তাহাকে পীড়িত করে ; তাহাকে কি চোখে দেখা যায় ?"

—ইব্‌নু-ল্-'অরবী।

"সে প্রীতির দিব্যমূর্তি, তাহার কথা ভাবিলেই সে মূর্তি গলিয়া যায়—
দৃষ্টিপথের পক্ষে সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।"

—ইব্‌নু-ল্-'অরবী।

"জ্যোতির আকাশ তাহার পায়ের তলায় ;
দ্যুলোক স্বর্লোকের ঊর্ধ্বে তাহার মুকুট।"

—ইব্‌নু-ল্-'অরবী।

"আমার রজনী তাহার মুখের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত,
আমার দিন তাহার কেশ-জালের আঁধারে ভরা।"

—ইব্‌নু-ল্-'অরবী।

"প্রাণের মধ্যে কোন্ এক নব-বধূর আগমন হইয়াছে !
তাহার মুখের প্রতিচ্ছবিতে, সমগ্র জগৎ,
নব-বিবাহিত বর-বধূর হস্তের মতো হিল্লোলময় ও রাগ-রঞ্জিত হউক।"
—জলালুদ্দীন রূমী।

"আমি তোমার বীণা, আমার প্রত্যেক তারে তুমি আঘাত করিতেছ,
আমি তাহাতে রণরণিয়া উঠিতেছি !"
—জলালুদ্দীন রূমী।

সূফী কবিদের রচনা হইতে এইরূপ বহু-বহু ছত্র উদ্ধার করিয়া দেওয়া যায়, যেগুলি শ্রবণ মাত্রেই রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" কবিতার কথা মনে পড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ-ভাবে এই-সব লেখার সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের সংবাদ আমরা জানি না। তবে তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সূফী কবি হাফেজের ভক্ত ছিলেন, হাফেজের পদ ও পদাংশ তিনি আবৃত্তি করিতে ভালো-বাসিতেন। হাফেজ প্রভৃতি সূফী কবির এই মাশূকা-কল্পনার সহিত তাঁহার পিতার প্রসাদে রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে হয়-তো প্রথম পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই-ভাবে তাঁহার নিজের অনুভূতির অভিব্যক্তিতে সূফী ভাব-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, এই World's Sweetheart-এর অনুধ্যান, কিছুটা কার্য্যকর হইয়া থাকিতে পারে। যেমন পরোক্ষ-ভাবে আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে, জলালুদ্দীন রূমী প্রমুখ পারস্যের সূফী সাধকদের ভাব-ধারা, কিছুটা অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে সংগত বা যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ধারা এবং কাব্যময় প্রকাশ, উভয় ব্যাপারের কর্ণধার-স্বরূপ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন দুইজনেই যে ফারসী-ভাষাতেও পণ্ডিত ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহারা গৌড়ের স্বাধীন সুলতানের দরবারে কাজ করিতেন—একজন ছিলেন সুলতানের "দবীর খাস" বা খাস-মুন্শী, অর্থাৎ Private Secretary বা অন্তরঙ্গ সহকারী, আর অন্যজন ছিলেন "সাগির মালিক" অর্থাৎ ছোট-রাজা বা প্রতিরাজ, অর্থাৎ রাজপ্রতিভূ-পদাধিষ্টিত উচ্চ অমাত্য। রাজভাষা ফারসী এবং তৎসঙ্গে ফারসী সাহিত্য ইঁহাদের ভালো করিয়াই জানা ছিল।

এক-একটি পূর্ণ বস্তুকে বিশ্লেষ করিলে, তন্মধ্যে নানা উপাদান পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় প্রকাশ সম্বন্ধেও সেই কথা। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে, নানা স্থান হইতে লব্ধ বিভিন্ন উপাদানকে লইয়া, রবীন্দ্রনাথ যে পরিপূর্ণ নব-কলেবর দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা একটি অভিনব ও বিস্ময়কর সর্বজন-মনোহর রস-সৃষ্টি; এবং বিশ্বমানব সহৃদয়তার সহিত চিরকাল ধরিয়া এই রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে—অতীন্দ্রিয় শাশ্বত সত্তাকে আমাদের জীবনে ধরিবার মনোগত আকূতিকে জাগরিত ও উন্নীত করিবার পথে, এই রস-সৃষ্টি আমাদের চির-কাল ধরিয়া শক্তি ও আনন্দ দান করিবে॥

বঙ্গাব্দ ১৩৫৬]

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ পাঠ
৫৭	১২	"শান্তভাবের কবিতা ও Razm 'রজ্‌ম্‌'"
৫৭	২৬	"তিরু-বল্‌ল্‌ুবর্‌-এর ভগিনী,"
৫৭	২৮	"ঔতল্‌ অমে্‌ ; তীরিনৈ যিট্টু-ঔট্টৈল্‌ পোরুল্‌"
৫৮	৫	"পরনৈ নিনৈন্তু—"
৮৭	২	"তোমার তবে আমার মন দহে,…"
১১৯	৯	"সক্‌কা-নী—…ক-ফিাালি-ঘ্‌-ঘয়্‌ফি বি-ঘ্‌-ঘয়্‌ফি"
১১৯	১০	"ফ-লম্‌মা……বি-ন্‌-নত্ব্‌াই…"
১৩৮	১৬	'…prd অর্থাৎ brd="ব্‌দ্ধি"…'
২২১	১২	"—৪।৩।২১)— ··"
২২১	১৮	"উত ত্বঃ শৃণ্বন্‌ ন শৃণোতি এনাম।"
২৩১	৬	"মুহ্‌য়িউ-দ্‌-দীন ইব্‌নু-ল্‌-অরবী— ·"